ভূমিকা

দিদিমার কোলে শুয়েই জীবনের প্রথম রোমাঞ্চের সাড়া জাগে—সেই রোমাঞ্চক জীবন বেঙ্‌মা বেঙ্‌মির রঙিন পাখায় উতলা হ'য়ে উঠেছে, পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে লাল কমল নীল কমলের দেশে নিরুদ্দেশ যাত্রা ক'রেছে—পাতাল কন্যা মণিমালার পাতাল পুরীতে গিয়ে হিংস্র সাপের সঙ্গে লড়াই করেছে। সে জীবনে বাস্তবের চেয়ে কল্পনাই ছিলো বেশি—আলোর চেয়ে কুয়াসা। তবু সেই কল্পনা আর কুয়াসার মাঝেই জীবনের দূরতম এক বাস্তব অথচ রহস্যঘন জীবন-সীমান্তের আহ্বান পেয়েছি। শিশুর জীবনে কোন ভৌগলিক সীমান্তের বালাই নেই। রোমাঞ্চের ক্ষুধা তাকে এক সীমান্ত থেকে আর এক সীমান্তে নিয়ে চলে—এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে। সেখানে সিন্ধবাদ নাবিকের কোন জাত নেই, হারুন্ অল্ রশিদের প্রাসাদ শিখর দিগন্তের বাঁধে অলক্ষ্য হয়ে যায় না—সেখানে মার্কোপোলো আর মঙ্গোপার্ক, কলম্বাস আর লিভিংষ্টোন, আমুণ্ডসেন আর স্কট সবাই পরমাত্মীয়ের মত গলাগলি হ'য়ে ঝোড়ো মেঘের ছন্দে নিশ্ছেদ সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছ। শিশুর মনও তারই পিছু পিছু ধাওয়া করে।

দিদিমার কোলে শুয়েই এমনি অপূর্ব রোমাঞ্চক জীবনের ক্ষুধা পল্লবিত হয়েছে। অলীক কল্পনা ব'লে যতই আওড়াই না কেন—তবু সে রক্তমাংসের বীক্ষণাগারের মাঝে অনিবার্য গতিতে নানা ডাল পালায় বেড়ে উঠেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার অলীকতার খোলস একের পর এক গেছে ঝরে সত্যি, কিন্তু, অরণ্য আর পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি, ঝরণা আর জলপ্রপাৎ, রঙিন ভূষায় সজ্জিত নানাদেশের নরনারীর বিচিত্র জীবনযাত্রার ওপর যে বাস্তব রোমাঞ্চকর আকর্ষণ উপলব্ধি ক'রেছি তার পেছনে দিদিমার স্নেহভরা কোলের মাহাত্ম্য নেই ব'লে তার অমর্যাদা করতে সাহস পাই না।

এই রোমাঞ্চের মূল্য কতখানি তা নিয়ে আজ চুলচেরা বিচার ক'রতে বসিনি। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে যেখানে প্রথম পরিচয় রোমাঞ্চক ভারতের পাহাড়ে-অরণ্যে ঘুরে বেড়াবার সময় তার কথা বহুবার মনে প'ড়েছে—তাই জীবন সীমান্তের এপার থেকে সীমান্তের ওপারের দিদিমাকে শ্রদ্ধাভারাবনত চিত্তে স্মরণ না ক'রে পারছি না।

লেখক

পূর্বাভাস

দিদিমার কাছে যে রোমাঞ্চের প্রথম স্পর্শ লাভ করেছি কলেজ জীবনে তাকে কার্যকরী করার প্রথম তাগিদ অনুভব করি। সিন্ধবাদ নাবিক চলেছে অকূল সমুদ্রে পাল তুলে ;—দ্বীপে দ্বীপে ভিড়ছে তার জাহাজ। সমুদ্রের গন্ধ জড়ানো অজানা দ্বীপ, নাম না জানা পাখী, সৃষ্টিছাড়া গাছপালা। রহস্য-গভীর আকাশের নিচে দুঃসাহসী জীবন-যাত্রী—কলেজী যুবকের কাছেও এই কিশোর-কল্পনার আবেদন রূপে-রঙে রূপান্তরিত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। যৌবনে পড়েছি স্বেন্ হেডিনের তিব্বত-রোমাঞ্চ। তুষার ঝড়ের মাঝ দিয়ে মাথা নিচু ক'রে চ'লেছেন সুইডিস বীর বৈজ্ঞানিক হেডিন—তিব্বতের হলুদ ঝড়ও তাঁকে নিরুৎসাহ ক'রতে পারছে না। অনিবার্য গতিতে এগিয়ে চলেছে তাঁর বৈজ্ঞানিক অভি-যাত্রা; দিনের পর দিন তাঁর ভারবাহী ইয়াক্ আর খচ্চর অসহায়ভাবে পথের মাঝে পড়ে মারা গেছে—জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয় জিনিস-গুলো ধীরে ধীরে কমে আসছে। তিব্বতের মৃত্যুহিম রাত—তাঁবুর আসে পাশেই শীতল মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যায়। মেরু আবিষ্কারে ক্যাপ্টেন ওস্‌ফ্ বন্ধুদের জীবন বাঁচাবার জন্যে তুষার-ঝড়ের মাঝে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন—অজ্ঞাত দেশের দুরন্ত মৃত্যুও তাঁর নিঃস্বার্থ জীবনাহুতিতে বাধা দিতে পারল না ;···আফ্রিকা আবিষ্কারের নেশায় লিভিংস্টোন তন্ময় হ'য়ে গেছেন—আফ্রিকার বন্য জীবনের ভয়াবহতা হিংস্র মানুষের আতঙ্ক, জীবন-বিপন্ন হবার শত কারণ উপেক্ষা ক'রেও লিভিংস্টোন নিবিষ্টভাবে এগিয়ে চলেছেন। সত্যিই তিনি লিভিংস্টোন্

অথবা জীবন্ত পাথর—নইলে, এই মৃত্যু-আকীর্ণ জীবনও কেন তাঁর একটা স্নায়ুকেও চঞ্চল ক'রতে পারলো না···

এই সব দুঃসাহসী ভ্রমণ বৃত্তান্ত প'ড়তে প'ড়তে দুঃসাহসের দিকে না হোক্ অন্ততঃ বৃহত্তর পৃথিবীর দিকে মন ক্রমেই ঝুঁকে পড়ল। ভারত পরাধীন হলেও এর পথে প্রান্তরে, পাহাড়ে অরণ্যে, নদী আর সাগরে রোমাঞ্চক জীবনের পাথেয়ের অভাব নাই। যেটুকু সুযোগ যখন পেয়েছি তখনই তাকে পূরো মাত্রায় আদায় করার চেষ্টা করেছি। রোমাঞ্চক ভারতের সৃষ্টির এই আসল কাহিনী।

কলেজ জীবনের সামান্য একটু প্রচেষ্টা উল্লেখ ক'রেই পূর্বাভাস পর্ব শেষ করবো। কলেজ আমার মত মানসিক কাঠামোওয়ালা দু'একজন বন্ধুর সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু, পড়ি ফরিদপুরের মত সাধারণ এক কলেজে···গৃহস্থ ঘরের বৌ-এর মত হাতে নেহাৎই সাধারণ জীবনের গন্ধ ছড়ানো; নেহাৎ খাওয়া দাওয়া, পড়া শোওয়া, বড় জোর কলেজের সমতল (একটুও চড়াই উৎরাই নাই) মাঠে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পায়চারী করা। আকাশে পরিপূর্ণ জোছ্‌নার জোয়ার সৃষ্টি হলেও বাইরে পাঁচ মিনিট কাটাবার সময় নেই—ডাইনিং হলের প্রথম ঘণ্টা বুকের হৃৎপিণ্ডকে নাড়িয়ে দিয়ে বেজে যায়! তারপর খড়মের খট্ খট্ খটাখট ঘোড়দৌড় দেরি হলে ফরিদপুরের সস্তা ইলিশের (যুদ্ধের অনেক আগে অবশ্য) তৈল চর্চিত পয়লা নম্বর উচ্ছিষ্ট থালায় ভাত খাওয়া—যাতে অন্নপ্রাশনের ভাতেরও উঠে আসার সম্ভাবনা ছিল চলিত কথানুযায়ী। খাওয়ার পরে নেহাৎই সাধারণ ধরনের পরনিন্দা কখনও প্রফেসারের কখনও অন্য কোন ভাল ছেলের কখনও হয়তো বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আকস্মিক অভ্যুদয়ের সম্ভাবনায় সস্তা কেরোসিন্ (সেও যুদ্ধের আগে কিনা) তেলের আলোয় একটু আধটু পাতা উল্টোনোর চেষ্টা। সেখানে কোথায়ই বা আমুণ্ডসেন কোথায়ই বা বেয়াৎ আর স্টানলী।

ভারত

এই পরিবেশের মধ্যেই হঠাৎ একদিন শুনলাম বঙ্কিমের সীতারামের দেশ খুব বেশি দূরে নয়। যাদের সাথে সাইকেলে পৃথিবী ঘোরার স্বপ্ন দেখেছি, এই সুসংবাদে তারা সবাই পাশে এসে দাঁড়াল। ভাবলাম, গুডফ্রাইডে'র ছুটীটার এর চেয়ে ভাল উপভোগ আর হতে পারে না।

ভোরের পাখী তখন ডাকছিল। পুব আকাশের ফ্যাকাসে আলো তার চোখে ঠিকরে পড়েছে। ভাড়া করা সাইকেলে আমরা কলেজী ছাত্রের মতই স্মার্টলি উঠে পড়লাম একে একে। যশোর রোডের দু'ধার বেয়ে মোটা মোটা তেঁতুল আর বটের সারি। এত বটগাছের সমারোহ পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে কি না বলতে পারি না। এত দিনের জীবনে সত্যিকার একটু মুক্তির হাওয়া গায়ে লেগেছে—এই-ই তো জীবন না হোক্, এ-ও তো জীবন! বই-এর ঠাস বুনোনির দেওয়ালে বাইরের আলো এতদিন ঠিকরে পড়েছে। সাতরঙা সূর্যের আলোর একটা রং-ও কোনদিন অসতর্ক রন্ধ্রপথ দিয়ে মুখে এসে পড়ে নি। এই-ই প্রথম যখন জীবনের প্রথম বসন্তে সূর্যালোকের সাতটা প্রধান রংই বিশ্বস্ত চুলের ফাঁকে ফাঁকে খেলা করে যাচ্ছে। বাতাসে বাঁশীর আওয়াজ। ঝিঁঝির পাখায় পাখায় ঝরণা ধারার অনাবিল সুর। আমরা চলেছি তিন বন্ধুতে এগিয়ে। জনাকীর্ণ শহরের পথে পথে যখন কোলাহলের ধূলট খেলা চলছে তখন তারই এত কাছে এত নির্জনতা, এত নির্মমতা, এত সজীব জীবনের গন্ধ—ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। আবার এত দারিদ্র, এত নিরাভরণতা, এতই শূন্যতা—সুপ্ত চাষার কুটীরে কুটীরে তারই আভাস পাচ্ছি। ছন্দে ছন্দে কবিতায় যখন এই জীবনের স্তুতি দেখতে পাই তখন এই অতলস্পর্শ নিরাভরণ জীবন তার আড়ালে চাপা পড়ে যায়। জীবনের এই বিকৃত চেহারা নিয়েই কবিরা স্বপ্নে বিভোর থেকেছেন—কাব্যপাঠকরা

মোহান্ধ জীবনের চারপাশে ঘুরপাক খেয়েছেন। সেই নিরুক্ত জীবন-ধারাকে আজ এই ভোরের ফ্যাকাশে আলোয় খুব গভীরভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম, আমাদের জীবন এতই রিক্ত। এমন বাড়ি অনেক নজরে পড়ছে যার গোয়াল আর শোবার ঘরের কোন সীমান্ত নাই; এমন ঘর যথেষ্টই দেখা যাচ্ছে যাকে ঘর বলা যায় না। যেন বৈজ্ঞানিক বিংশ শতাব্দীর এক একটা প্রশ্ন সে সব।

মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে সাইকেলের প্রতিযোগিতা হচ্ছিল। চেহারা এবং শক্তিতে শচীনবাবুর (হোস্টেল মেট) নাগাল পাওয়ার সম্ভাবনা নেই তাই সুবিমলবাবু (রুম-মেট) আর আমার মধ্যে সেটা সীমাবদ্ধ ছিল। একটা সঙ্কটপূর্ণ তেমাথার সন্ধিস্থলে এসে পথ ভুলে বসেছিলাম। শেষে আবার সংশোধন করে ঠিক পথ ধরলাম। রাস্তায় বৈচিত্র খুব বেশি নেই। একে বাংলা দেশ, তাতে কল্পনা শক্তির অভাব তাই, কবি হ'লে যেটুকু সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র আবিষ্কার করা চলতো পতিত জমির মত নেহাৎ ছন্দহীন হওয়ায় সে পথে বিস্তর বাধা ছিল। তবু যৌবনের একটা আবেগ আছে যা নীরস জিনিসকেও সরশ করে তোলে; বিশেষ করে গণ্ডীর-অতীত জীবনের এই সান্নিধ্য আমাদেরও বেশ কিছুটা চাঙা করে রেখেছিল। নির্বাসিত দান্তে হ'লে যেখানে বলতে পারতেন, কি গ্রাহ্য করি আমি যতক্ষণ আমার মাথার উপরে আছে নীল আকাশ আর অগন্য তারকালোক, সেখানে আমার এটুকু বলবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে; কি গ্রাহ্য করি আমি যতক্ষণ আছি আমি, আমার যৌবন আর কলেজী জীবন।···এতক্ষণ বেশ ভাল পথ দিয়েই এসেছি—এবার পড়া গেল মস্ত এক বিপদে। ঘোষপুর রেলস্টেশনের কাছেই মস্ত একটা খালের মত আছে—কচুরিতে একে-বারে ঠাস বুনোট। যেন ট্রেঞ্চের মধ্যে লক্ষ লক্ষ সৈন্য মাথা গুঁজে রয়েছে। এ সৈন্যের আবার যুদ্ধের কালাকাল নেই—ভারতীয় পঙ্গু

ভারত

জীবনের সাথে এর অহর্নিশ লড়াই চলছে। আপাতঃ পরাজিত ভারতীয় আত্মার বুকের উপর এ দুঃশাসনের মত চেপে রয়েছে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু সে বুকে আবার স্পন্দন জেগেছে। তাই ব্রিটিশ শাসনের মত এই লক্ষ লক্ষ সবুজ ফৌজের শাসনও আজ শিথিল হয়ে উঠেছে। কিন্তু যেদিনের কথা লিখছি সেদিন তেমন কোন সম্ভাবনা তার দেখা যায় নি। কচুরী বনের উপর দিয়ে তৈরি প্রায় অর্দ্ধমাইল ব্যাপি বাঁশের সাঁকোর দিকে তাকিয়ে চক্ষু স্থির। সাইকেল ঘাড়ে নিয়ে পার হতে হবে ভেবে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। মানুষের দেহের এবং মনের কাঠামোর একটা মস্তবড় বৈশিষ্ট্য হলো যে কোন অবস্থার সাথেই সে খাপ খাইয়ে নেয়। না হলে, পৃথিবীর অনেক বড় বড় আবিষ্কার এবং তার সাথে সভ্যতার অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যেত। সেইটুকু মূলধন ছিল বলেই অতবড় সাঁকোটা সাইকেল ঘাড়ে নিয়েই পার হতে পেরেছিলাম। পার হয়েও আর এক বিপদ—সামনেই মস্ত এক বন। সাঁকো পার হওয়া যদি বা সহজ হয়েছিল এ বনে পথ আবিষ্কার করা তার চেয়ে দুঃসাধ্য মনে হলো। যে পথেই যাই ঘুরে ফিরে সেইখানে এসেই হাজির হই। দিনের বেলাও সেখানটা অন্ধকার। মাথার ওপর ঘুঘু ডাকছে বাঁশ গাছের পাকা পাতাটা ডাঙায় তোলা মাছের মত ধড়ফড় করতে করতে ঝরে পড়ে গেল। এ সব বনে বাঘ থাকে শুনেছি। ভয় লাগছিল আবার ভালও লাগছিল তবু তো দৈনন্দিন জীবন থেকে একটু স্বতন্ত্র ধরনের জীবন—বেলে মাছের মত একেবারে রক্তহীন বিবর্ণ জীবন যাপন করতে করতে সত্যিই হাঁপ ধরে গিয়েছিল। তবু যদি মরার আগে বাঘের একটা হাঁচি শুনেও মরতে পারি তবু ভাববো, (অবশ্য মরণে আর ভাবার সময় পাবো কি করে সেটা ভাবিনি তখন, তবে এখন ভাবি) জীবন সার্থক হয়েছে। যাক্ বাঘের

সামনেই মধুমতীর বিরাট গৈরিক বিস্তৃতি। মহাদেবের জটা থেকে না হ'লেও তদীয় অনুচর নন্দী ভৃঙ্গীর জটা থেকে যে অন্ততঃ ঐ নদীর সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। নদীর কুলু কুলু শব্দের মধ্য থেকে যেন 'সীতারাম', 'সীতারাম' এই শব্দই শুনতে পেলাম। মানুষ শব্দের মধ্যে নিজের মানষিক চিন্তারই প্রতিচ্ছবি খুঁজে পায়। তাই, মহম্মদপুরের সৃষ্টিকর্তা সীতারাম আপাততঃ যিনি আমাদের কল্পনা এবং কামনার বস্তু স্রোতের শব্দ থেকেও যেন আমাদের কল্পনার মণিকোঠায় গিয়ে স্থান পেতে লাগলেন। সামনেই নদীর পাড়ের মধ্যে সৃষ্টি করা গর্ত থেকে গাঙ শালিকের চীৎকার ভেসে আসছে। ওপারেও কতকগুলো শালিক কিচির মিচির শব্দ করছে। মামাবাড়ি থেকে ফিরবার পথে ছোটবেলা এই মধুমতীর তীরেই কত গাং শালিকের চীৎকার শুনেছি। মানসকল্পনায় বহুদিনের বহু পুরনো কত স্মৃতি মনে জেগে উঠল। নৌকা ছুটে চলেছে মাঝিদের বদর বদর ধ্বনি, গাং শালিকের আওয়াজ, লাল পাটের ডগা, দাঁড়ের ঝপ্ ঝপ্ শব্দ এক কিশোরের স্বপ্নময় চোখে যেন সে সব পরীর দেশের মত এক আজব কাহিনীর রূপ নিচ্ছে। তমসা ঘন অর্ধচেতনরাজ্যের সীমান্তে যেন সে রাজ্য নীল জোনাকীর ঝিকিমিকিতে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমছে। কৈশোরের সেই স্বপ্ন জোনাকীর দেশের হাওয়া যেন আজ এই নিস্তব্ধ দুপুরে এই এলাংখালির ঘাটে দাঁড়ানো এক যুবকের (যে কৈশোর ছাড়িয়ে আজ যৌবনের সিংহদ্বারে ঢুকেছে) গায়ে এসে লাগল।...খেয়া নৌকা ওপারে রয়েছে। আমরা এপারে বসে বসে ভাবছি, এপারটা যদি হঠাৎ ওপার হয়ে যেতো! কিছুক্ষণ পর ওপারের তীরে পারাপারের নৌকাটার পাশে কয়েকটা সাদা রেখা যেন ভেসে উঠলো। আস্তে আস্তে দেখি নৌকাটা কাছে আসছে। ক্রমে নৌকার শপ্ শপ্ শব্দ

শুনতে পেলাম। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় স্বর্ণ-জোনাকীর ঝলক খেলা করে বেড়াচ্ছে। গাং শালিক অবিশ্রান্ত চীৎকার করে চলেছে। নদীর বাঁকে বকের ডানার মত চাঁদসদাগরের সওদাগরী নৌকোর পাল দেখা যাচ্ছে। উত্তপ্ত বালুর তাপ মুখে এসে লাগছে। ধ্যাঁস করে একটা শব্দ তুলে নৌকাটা এসে লাগল। ধপ্ ধপ্ করে শব্দ তুলে নদীর ওপারের সেই সাদা বেথারা নেমে এলো।···নৌকায় তো উঠলাম এখন বাইবে কে? নৌকা বাওয়ার অভ্যাস ছিল কিন্তু দাঁড় তো ধরিনি কোনদিন। তাকিয়ে দেখি দূর থেকে একটা লোক চীৎকার করছে, 'এই মাঝি, রাখো, রাখো!' নৌকা না রাখার মত কোন কারণ তখনও ঘটে নি।

আমাদের অবস্থা বুঝে লোকটা দাঁড় হাতে ক'রে ব'সলো। আমিও হাল ধরলাম। নৌকা বেশ জোরেই ছুটলো। তীরের দিকে এগিয়ে যাবার একটা আনন্দ আছে—বেশ লাগছিল। গাধা মার্কা সাইকেল ঠেলার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে বেশ একটু আরাম লাগছিল। নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া। ধূ-ধূ করা বালুব চর সূর্যের আলোয় ঝকমক ক'রছে। বন্ধুর সিগারেটের নীল ধোঁয়া এঁকে বেঁকে পেছনে প'ড়ে থাকছে। ঠিক ওই ধোঁয়াগুলোকে আর পৃথিবীব সীমান্তে গিয়েও খুঁজে পাবো না। কে জানে কোন দূব ভবিষ্যতে হয়তো মেঘের রাজ্য থেকে ওই একটুকরো সিগারেটের ধোঁয়াও সবুজ ফসলের জন্যে বিন্দু বিন্দু অমৃতে রূপান্তরীত হ'য়ে ফিরে আসবে। এক ঝাঁক তিতির টি টি শব্দ ক'রতে ক'রতে গভীর শূন্যে পাখা দুলিয়ে উড়ে গেলো। নীলকান্ত মণির মত আকাশটা উজল হ'য়ে ছড়িয়ে আছে। এইবারে কিছুক্ষণ আগেকার এপার ওপার হ'য়েছে—আর, ওপার এপারে রূপান্তরিত হ'য়েছে। চাষীর বুকের ভাঙনের মত সহস্র ফাটল ধরা পাড়িতে গিয়ে উঠলাম। এইবার নদীর ধার দিয়েই যেতে হবে।

চৈতালি ফসলের সবুজ আগায় মাঠ ছেয়ে আছে। তারই মধ্য দিয়ে পথ। চারদিকে যেন রং-এর মেলা। আকাশ নীল, বাতাস নীল, মাঠ সবুজ, নদীর তীর ধূসর—সবচেয়ে রঙীন্ আমাদের মন। যৌবনের সহস্র অতৃপ্ত আবেগের বাঁধ ডিঙিয়ে আমরা এক রঙীন্ রাজ্যে মুখো-মুখি। সেখানে ফুল ফোটে, পাখী গায়, সেখানকার আকাশ রঙীন্ শূন্যে মুক্তির অবাধ সঙ্গীত শোনায়—কিন্তু, তবু সে রাজ্যের আমরা নিরুপায় দর্শক মাত্র—দেখারই অধিকার শুধু—ভোগ করার অধিকার নাই। পারিপার্শ্বিক দুনিয়া সে অধিকারের মাথায় লোহার শিকল পরিয়ে রেখেছে। গোলাপের প্রতিবেশি হ'য়েও কাঁটার যেমন গোলাপের অধিকার নেই—তেমনই কাঁটার বিক্ষুব্ধ জীবন নিয়েই বিশৃঙ্খল জীবনের দুরে দুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা পরাধীন দেশের যুবক সাধারণ।

নদীর তীর থেকে মহম্মদপুর বা মামুদপুর বেশি দুর নয়। আধ ঘণ্টা খানেক সাইকেল চালিয়েই গ্রামের সীমায় পৌঁছলাম। ঢুকবার পথে এক ভদ্র-লোকের সঙ্গে দেখা। পরিচয়ে জানলাম, তিনি ডাক্তার। সাদা চশমার ভিতর দিয়ে কতকগুলি জীবন্ত বিড়ম্বনার সন্ধান পেয়ে ভদ্রলোক পায়ে পায়ে সরে পড়লেন। মামুদপুরের সূচনাই যেন আমাদের অনুশোচনার আভাস জানিয়ে দিল। ক্ষিদেয়-তেষ্টায় পরিশ্রমে অবসাদে তখন আমরা রঙীন্ আকাশ থেকে একেবারে নীরস মাটির কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। একটু নিরাশ হ'য়েই যেন মামুদপুরে ঢুকলাম। প্রথমেই আমাদের প্রয়োজন একটু বিশ্রামের তারপর কিছু খাবার। একটা দোকান দেখে উঠে পড়লাম। খাবারের মধ্যে শুধু চিঁড়ে আর বাতাসা। হতাশার পরিমাণ আর একটু বাড়ল। বুঝলাম, নিছক গদ্যের রাজ্যে এসে পৌঁছেছি—পদ্য পড়া যৌবনের কোন দাম নেই এখানে। চিঁড়ে চিবাতে চিবাতে মাড়িগুলো যখন বেয়াদপী করবার চেষ্টা করছে তখন হঠাৎ শুনলাম, খাবার জল পাওয়া যায় না ওই

জায়গাটায়—আরও দূরে যেতে হবে। সীতারামের অদৃশ্য আত্মার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ক'রবো না, কতকগুলো টিন পরিবেষ্টিত চোখা-গোঁফওয়ালা দোকানীর বিরুদ্ধেই খাপের তলোয়ার প্রয়োগ করবো ভাবছি—হঠাৎ মনে হলো, এ-তো সীতারামের যুগ নয়—তারই মাটি বটে। বাতাসকে গলিয়ে জল করাটা বৈজ্ঞানিকদেরই সম্ভব আমরা বৈজ্ঞানিক তো নই তাছাড়া, জল আমাদের এখনই চাই। হঠাৎ এক মহিলার সাথে দেখা হয়ে মরীচিকার আভাস পেলাম। বাংলার মহিলারা সেবা যত্নে মরীচিকা এ অপবাদ আমার মত অনেকেই দিতে সাহস করবেন না। তাই মরীচিকার আশাও যেমন আমরা তাঁকে দেখে পেয়েছিলাম তার বিভ্রান্তি আর আমাদের উদ্ভ্রান্ত করতে পারল না। তিনি যত্ন করে নিয়ে গিয়ে আমাদের প্রচুর ঠাণ্ডা জল খাওয়ালেন। মামুদপুরে এতক্ষণে একটু আত্মীয়তার সুর শুনতে পেয়ে পথভ্রান্ত রুক্ষ মন অনেকটা শান্ত হলো! ডাক্তারই প্রকৃত মামুদপুর—না এই স্নেহশীল মহিলা—তার উত্তর পেতে আমাদের একটুও ভাবতে হয়নি। এ-রকম প্রকৃত মামুদপুরীদের নিয়েই আমাদের সভ্যতা। একই সময়ে আমাদের দুর্ভাগ্য এবং সৌভাগ্য বলতে হয় যে, পুরনো সামন্ত ব্যবস্থার স্নেহশীল হৃদয় হারিয়েছি, পেয়েছি শিল্পব্যবস্থায় ডাক্তারের মত সন্দেহ কাতর সংকীর্ণ মন তবু সামন্তব্যবস্থার জীর্ণ ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে আমাদের এই নতুন দিনের পৃষ্ঠায় পরিণত করতে রাজী নই। যা গেছে তার ভালর জন্যেই গেছে। ডাক্তারই আজকের দিনের প্রকৃত পরিচয় নয় আজকের দিনের উদার হৃদয় নরনারীর পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে বরফাবৃত ককেশাসের পাহাড়ে পাহাড়ে, মধ্য-এশিয়ার তুন্দ্রাভূমিতে, আছে মেরুপ্রান্তে, আছে ব্ল্যাকসীর তীর ঘিরে, কাস্পিয়ান সাগরের পার ঘিরে যারা এক নতুন সভ্যতার দূত হয়ে আজও অনেকের কাছে অপাঙক্তেয় হয়ে আছে।

মহিলার কাছে বিদায় নিয়ে একটু আদ্র মনেই বেরোলাম। বিদায় নেবার সময় আক্ষেপ করে বললেন, 'ইস্ আগে জানলে কি আর দুধের বাছাদের চিঁড়ে চিবিয়ে থাকতে দিই!' বললেন, 'একটু দেরি করলে তোমাদের এক্ষুনি চারটে চাল ফুটিয়ে দিতে পারি।' সূর্যের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'দেখছেন তো, আমাদের আজই ফিরতে হবে।' অনেক করে বুঝিয়ে, প্রকৃত মামুদপুরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় নিলাম।

এবার যার জন্যে আসা সেই সীতারামের কীর্তি দেখবার জন্য এগিয়ে চললাম। পথ চলতে লোকে আমাদের দিকে হা করে চেয়ে রইলো যেন জন্তু জগতে আমরা অসম্ভব কোন প্রাণীবিশেষ। অবশ্য, অতটা বললে, এঁদের কল্পনার উপর অবিচার করা হবে। গাঁয়ে অপরিচিত লোক এলে গাঁয়ের লোক একটু কৌতুহলের দৃষ্টিতেই চেয়ে থাকে তবু রক্ষে, সহস্রবার 'নিবাস কোথায়' এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় নি।

ক্রমে আমরা একটা লম্বা দালানের পাশে এসে সাইকেল থেকে নামলাম। দু'একজন লোক আমাদের দেখে বেরিয়ে এলেন। পরিচয়ে জানলাম, এটা রাণী ভবানীর জমিদারীর কাছারী। এঁরা সেই স্টেটেরই কর্মচারী। বাংলাদেশের দান-ধ্যানের ইতিহাসে যে রাণী ভবানীর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে যাঁর কীর্তি স্মরণ করে বিংশশতাব্দীর সোনার পিতলে বাটির মত আধুনিক জমিদার গোষ্ঠীর লজ্জায় মাথা নিচু করা উচিত তাঁর স্মৃতি এতদূরের এই দুর্গম অখ্যাত মাটিতেও জড়িয়ে রয়েছে ভেবে অবাক হচ্ছি, হঠাৎ একজন কর্মচারী বললেন 'আপনারা খাওয়া দাওয়া এখানেই করবেন তো?'

—'খাওয়া-দাওয়া!' অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম। ভদ্রলোক বললেন, 'এখানে অতিথি-অভ্যাগতদের খাবার দেওয়া হয়।' বুঝলাম রাণীভবানীর ঐতিহ্য—তাঁর জমিদারী নীতিকে নাকচ করেও তাঁর এই দানধ্যানকে অশ্রদ্ধা জানাতে পারবো না। তাঁর জমিদারীর সাথে।

সেই দান ধ্যানের অনিবার্য সম্পর্ক ছিল কিনা তা নিয়ে চুলচেরা বিচার এখানে করবো না।

খানিকটা বিশ্রাম ক'রে সীতারামের অবশিষ্ট কীর্তি দেখতে বেরলাম। অবশ্য, সূর্যের দিকে তাকিয়ে পা ছেড়ে দেবার ভরসা পাচ্ছিলাম না। ...মন্দিবের চারদিকে জঙ্গলের ছড়াছড়ি—হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। শুনলাম, কিছুদিন আগে বাঘও সে জায়গায় থাকতো—এখন জঙ্গল অনেক সাফ হ'য়েছে। জঙ্গলাকীর্ণ একটা ভাঙা দেউলের সামনে দাঁড়িয়ে বহু পুরনো স্মৃতির একটা গন্ধ যেন ইন্দ্রিয়ের তারে তারে অনুভব করলাম।...চারদিকেই ভাঙা ইঁটের স্তূপ। দিল্লীর প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহের কামান যে ইঁটে বিঁধতে পারেনি—মহাকালের লোহার থাবায় তা ধুলো হ'য়ে মাটির সাথে গড়াগড়ি দিচ্ছে। তবু মহাকাল মানুষকে পরাস্ত করতে পারে নি বরং মানুষই মহাকালের সেই লোহার থাবাকে বহু পরিমাণে অস্বীকার করছে—রাণী ভবানীর কাছারী বাড়ির আধুনিক সংস্করণ তারই সাক্ষী।...মাথা ভাঙা একখানা জরাজীর্ণ রথ দেখতে পেলাম। শেষ যুদ্ধের দিনে এই রথে করেই সীতারাম পালিয়েছিলেন কিনা জানি না। হয়তো এই রথের সঙ্গে সীতারামের জীবনের কত ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে। তার প্রেম, বিরহ, সাহস ও সংগ্রামের কত বিচিত্র রোমাঞ্চক ইতিহাস সমুখের ওই জরাজীর্ণ কাষ্ঠসজ্জার সঙ্গে মিশে রয়েছে। ইতিহাসে সীতারামকে খুঁজে পাইনি'—বঙ্কিম এক আধা কাল্পনিক আধা-সত্য সীতারামের প্রতিষ্ঠা করেছেন—তাতে ঘটনার চেয়ে ভাব, সত্যের চেয়ে কল্পনাই বেশি। শুধু সেই কাল্পনিক সীতারামই আমাদের ভাল লাগে—যেখানে শ্রী আছে, গঙ্গারাম আছে, ফকির আছে—যেখানে বধ্যমঞ্চে গঙ্গারাম মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকে—অজস্র ফৌজ সীতারামের ইঙ্গিতে গঙ্গারামকে নিয়ে উধাও হয়। ইতিহাসের সীতারাম হয়তো এক স্বতন্ত্র জীব। আপন

ক্ষমতালিপ্সূ রাজার লিস্টে তিনি হয়তো আর এক রাজা—প্রজার লোহিত রক্তে যার ক্ষমতার লোহিত প্রাসাদ তৈরি। সেই প্রাসাদকেই রক্ষা করার জন্যে হয়তো বুভুক্ষু, প্রতারিত, উৎপীড়িত জনতার ডাক পড়ে—এ প্রভু অথবা ওই প্রভু ছাড়া যাদের অন্য কিছু নির্বাচনের অধিকার নাই। অবশ্য, আমরা শুনেছি যে, দিল্লীর বাদশাহের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যেই সীতারাম এই রাজ্য তৈরি করেন এবং জনসাধারণও সেই ভরসায়ই তাঁর পেছনে আশ্রয় নিয়েছিল—কিন্তু, সীতারাম সেই ভরসার মর্যাদা রাখতে পেরেছিলেন কিনা আজও ইতিহাস তার উত্তর দিয়ে যেতে পারে নি। রাজা নিয়ে গর্ব করার যুগেই বেশির ভাগ ইতিহাস রচিত। রাজার নেকনজরের উপরই ঐতিহাসিকের জীবনধারা নির্ধারিত হ'য়েছে। তাই, ইতিহাস আর রাজার বন্দনা গানের মধ্যে পার্থক্য আমাদের খুব বেশি চোখে পড়ে না। ক্ষুধাশ্রয়ী জনসাধারণের স্থান সেখানে শুধু নিজেদের বন্দীশালার দ্বার রক্ষায়। বন্দীশালার কপাটে লোহা একেবারে নিরেট না খানিকটা মেকী এইটুকুই আলোচনা ছিল ঐতিহাসিকের প্রধান আলোচনা। অন্তঃশীলা নদীর স্রোতের যে পর্দা ছিল, পশ্চিমের বিস্ফোরণে সে পর্দা ছিঁড়ে গেছে ব'লেই আজ ঐতিহাসিকের দায়িত্ব বদলেছে—তার সঙ্গে আমারও দৃষ্টিকোণ। নইলে, আমিও হয়তো সেই স্তাবকতার অংশ হিসেবে আজ এই মামুদপুরের পুরনো স্মৃতির বিচার ক'রতাম।

মামুদপুরে দেখার সত্যিই বিশেষ কিছু নেই। স্থানে স্থানে ভাঙা দালানের ইঁট এই মাত্র চোখে পড়ল। তবু বহু পুরনো জিনিসের একটা মাত্র আকর্ষণ আছে তাই তার দামও এই নিরিখেই বিচার্য। নইলে, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে অনেকে বহু পুরনো স্ট্যাম্প ছবি, ও আসবাব প্রভৃতি যোগাড় করতো না। সেদিন খবরে কাগজে দেখলাম

বেলজিয়ামের (?) একজন বিখ্যাত চিত্রকরের নাৎসীদের হাত থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত ছবি দশলক্ষ টাকায় বিক্রী হ'য়েছে। এরই ভেতর পুরাতনী প্রীতির একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ব'লেই এত পরিশ্রমকে অপচয় বলে মনে হলো না। মনে হলো না যে, শীতের একটা দিন বৃথাই চলে গেল। হোস্টেলে চেয়ারে ঠেস্ দিয়ে বসে রোদ পোহান দিনের যে মূল্য—তার চেয়ে লক্ষগুণ মূল্য আজকের এই শ্রমকাতর দিনটির। প্রাণভরা প্রাণ, হৃদয় ভরা হৃদয়ের সঙ্কল্প যে এই মামুদপুরের পথেই সম্ভব এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চেয়ে আর কারও কাছে সে কথার উত্তর চাইব না। পার্থিব সীতারামের কীর্তি দেখার জন্যে না হ'ক—পার্থিব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উদার সংস্পর্শ লাভের জন্যও অন্ততঃ আজকের এই ছোট্ট ভ্রমণটির সার্থকতা উপলব্ধি করি। সেদিক দিয়েও এই মামুদপুর ভ্রমণটা শুধুই জীবনের একটা খণ্ড অধ্যায় নয়—বৃহত্তর জীবনোপলব্ধির একটা মূল্যবান সোপান। ফেরার সময় সেই কথাই ভাবছিলাম—আর ভাবছিলাম। শ্রীর পায়ের ধুলোগুলো কি আজও এর পথে পথে জমে আছে না বৈশাখের কোন দুরন্ত হলুদঝড় গোবী মরুভূমির দেশের কোন বালুকা কণার সাথে তার প্রতিবেশী সম্পর্ক স্থাপন করেছে।···কোথায় সেই মোনাহাতি, গঙ্গাগোবিন্দ। অদৃশ্য মিউজিয়ামের স্তব্ধ কোটায় তারা মহাকালের বন্দী হয়ে আছে—আর তারা ফিরে আসবে না। দুনিয়ার বুকে আজও যারা মহাকালের অনভিপ্রেত বোঝার মত এক হাতে জমি আর হাতে কারখানার চাক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা কিন্তু বলে, সীতারাম ফিরে আসবে, মোনাহাতি ফিরে আসবে—ফিরে আসবে না শ্রী, ফিরে আসবে না সমস্ত নরনারীর শ্রী। জমি আর ইস্পাতের প্রাচীরে তারা বন্দী।

শীতের সূর্য পশ্চিম আকাশে বাঁকাভাবে হেলে পড়েছে, সাইকেল বন্

বন্ করে ছুটছে—রাস্তাটা খানিকটা ভালোই। হঠাৎ ডান দিকে মস্ত একটা খাদের মত কি চোখে পড়ল—বেশ চওড়া এবং লম্বা। কচুরীতে একেবারে ঠাস ভর্তি। এখানেও সেই ফৌজ। শুনলাম, এটাই সীতারামের পরীখা—নদী তাকে আজ আপন করে নিয়েছে। আগেকার দিনে প্রত্যেক রাজধানীরই চারপাশে পরিখা থাকতো—শত্রু যাতে চট্ ক'রে ঢুকতে না পারে। মনে পড়লো বঙ্কিমের সীতারামের সেই নৃশংস পরিখার লড়াই। বাদশাহী ফৌজ যখন রাজধানীতে ঝুঁকে পড়বার উপক্রম করছে—দলে দলে নৌকা ক'রে পরিখা পার হবার জন্যে নদীর মাঝখানে এসেছে, সীতারাম রাজধানীতে নাই। হঠাৎ এক অদৃশ্য কামান থেকে এক রহস্যময় লোক গোলা দাগতে লাগল। আগুনের গোলায় গোলায় খোলার নৌকোর মত একের পর আর এক ফৌজ ভর্তি নৌকো উল্টে যাচ্ছে। রাজধানী রক্ষা পেয়েছে—কিন্তু, কামানের পাশেই ওই যে ঝলসান—কালো লোকটি প'ড়ে রয়েছে ও কে ?···

সীতারামের রাজধানীর ধুলো পেছনেই প'ড়ে থাকল। কিছু হয়তো সাইকেলের চাকায় জড়িয়ে রইলো—কিন্তু, সীতারামের রাজ্যের মধ্য দিয়েই আমরা তখনো চলেছি। মুমুক্ষুর মুখের ক্ষণিক আলোর মত আকাশের পশ্চিম প্রান্ত ঝকঝক করছে। শীতের শান্ত রাত্রি বাংলার এক ভুলে যাওয়া ঐতিহাসিক মৃত্তিকার ওপর ধীরে ধীরে নেমে আসবে ভুল থেকে ভুলের গহন গভীরে গাছপালা, মাটি ঘর সব গুলিয়ে যাবে। তবু অদৃশ্য মৃত্তিকার রন্ধ্রপথ দিয়ে কালো আকাশে যেন ধ্বনিত হবে, সীতারাম—সীতারাম—সীতারাম ছাড়া যে মাটির কোন পরিচয়ই ছিল না—আগামী কালের জনগণ সীতারামের গৌরবময় সেই মাটির ঐতিহ্য রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে পারবে—গণআন্দোলনের দিকে তাকিয়ে এ ভরসা আজ ক'রতে পারি।···বাংলার ইতিহাসে সীতারামের একটা স্থান আছে। ইনি বারো-ভূইঞার মধ্যে একজন। অথচ, এঁর

ঐতিহাসিক পরিচয় আমরা খুব বেশি পাই নি—এ সম্বন্ধে সবিস্তারে কোন ইতিহাস তৈরি হ'য়েছে কিনা জানি না; হ'য়ে থাকলেও সেটা দূর থেকেই হ'য়েছে সম্ভবতঃ। এই ভাঙা দালান আর ঘন জঙ্গলের মধ্যে আধুনিক যান-বাহনের গতিপথ থেকে বহুদূরে এই দুর্গম স্থানের ইঁট, কাঠ, পাথর কোন ঐতিহাসিককে আকৃষ্ট ক'রেছে কিনা জানি না—না করে থাকলে প্রাচীন ইতিহাসের অবগুণ্ঠন মোচন করার জন্যে কোন ঐতিহাসিকের এই ক্লেশকর দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করি। শুধু সীতারামই নয়, বাংলার বিস্মৃত সমাজ জীবনের একটা অধ্যায় হয়তো এই পুরনো ইঁটের গাদা প্রভৃতি থেকে আবিষ্কৃত হতে পারবে। এর ঐতিহাসিক মূল্য সবাই হয়তো স্বীকার করবেন।

আবার নদীর তীরে এসে পৌঁছেছি; কিন্তু অন্য পথে। এলাং-খালির পথ নয়। নদীর চোরাকাদা থেকে হুঁসিয়ার হ'য়ে (চোরাকাদায় নাকি অনেক সময় একটা আস্ত মানুষ পর্যন্ত তলিয়ে যায়, তাকে কিছুতেই রক্ষা করা যায় না) সাইকেল ঘাড়ে করে খেওয়া নৌকায় গিয়ে উঠলাম। নদীর জলে একটা ঢেউ এর রেখাও চোখে পড়ে না। শান্ত সমাহিত নদী আপনার মধ্যেই আপনি তন্ময় হয়ে আছে। কাল বৈশাখীর রুদ্র তাণ্ডবে আবার তার বহির্চৈতন্য ফিরে আসবে। এখান থেকে কিছু দূরেই নদের চাঁদ ঘাট। এই নদের চাঁদ ঘাটের নাম সম্বন্ধে একটা বেশ চমৎকার আজগুবি কাহিনী সেকালে বেশ মুখরোচক ছিল—দিদিমার কাছে ছোটবেলায় শুনেছি। নদের চাঁদ নামে একটা লোক নাকি কুমীর হবার মন্ত্র শিখে আসে। স্ত্রীর কাছে তার পরিচয় দেবার আগে সে বলে রেখেছিল যে, কুমীর হ'য়ে গেলে সে (তার স্ত্রী) ভয় পেয়ে পালিয়ে না গিয়ে যেন ওই ঘটির মন্ত্রপূত জল তার গায়ে ঢেলে দেয়—জল গায়ে পড়লেই সে আবার মানুষ হয়ে উঠবে। কিন্তু, কুমীর হবার পর তার স্ত্রী ভয় পেয়ে মূর্ছা যায়, ফলে কুমীর

নদের চাঁদ আর মানুষ নদের চাঁদ হবার সুযোগ না পেয়ে এই মধুমতীর জলেই চলে আসে। এখানে তার মা নাকি নদের চাঁদ, নদের চাঁদ বলে চীৎকার করে ডাকলে ও ডাঙায় উঠে আসতো। শেষে একদিন এক শীকারী না জেনে নদের চাঁদকে মেরে ফেলে। সেই থেকে এই ঘাটের নাম হ'য়েছে নদের চাঁদ।···গল্পটা যাই হোক শৈশবের সেই অনব্যক্ত আনন্দটুকুর জন্যে আজ সত্যিই হিংসে হয়। শৈশব কল্পনা যতই কাল্পনিক এবং আজগুবি হোক না কেন তার অপরিসীম বিস্তৃতি, তার রঙীন মাধুর্য, আজ সত্যিই কামনার বিষয়।

ধীরে ধীরে ওপারের বালুচরায় নৌকা গিয়ে ভীড়লো। সূর্য তখন ডুবেছে। তাব গোলাপী স্নেহে আকাশের পশ্চিম প্রান্ত তখনও লাল হয়ে আছে। অচঞ্চল মেঘের সারিতে লাল-নীল-বেগুনি রংএর পরশ। চারদিকেই ঘরে ফেরার আয়োজন। গরুর পাল নিয়ে ঘরমুখো রাখাল চলেছে। আকাশে বাসামুখী বকের ডানার শব্দ। গরুর গলায় বাঁধা ঘণ্টার ঢন্ ঢন্ শব্দ—সবই কেমন অনির্বচনীয়-কর্মবিরত অবকাশের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।···ক্লান্ত পায়ে আমরা কিন্তু সাইকেল ছুটিয়েছি আরও জোরে। আমাদের পায়ে অবসাদ এলে চলবে না। গলায় পূরবীর সুর এলেও থামাতে হবে—কেননা হস্টেলে আমাদের ফেরা চাই ই নইলে সুপার আবার কি বলবেন !

এইবার বারাষে নদী···অবশ্য, নদী বলা তাকে ভুল···আর ভুলই বা কেন, জল না থেকেও যদি নদী হয় (পশ্চিমে) তাহলে এই জল ভর্তি নদীই বা কেন নদী হতে পারবে না। হলোই বা সে ছোট্ট একটা খালের মত। তবু পাহাড়ী নির্জলা নদীর তুলনায় এতো সমুদ্র। এই নদীর মূল্য আরও এক কারণে—এ যশোর জেলা এবং ফরিদপুর জেলাকে বিভক্ত ক'রেছে। ওই আট হাত দূরেই ফরিদপুর···আর, আট হাত এদিকেই যশোর। কল্পনায় যেন স্পেন আর পর্তুগালের সীমান্ত

দেখতে পাচ্ছি। সীমান্তগুলো কেমন যেন ভাবময় এক রহস্য বিশেষ। ...বহুলোক পারাপারি ক'রে নৌকায় উঠছে—বারাঘে পারি দেবার জন্যে। নদীর বিস্তৃতিতে না হোক্ লোকের ভিড়ে তাড়াতাড়ি পার হওয়া সম্বন্ধে হতাশ হচ্ছিলাম। আজ বোয়ালমারী হাটের জন্যেই এই ভিড়।

বোয়ালমারী হাটে পৌঁছতে প্রায় রাত হয়ে গেল। সেই ক্রনিক ক্ষিদে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এইবার কিছু খাবো ভেবে পকেটে অবশিষ্ট টাকাটার গায় বড়ই স্নেহে হাত বুলালাম। সারি সারি কেরোসিনের ডিবে জ্বালিয়ে (কেরোসিন তখন কন্ট্রোলের রাজ্য থেকে বহুদূরে) সেই রাতে বহু বিক্রেতা বসে আছে। প্রথমেই কিছু রসগোল্লার অর্ডার দেওয়া গেল (রসগোল্লা তখন গোলাব মূল্যে বিক্রী হয় না)। ঠোঙায়-ভরা রসগোল্লা কেবল লুব্ধ আঙুলে তুলতে যাবো—সর্বনাশ! বলে কী, এ টাকা চলবে না! মাথায় বাজ পড়লো যেন। আর যে টাকা নেই, ক্ষিদে নিবৃত্তির আর কোন উপায় নেই। কি হবে? বড় দুঃখেই চোঙা ভরা রসগোল্লা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'আর তো টাকা নেই ফিরিয়ে নিন।' দোকানদার একবার কটাক্ষ করে বললো 'তাই বুঝি রাত্রে এসেচেন!' রেগে ঠোঙার রসগোল্লা গামলায় ঢালতে ঢালতে বললো স্পষ্ট শুনতে পেলাম—'ভদ্দর লোকও আজ কাল বেশ রাত্তিরির কারবার লাগায়ে দেছে দেখতিছি।' হায় রে, কলেজের স্মার্ট শচীন বাগচী, আজ তোমার মুখের দিকে চেয়ে বাজারের ওই নেড়ী কুকুরটাকে বেশি স্মার্ট বলে মনে হবে!

মনের অবস্থার কথা ছেড়েই দিন। এইরকম মনের পরিচয় কেউ কোনদিন নিতে পারেও নি—পারবেও না। ক্ষিদের চোটে অবশিষ্ট ভদ্রজ্ঞানটুকু ক্রমেই লোপ পাচ্ছিল। টাকা যখন বানাই নি—মুদ্রা যখন আমরা চালাই নি—তখন সেই অচল মুদ্রা ঘাড়ে ক'রে ব'য়ে নিয়ে বেড়াবার দায়িত্ব আমাদের বা কেন থাকবে। এই অচলকে সচল

করার চেষ্টায় নানা মতলব আঁটতে লাগলাম। এরপরে গেলাম এক খেজুরওয়ালার কাছে। বিদায় বেলায় আধসের খেজুর বিক্রী ক'রতে পারছে ভেবে (মনে রাখতে হবে তখন বিক্রী করার চেয়ে কেনার আগ্রহ এত বেশি হয়ে ওঠে নি) মনে মনে রীতিমত পুলকিত হ'য়ে খুশিভরা কথা কয়েকটা সে বলে ফেললো। কাগজে করে খেজুর বেঁধে আমাদের হাতে দিয়ে টাকাটা নিয়েছে—ওকি! ওরও চোখে যে রসগোল্লাওয়ালার দৃষ্টি। নাৎসী সৈনিকের বন্দুকের সামনে পড়েও বোধ হয় কোন পোল সৈনিকের হৃৎপিণ্ডটা এমন ধুক্ ধুক্ ক'রে নাচে নি।
ওই রকম মুখের চেহারা নিয়ে নিষ্ফল খানিকটা ঘোরাঘুরি ক'রে পেটকে বৃথাই সান্ত্বনা দিলাম। ওদিকে রাত বেশ হ'য়ে উঠেছে। কৃষ্ণপক্ষের ভাঁড়ারের যত কালো রং ছিল তাই দিয়ে রাত এক অদ্ভুত রংএ চিত্রিত হয়েছে। সেই রাতের আঁধারে সিন্ধবাদ নাবিকের সেই বুড়োর মত টাকার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে আমরা দিগ্বিদিকে ঘুরছি। ফরিদপুর এখনও প্রায় বাইশ মাইল। কী ভাবে যাবো ভাবছি—এক বন্ধু বললো, 'চলুন, টর্চের দোকানে একবার চেষ্টা দেখা যাক্। টর্চ ছাড়া তো যাওয়া যাবে না!' ব্যাটারী কিনতে গিয়েও একই দশা। তবে উদ্দেশ্যটা সেখানে বিকৃত হ'য়ে দেখা দেবার কোন কারণ ছিল না—কেন না, ডেলাইটের আলো উজ্জল হ'য়ে জলছিল। ব্যাটারীটা ফেরৎ দিয়ে এবং হতভাগা টাকাটাকে ফেরৎ নিয়ে মাথা চুলকিয়ে ব'লতে ব'লতে যাচ্ছি, 'কী করে এই অন্ধকারেই বা যাওয়া যায়'—হঠাৎ এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় যাবেন আপনারা, নতুন বিদেশী লোক বলে মনে হচ্ছে।'
চশমার ঔজ্জ্বল্যের আড়ালেও ভদ্রলোকের চোখ দুটোকে স্নিগ্ধ ব'লেই মনে হ'লো। নির্ভয়ে ব'ললাম এবং একটু বেশি ক'রেই ব'ললাম।
,—আপনারা! বলেন কী, প্রতাপ ডাক্তার থাকিতে বিদেশীরা এদেশ দিয়ে

অজানিতভাবে চলে যায়।' ভদ্রলোকের চোখের উজ্জ্বলতায় এবারে চশমার লেন্সও হার মেনে গেল। আমরা টুরিস্ট—তাহলে অচেতন ভাবেই আমরা হঠাৎ দুনিয়ার একটা শ্রেষ্ঠ মর্যাদার কাজ ক'রে ফেলেছি আর তার মূল্য স্মরণ করবার দায়িত্ব যে নগণ্য বোয়ালমারী বাজারের একজন অখ্যাত ডাক্তারের ঘাড়ে চাপবে একথাই বা কে ভেবেছিলো! নিজেদের মূল্য বাড়াবার মূল্যস্বরূপ ডাক্তারবাবুর দিকে মনটা নিজের অজ্ঞাতেই কখন ঝুঁকে পড়েছে বুঝতে পারি নি। ডাক্তারবাবু কোন্ ফাঁকে লাফিয়ে এসে আমার সাইকেল চেপে ধরে ব'ললেন,—'চলুন, ব্যাটারীর সন্ধানে এসে আপনারা আমাকে একটা মূল্যবান সুযোগ দিয়েছেন। আপনাদের ফেরা চলবে না।' শীতের রাত্রে তিনজনের দায়িত্ব মাথায় নেওয়া যে কী গুরু সাময়িক আবেগে ডাক্তারবাবু হয়তো ভুলেছেন—কিন্তু, আমরা ভুলি কি ক'রে! তাই, ওর প্রস্তাবে প্রচুর উল্লাসের হেতু থাকলেও কেমন যেন কুণ্ঠা আমাদের পেয়ে ব'সলো। দু'একবার মৌখিক আপত্তি প্রকাশ ক'রে শেষে ডাক্তারবাবুর জিদে এবং আমাদেরও মনের গভীরতম প্রদেশের সাড়ায়, তাঁর পিছু পিছু রওনা দিতে হ'লো। যেতে যেতে একবার থেমে একজনকে—আন্দাজে মনে হ'লো তাঁর কম্পাউণ্ডার—কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি সব ব'ললেন। বুঝলাম ফিস্‌ফিসানির লক্ষ্য আমরাই।

ওদিকে অত বড় হাটটা তখন ঝিমিয়ে পড়েছে। দোকানে দোকানে সেদিনের কেনা-বেচার হিসাব চলেছে, লাভ লোকসানের খতিয়ান হচ্ছে। দূর দূর গ্রাম থেকে যারা সওদা কিনতে এসেছিলো সওদা বেচতে এসেছিলো, হাটের শুকনো ধুলো তাদের পায়ে পায়ে কত কুটীর প্রাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়েছে। কল্পনায় দেখছিলাম, স্তিমিত প্রদীপের আলোয় শত শত দরিদ্র সংসারের বাপ-কাকারা খুশিমনে তাদের ছেলেমেয়েদের হাতে এক পয়সার চিনা বাদাম, দুপয়সার

ত্তিল চাট্কি, মেয়েদের কারও জন্যে হয়তো সূঁই, কার জন্যে চুড়ি তুলে দিচ্ছে। তাদেরও সারা দিনটা আশায় আশায় কেটেছে, বাপ দাদারা কোন অচীন দেশের মাঠ পাড়ি দিয়ে তাদের জন্যে অপার্থিব সম্পদ নিয়ে আসছে। এত অজস্র আশা-কল্পনা, আবেগ, কামনার কেন্দ্র হ'লো গ্রামের এই হাটগুলো। এই বিজন হাটের শব্দহীন কালো শূন্যে যেন মানুষের অদৃশ্য কামনার তরঙ্গ-ভঙ্গের আওয়াজ শুনছিলাম। বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দের মধ্য থেকে ডাক্তারের গলার আওয়াজ পেলাম। 'অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলেন! যাক্, সীতারামের দেশে গিয়ে কী দেখে এলেন বলুন।' ব'ললাম, 'এক কথায় কী তার উত্তর দেওয়া যায় ডাক্তারবাবু! যা দেখার তার চেয়ে অনেক বেশি দেখেছি ব'লেই এক্ষনি এই প্রশ্নের উত্তর দেবো না। বাড়িতে চলুন, ধীরে সুস্থে সব বলবো।' চলতে চলতে ভয় হচ্ছিল, রসগোল্লাওয়ালা, খেজুরওয়ালার চোখে না পড়ি!

বারাঘে নদী ডিঙিয়ে যেতে হ'লো আবার। অন্ধকারে নৌকায় উঠতে গিয়ে ডাক্তারবাবু হোঁচোট খেলেন।···ক্রমে আমরা ডাক্তারবাবুর বাড়িতে পৌছলাম। টিনের ঘর—শীতের রাতে টিনের ঘরে কাটাতে হবে মনে ক'রে মনটা কেমন দমে গেল। একটা ঘরে বিশ্রাম ক'রতে ব'লেই ডাক্তারবাবু কোথায় উধাও হ'য়ে গেলেন। হাত-পা ধোবার বদনা এলো—গামছা এলো—একটু পরেই চা এলো, খাবার এলো (ভয় নাই —বাংলায় দুর্ভিক্ষ তখনও লাগে নি)—যন্ত্রের মত একের পর আর আসতে লাগলো। কোথায় অন্ধকারে বন-বাদাড় ঠেলে সাইকেল পাংচার করে হাত-পা কেটে কুটে সীতারামের মাথায় অভিশাপের গন্ধমাদন চাপাতে চাপাতে হস্টেলে ফিরবো, না, লেপের তলায় (এর মধ্যে এক একজনের জন্যে এক একটা লেপ এসে গেছে) শুয়ে দিব্যি সীতারামকে আশীর্বাদ করছি আর ভাবছি জীবনের প্রথম রোমাঞ্চক

রাতটা বেশ আনন্দেই কাটবে! এর মধ্যে এক ফাঁকে বাইরে গিয়ে দেখি, দূর থেকে রান্নাঘরে ডাক্তারবাবুর গলা শোনা যাচ্ছে। একটু আরষ্টভাবেই কাছে গিয়ে দেখি, ডাক্তারবাবু ভদ্রতার উর্ধদেশ পর্যন্ত কাপড় তুলে রীতিমত বাটনা বাটতে লেগে গেছেন। 'এ কি আপনি!' চমকে উঠে ডাক্তারবাবু অপরিষ্কার হাতেই সভ্যতার সীমান্ত দেশে কাপড় টেনে নামাবার বৃথাই চেষ্টা করতে লাগলেন। অপ্রস্তুত হবার সময় না দিয়ে তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাটনা বাটতে যাবো হঠাৎ দেখি একজন বিধবা ভদ্রমহিলা দৃঢ়ভাবে এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাসি মুখ অথচ হাতের আঙুলগুলোর মধ্যে এমন একটা শক্তি ছিল, যে পাটার সামনে বসবার শক্তি হলো না। উনি বললেন দেখুন দেখি দাদার যত সব কাণ্ড বাটনা বাটার লোক রয়েছে তবু ছাড়বেন না। ভদ্রলোক বাড়িতে এলে ওঁর যেন কাণ্ডজ্ঞানও লোপ পায়। তোমরা ও ঘরে গিয়ে বসো দাদা, যাও ভাইটি খাওয়া দাওয়ার পরে তোমাদের গল্প শুনবো।'...মনে হলো, মামুদপুরের সেই লোকটাও ডাক্তারই ছিল। একটা জায়গায় কিন্তু গরমিল হলো, মামুদপুরের সেই মহিলা এই ভদ্রমহিলারই জাতের। যাঁদের এক কথায় বলা যায়, মা বোনের জাত।...হেঁসেলের জগতের একচেটিয়া অধিকার যাঁদের হাতে আজও আছে হিটলারের জ্ঞাতি গোষ্ঠীবর্গের চেষ্টায় কালও যাদের হাতে থাকবে কিন্তু, পরশু থাকবে কিনা সন্দেহ তাঁদেরই হাতে হেঁসেল ঘরের নিরাপদ শাসনের দাবী ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সেই ঘরে ফিরে এলাম।

অনেক রাতে অনেক কষ্টে রাশীকৃত খাবারের সদ্গতি করা গেল। ডাক্তারবাবুর বোন এবং এর মধ্যে আমাদের দিদি হয়ে উঠেছেন যিনি, সামনে বসে থেকে তদ্বির তদারক করে সব খাওয়ালেন কিছু-মাত্র ফেলে রাখার উপায় নেই। বাংলার গ্রামের মা পিসীমার রান্নার

সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নেই হস্টেল মেসবাসী সেই সব হতভাগ্যজনের বুঝবার উপায় নেই রান্নার উপাদেয়তা কেমন হয়েছিল। খেতে খেতে হস্টেলের ঠাকুরের রান্না সুজলা ডাল আর শস্যশ্যামলা মাছের ঝোলের কথা মনে হয়ে মাঝে মাঝে এ সবকে যেন সুখ স্বপ্নের মতই মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই স্বপ্ন হঠাৎ ভেঙে গিয়ে দেখবো হস্টেলের ডাইনিং শেডে বসে আছি, ঠাকুরের নির্বিকার হাত আশঙ্কা-জনক ভাবে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে। ডাক্তারবাবুর মত উজ্জল চশমা জোড়া তো আর স্বপ্ন হতে পারে না। হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল।...আবার পিঠেও আছে দেখছি—ভুলেই গিয়েছিলাম যে এটা শীতকাল, তারই সঙ্গে পূর্বেবঙ্গের গ্রাম।...খেতে খেতে সীতারাম সম্বন্ধে অনেক কথা হলো। সীতারামের প্রতিবেশী এঁরা তাই, কল্পিত অকল্পিত বহু উপাখ্যানই জানার কথা এঁদের। দিদি একে একে সব বলতে লাগলেন। সীতারামের রাজ্যে নাকি কোন একটা শিকল একটা পুকুরে নামানো আছে, যত টানবে ততই উঠবে সেটা। একটা পাথর আছে তুলবো বলে বড়াই করলে তোলা যায় না।...শপরাতে পুকুরের মধ্যে একটা সোনার নৌকা নাকি ভেসে ওঠে—এটা নাকি সকলেরই দেখা (সে সকল যে কারা তাদের পরিচয় পাওয়াটা সব দেশেই শক্ত, তারাও হয়তো আর এক একটা কল্পিত জীব)।...মামুদপুরের রাস্তায় রাস্তায় নাকি এখনও রাত্তির বেলা মাঝে মাঝেই ফৌজরা টহল দিয়ে বেড়ায়। ইত্যাদি, ইত্যাদি। দিদির গল্পের বিরাম নেই। বাটনা বাটতে বসতে গিয়ে যে দৃঢ় কয়েকটা আঙুলের পরিচয় পেয়েছিলাম এখন কিন্তু সে পরিচয় আদৌ নেই। এখন তিনি স্নেহাশীল মা বোন, তখন ছিলেন শিক্ষয়িত্রী। প্রদীপের রক্তাভ আলোর চারপাশে যেন বহু পুরনো দিনের জীবন ধারা আবার এসে জড়ো হয়েছে। অতি আধুনিক নতুন দিন হয়েও যেমন মেরুবাসী এস্কিমোদের বরফের ঘরে ঘরে

শীতের দীর্ঘরাত্রে অরোরাবোরিয়ালিসের রঙীন আলোয় অতি পুরনো দিনের অশরীরী কাহিনী পল্লবিত হয়, দুর্ধর্ষ বেদুইনদের রাতের তাঁবুতে আগুনের চারপাশে যে রূপকথার সৃষ্টি হয় আজ বাংলা দেশের এক আধুনিক দিনেও ঝিঁঝি ডাকা রাতের এক নিঃশব্দ প্রহরে যেন সেই কাহিনীরই আস্বাদ পাচ্ছি; তবু ভাল লাগছিলো। ছোটবেলায় রূপকথার নেশায় পাগল ছিলাম। আজ শীতের রাতে স্নেহের আবরণে যেন সে পাগলামি আবার অনুভব করলাম। এঁটো হাতেও দিদিকে বকিয়ে চললাম। শেষে হঠাৎ সবারই খেয়াল হলো অনেক রাত হয়েছে। দিদি বললেন, 'যাও, আজকের মত শোও গে সব, কাল আবার হবে।' করুণ ভাবেই বললাম, 'কাল যে ভোরেই আমরা যাচ্ছি দিদি!' উত্তরে তিনি এই টুকুই শুধু বললেন, 'আচ্ছা যাচ্ছো, সে হবে।' বাইরে বেরিয়ে দেখি গরম জলের ঘটি হাতে ডাক্তারবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। বললাম, 'আপনার জ্বালায় তো অস্থির! আপনি ডাক্তারী না করে আর কিছু করুন, অনেক উন্নতি করতে পারবেন!' উত্তরে বললেন তিনি, 'আপনাদের আশীর্বাদে এই উন্নতিই আমার যথেষ্ট!' বুঝলাম, সাধারণ বাঙালীর মত জীবনের ঊর্ধবিস্তৃতির আকাঙ্খা নেই; যেন পদ্মার চর—দয়া করে পদ্মা যেটুকু সৃষ্টি করে তাতেই খুশি। "যা পেয়েছি" দেশের এইসব স্বল্প প্রাণ অধিবাসী আমরা—তাতেই আমাদের রান্নাঘরের প্রদীপের আলোর তলে পুরনো জীবনের কান্না শোনা যায়।

শীতও যেমন পড়েছিল লেপগুলোও তেমনি আরামের ছিল। শিয়ালের ডাকে থমথমে রাতের প্রহরগুলো কাঁপছিল শুধু। ঘুম ভেঙে একেবারে তন্দ্রার ঘোরে ঝিঁঝির পাথায় পাথায় বহু দূর জীবনের কোন বাণী শুনতে পেলাম, যে জীবন মরেও মরেনি, সহজে মরে না, সহজে মরবেও না, সেই জীবনেরই বাণী।

পূর্ব জানালা দিয়ে কখন সোনালী আলো এসে জড়িয়ে ধরেছে জানতেও পারিনি। শচীনবাবুর ধাক্কায় ঘুম ভাঙলো। শচীনবাবু বললেন, 'কি, সীতারামের স্বপ্ন দেখছিলেন নাকি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে।' ভালো করে মনে করতে পারছিলাম না কোথায় আছি, চোখে তন্দ্রার জড়তা। হঠাৎ একই সঙ্গে মনের মধ্যে মস্ত একটা কাহিনী যেন জেগে উঠল। কাহিনী থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম ডাক্তারবাবুর ডাকে। হাতে চায়ের কাপ। মুখে তেমনি অমায়িক হাসি। পেছনে মুড়ি আর নারকেল নিয়ে দিদি। যেন এক ঝলক পূবালী আলো ঘরের হাওয়ায় হাওয়ায় খেলে গেল। 'দেখুন দাদার কাণ্ড! টুরিষ্ট না কি বলে আপনাদের ইংরেজী কথায় তাদের দেখা পেলে দাদার আর আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এই মাসখানেক আগে সিংহলের দুটো ছোকরা টুরিষ্ট সাইকেলে যাচ্ছিল এদিক দিয়ে, নিয়ে এলেন তাদের টানতে টানতে।'

'সিংহলের ছোকরা—বলেন কি, এই ফরিদপুরের দুর্গম গাঁয়ে!'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, সিংহলেরই—তারা পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছে, ভারী মজার ছেলে তারা।'

সিংহলের লোনা সমুদ্রের হাওয়ার আঘ্রাণ যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে দিয়ে অনুভব করলাম। নারিকেলের কুঞ্জ-ছাওয়া সাগর পারের সিংহল—তারও বাণী এই অজানা গাঁয়ের কুটীরে ঢুকেছে! মনে করেও বেশ লাগছিল।

চা রাখতে রাখতে ডাক্তারবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, বেশ স্ফূর্তিবাজ ছোকরা দুটো। যে দুদিন ছিল নাচ গান হল্লায় বাড়িখানাকে যেন একেবারে মাত করে রেখেছিল। তাদের কথাও আমরা বুঝি না—আমাদের কথাও তারা বোঝে না। বড়টা শুধু ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলতে পারে, ওই পর্যন্ত। কিন্তু, তাদের কথা না বুঝলেও—তাদের মনের

ভাষা আমরা বুঝেছিলাম। সত্যিই, খুবই অমায়িক হাসিখুশি ভরা। তাদের বিদায় নেবার সময় রাস্থ কেঁদেই অস্থির!' বোনের প্রতি কটাক্ষ করলেন।

দিদিও পাল্টা কটাক্ষ করে জুড়িয়ে যাওয়া চায়ের দিকে আঙুলের ইঙ্গিত করলেন। এবার আবার রাত্রের সেই আঙুলের আভাস পাচ্ছি।

চা খেয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাঁর বাড়ির আশ-পাশে দেখতে বেরলাম। চারদিকেই আম, সুপারী, কলা, নারকেল বন। একটা নতুন পুকুর দেওয়া হয়েছে, তার চারপাশ ঘিরে নতুন কলাগাছ পোঁতা হয়েছে। গ্রামের টাট্‌কা গন্ধ হাওয়ায় ভাসছে। নীল পশ্চিম আকাশে যেন সমুদ্রপারের সিংহলের শ্যামলতা। সিংহলের কথাই থেকে থেকে মনে হচ্ছিল। ইভান বুনিনের-এর 'জেন্টলম্যান ফ্রম সান ফ্রান্সিস্‌কো'র সেই সিংহলী গল্পটার কথা মনে হ'লো। শ্যামল নারিকেল কুঞ্জের ছায়ায় ছায়ায় খেয়ালী পর্যটককে নিয়ে রিকৃসা ছুটছে। রিকৃসাওয়ালার বিশ্রাম নেই, ভবঘুরে পর্যটকের মনের খেয়াল তাকে কুঞ্জ থেকে কুঞ্জে, ছায়া থেকে ছায়ান্তরে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। পেটের জ্বালায় সেই পর্যটকের খেয়াল মেটানো তার ভাল লাগছিল না খারাপ লাগছিল বলা মুস্কিল—হয়তো দুই লাগছিল।···সেই নীল সমুদ্রের দেশের সিংহল। ডাক্তারবাবু সত্যিই অমায়িক।

আমাদের সকালেই রওনা হবার কথা। দিদির চাপে এবং আমাদের দুর্বলতায় এ বেলাটা থেকে যেতে হ'লো। খাওয়া-দাওয়া করে বিকেলে রওনা হলাম। দিদির চোখের জল আবার ঝরল, ডাক্তারবাবু চোখ ফিরালেন—অশ্রুর আভাস নিয়ে হাসি, বললেন, 'আবার এস কেমন?' খানিকটা এগিলে এলেন—বিদায়ের সময় তেমনি ভাবেই যন্ত্রবৎ বললেন, '—আবার আসবেন কেমন!'···মামুদপুরের ডাক্তার শুনলে বলতেন, 'পাগল, যতসব পথ-কুড়নো লোকের প্রশ্রয় দেওয়া!···'

বহুকষ্টে ভরা সন্ধ্যের সময় যখন হস্টেলে ফিরলাম তখন দেখলাম, সুবিমলের সাইকেলের টায়ারে আদৌ হাওয়া নেই, শচীনবাবুর চশমার খাপ পড়ে গেছে—আমার পায়ের একটুকরো চামড়া নেই—সীতারামের খরচের খাতায়ই তারা স্থান পেয়েছে।

জালিয়ানওয়ালা-বাগের স্মৃতিতীর্থে

জেলের সেলে বসে ভাবছিলাম, ইস্, নিখিল ভারত কিসান সভার ভাকনা (পাঞ্জাব) অধিবেশনের মাত্র আর কয়েক দিন বাকী! কোনদিন কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দেবার সুযোগ হয়নি—এক, অল বেঙ্গল স্টুডেণ্টস কন্‌ফারেন্সে যোগ দিয়েছিলাম—তবে সেটা তেমন কিছু নয়। এবার এই কন্‌ফারেন্সের সুযোগ গ্রহণ করব ভেবে আগে থেকেই নানা অসুবিধা মুলতুবী রেখেও এবং দু'এক জন বন্ধু বান্ধবের সাহায্য নিয়ে, তৈরি হয়েছিলাম। কিন্তু, গভর্ণরের সবুর সইবে কেন। আর কর্তার সবুর সইলেও অনুচরদের সইবে কেন? মালদহ শহরে গভর্ণর আসার দু'দিন আগে এক অলক্ষুণে ভোরে আমার মাসতুতো ভাই-এর মেয়ে তারার সঙ্গে নিত্য অভ্যাস মত প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছি—সামনেই খাঁকীর কোর্তা-পরা একজন নিশাচর দাঁড়িয়ে। এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনিই অমল সান্যাল?' আত্মীয়-স্বজনের চাপানো নামকে আর অস্বীকার করি কেমন করে! আর আমি অস্বীকার করলেও তারাই বা স্বীকার করবে কেন! আমাদের কায়া আর তাদের ছায়ায় তো বিলক্ষণ মাখামাখি এর আগে থেকেই হ'য়ে আসছে। মনের গভীরে অপ্রত্যাশিত হ'লেও আজকের এই অপ্রত্যাশিত মুহূর্তটিকে অভিসম্পাত না দিয়ে পারলাম না। এই ধরনের প্রাতঃভ্রমণ স্বল্প কিছুদিন আগেও একবার হয়ে গেছে—তবে, একদিন মাত্র থানা-হাজতের প্রায়শ্চিত্তেই তার

পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। আবার ক'দিন প্রায়শ্চিত্তের ঘূর্ণিপাকে জড়িয়ে পড়লাম বুঝতে না পেরে একটু বিব্রতই মনে হচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত পাড়ার বহু লোকের বিষণ্ণ দৃষ্টির সামনে দিয়েই থানার গারদে গিয়ে উঠলাম। ভোরের আকাশের মতই পাণ্ডুর মুখ নিয়ে তারা ফিরে গেল। এই নিয়ে দু'দিন যারা তার প্রাতঃভ্রমণ মাটি করল তাদের সে কোনদিনই ক্ষমার চোখে দেখতে পারবে না বোধ হয়।

সেই থানার গারদ থেকে এই জেলের সেলে বসে শুধু প্রহর গুনছি আর ভাবছি, হয়ত কালই আমাদের ছেড়ে দেবে—কেননা, গবর্ণর তো কালই চলে গেছে। ফ্যাসিবিরোধী মুক্তির লড়াই-এর দিনে একজন লোকের আবির্ভাব মাত্র এইভাবে আটক মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই বসে ভাবছিলাম, সিঙ্গাপুরের নৌদুর্গেই একবার এর জবাব মিলেছে, আমাদের পূব দুয়ারেও আবার তার জবাব মিলেছে। গণতন্ত্রের ভেতরকার অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘূর্ণিপাকেই তার আরও জবাব মিলবে। ঢং ঢং করে জেলখানার ঘড়িতে রাত এগারোটা বেজে গেল। পাশে বন্ধুদের গভীর ঘুমের আভাস পাওয়া যাচ্ছে—মাথার ওপর কেরোসিন তেলের আলোটা টিম টিম করে জ্বলছে। পাহারাদার হেঁকে গেল এক, দুই, তিন,···আট, দশ, পনেরো, ত্রিশ···তনম্বরে চল্লিশ জন—খবর আচ্ছা। হিন্দুস্থানী সান্ত্রীর ভারী বুট মচ মচ করে আর্তনাদ করে উঠল। কাতর কয়েদির বিক্ষুব্ধ বুক থেকে ঘুমের ঘোরেও, যন্ত্রণার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—এ আওয়াজের উৎসও হয়তো গভর্ণরের ঐ বিজয়োৎসব।

—পাশের বন্ধু বললো, 'কিরে অমল, এখনও ঘুমাস নি—'

'—কই আর ঘুমাচ্ছি—ডাকনা আর আমাকে ঘুমতে দিচ্ছে কই!' বাস্তবিক জেল থেকে মুক্তির এই ধরনের তাগিদ আর কোনদিন অনুভব করিনি। শুধু যে কন্‌ফারেন্সই এই তাগিদের কারণ

তাই নয়—আবার তাও বটে। পাঞ্জাবে হ'চ্ছে কন্‌ফারেন্স। কন্‌ফারেন্সে একদিকে যেমন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভ করা যাবে। তেমনি এক ঐতিহাসিক পীঠস্থানের সাক্ষাৎ পরিচয়ও পাওয়া যাবে—ভুলতে পারি নিঃ পাঞ্জাব জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রস্মৃতি। এদুটো কারণ ছাড়াও টিউশনি আর এক ঘেয়ে পলিটিক্‌স্, তার সঙ্গে নীরস—একঘেয়ে জীবনে কেমন একটা শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা অনুভব করছিলাম। জীবনের বহুমুখী সংগ্রামে বাইরের আলো বাতাসের সাহায্য একান্ত ভাবেই কামনা করছিলাম—এর সাথে যোগ হয়েছিলো নিজের যাযাবর স্বভাব খানিকটা। তা ছাড়াও হয়তো আরও নানা উদ্দেশ্য স্পষ্ট এবং অস্পষ্টভাবে মনের অতলে জ'মেছিলো। কিন্তু, সবাই এসে বাধা পেলো গবর্ণরী বাঁধের সামনে। তাই, মনে ও দেহে প্লাবনের উচ্ছ্বাস গভীরভাবেই অনুভব করছিলাম। তারই মূর্ত প্রকাশ আজকের এই তন্দ্রাহীন রাতের কারায় সান্ত্রীর বুটে আর পাহাড়াদারের গলার আওয়াজ।

সকালবেলা জেলের প্রাঙ্গণে উদ্‌গ্রীবভাবেই পায়চারী করছিলাম। সামনেই টমাটোর ক্ষেত! জেলের তরকারীর অভাব পুরাবার জন্যে যা পারো খেয়ে যাও কোন আপত্তির কারণ নেই—কেবল, কর্তৃপক্ষের কাছে দয়া করে নালিশ করে না। ২নং ওয়ার্ডের বারান্দায় পায়চারী করছেন শুভ্র খদ্দরধারী-কংগ্রেসের প্রীতিমুগ্ধ (এমন কি তাঁদের পরিবারে কংগ্রেসের নেতৃত্বও ছিল এক সময়) শহরের প্রসিদ্ধ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। জেলখানার তাঁর মর্যাদা কিন্তু চোরের পর্যায়ভুক্ত নয়। তাঁর সাজাও হয়ে গেছে। তবু নিষ্ঠাবান কংগ্রেস সেবী তো তিনি, পবিত্র খদ্দর অঙ্গে ধারণ করেন পাছে দেশসেবক বলে তাকে চিনতে কষ্ট হয় এবং আমার খুবই আলাপ আছে, আমাদের না খাইয়ে মারার জন্যে দায়ী হলেও দেশসেবা হিসেবে তাঁর মর্যাদা শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষুণ্ণ হবে না। জেল গেটের ফুটো দিয়ে কার বড়

বড় দুটো চোখের আবির্ভাব হলো যেন। চোখে ইঙ্গিত। ঠিক এই ধরনের এক জোড়া চোখেরই যেন প্রতীক্ষা করছিলাম। কাছে এগিয়ে গেলে চোখ জোড়া ফিস্ ফিস করে বললো,আজই আপনাদের ছেড়ে দেবার অর্ডার এসেছে তৈরি থাকুন। এমন ফিস্‌ফিস্ কথা জীবনে অল্পই শুনেছি বলে মনে হয়। কোথায় সেই লাহোর ভাক্‌না অমৃতসর জালিয়ানওয়ালবাগ মিনিট খানেক আগেও যারা হাজার হাজার মাইল দুরে ছিলো এক মিনিট বাদেই তারা যেন একেবারে হাতের মুঠোয় এসে গেলো। পাঞ্জাবের সবুজ গ্রামের ক্ষেতের বাতাস যেন সমগ্র ইন্দ্রিয়ে দোলা দিয়ে গেলো।···বন্ধুদের মধ্যেও চাঞ্চল্যের ভাব। কারও কারও চোখে মুখে হতাশা, আরও একটা কেস্ ওদের মাথার উপর ঝুলছে। তাদের দিকে চেয়ে নিজেদের মুক্তিও যেন বিস্বাদ লাগলো। চুলোয় যাক্ ভাবনা। অমৃত নয়। চুলোয় যাক্ লাহোর···কিন্তু, এ উচ্ছ্বাসের আর দাম কতটুকু। নির্দিষ্ট সময়ে লোহার গেট্ খুলে গেলো। আটক বন্ধুদের জামীনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করার অঙ্গীকার নিয়ে সেই খোলা গেট দিয়ে বাইরে বেরলাম। পেছেন তাকিয়ে দেখি, আমাদের বুড়ো কৃষক দাদার (ইনিও রাজনৈতিক অপরাধে বন্দী, বয়স প্রায় সত্তর) চোখ দুটো এখনও দরজার ফাঁকে আমাদের দিকে স্থিরভাবে ফেরানো রয়েছে। জেলের বন্দীতে বন্দীতে বিচ্ছেদের এই ব্যথাতুর দৃষ্টি আরও কত প্রত্যক্ষ করেছি।

মাত্র একটা দিন আর হাতে ছিলো। আমার সহযাত্রী এক বন্ধু আমার আটকের কথা শুনে হতাশ হয়ে একাই রওনা হবার ব্যবস্থা করছিলেন। শেষে দুজনেই রওনা হওয়া গেল। মালদহ ষ্টেশনে গাড়ীতে আর এক বন্ধু সহযাত্রীর সঙ্গে মিললাম।···মালদহ জেলার সীমানা না ছাড়া পর্যন্ত মনের অস্বোয়াস্তি কাটছিল না। তিন মাসে যেখানে কারণে অকারণে তিন তিনবার আটক পড়তে হয়, জন্ম-মৃত্যুর মত সেখানে সবই অনিশ্চিত ছাড়া কী ?

পাঞ্জাব মেলের একখানা স্বতন্ত্র তৃতীয় শ্রেণীর কামরা বাংলার ডেলিগেটদের জন্যে রিজার্ভ করা হয়েছিল। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা নিয়েই তাতে উঠে বসলাম। আরও দুজন ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ে ফিরে গেলেন। মরি তো পাঞ্জাবের মাটীতে গিয়েই মরবো—এইভাব নিয়েই ট্রেণে চড়লাম। মেলট্রেণের হু হু শব্দের মত শব্দ মাঝে মাঝে মাথার মধ্যে হচ্ছিল। জ্বরতপ্ত দুঃস্বপ্ন ভরা রাত যেন-শিয়রে নেচে বেড়াচ্ছে। কাদের চীৎকারে, কেমন সমস্ত অদ্ভুত শব্দ যে ভেসে আসছে তা ঠিক বুঝে উঠবার মত নয়। আমার দুরবস্থা দেখে বন্ধুরা আমার শোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।···মোগলসরাই, কাশী লাক্ষ্ণৌ,···রূড়কী, আম্বালা একে একে পাড়ি দিয়ে এসেছি। ট্রেণের চলতির যেন আর বিরাম নেই। মনে হচ্ছে, পৃথিবীর শেষ প্রান্তে না পৌছে আর সে থামবে না। দ্বিতীয় দিনে একটু ভাল বোধ করছিলাম। পাঁউরুটি মায় দুধ কমলালেবু আর সন্দেশ খেয়েই পথ বেশ পাড়ি দিচ্ছি।

ইউ,পি'র রূড়কীতে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে—প্রচুর সৈন্য পাঁয়তারা কস্‌ছে দেখলাম। আম্বালাতেও সেই পাঁয়তারা লক্ষ্য করা গেল। পাঞ্জাবের দিকে ইউ, পি'র যে অংশ সেই অংশ বেশ শস্যশ্যামলা। মাঝে মাঝে সুন্দর মাঝারি ধরনের খাল ক্ষেতের মাঝ দিয়ে বয়ে গিয়ে ইউ, পি এবং পাঞ্জাবের মাটিকে শস্যশ্যামলা ক'রে তুলছে। জলসেচের ব্যবস্থা এই দুটো প্রদেশেই খুব উন্নত। সন্ত্রাসবাদী ফৌজের পীঠস্থান এই দু'টি প্রদেশের জন্যে অপেক্ষাকৃত সুব্যবস্থার পেছনে রাজনৈতিক কোন ইঙ্গিত আছে বলেই অনেকে সন্দেহ করেন।···এ—ই আম্বালা। ভারতীয় পৌরাণিক দেবতারা হিমালয়ে বাস করতেন (গ্রীসের দেবতারা যেমন অলিমপাসে বাস করতেন এবং প্রাচীন দেবতাদের আবাসস্থল প্রায়ই পাহাড়-পর্বত বলেই শুনতে পাই) বলে শোনা যায়। আধুনিক ভারতীয় দেবতারা—অন্ততঃ গ্রীষ্মকালে হিমালয়ে বাসের

ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। সেই তাঁদের শৈলাবাস সিমলা আম্বালা থেকেই মোটরে যেতে হয়। সেইদিক দিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গার পাশ দিয়ে যাচ্ছি ভেবে নিজের ওপরও একটু শ্রদ্ধা এলো।

বিপাশা নদী পেরিয়ে পাঞ্জাবের সীমান্তে ঢুকেছি। ব্রিজ-এর গায়ে নামটা দেখে কত কথাই মনে হলো। মনে আছে, পাঞ্জাবের পাঁচটা নদীর নাম মুখস্থ করতে কি বেগই পেতে হয়েছে আর সবথেকে কঠিন লাগতো আমার কাছে এই বিপাশা নামটা মনে রাখতে। যে নদীটি শৈশব কল্পনায় এত দিন ছিল আজ তারই বুকের ওপর দিয়ে পাড়ি দিয়ে চলেছি ভেবে বেশ একরকম গর্ব এবং রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম এবং স্পষ্টতাও বোধ হচ্ছিল কত। বাস্তব-বিচ্ছিন্ন শিক্ষা যে কত অসার্থক, নিজের স্কুলের প্রাচীরের আড়ালে ভূগোলকে উপলব্ধি করা যে কি দুর্বিষহ অবস্থা তা আজ মর্মে মর্মে অনুভব করলাম। যখন নায়গ্রা জলপ্রপাতের বর্ণনা পড়ি অথবা পিরামিডের শিল্প-দক্ষতার বিশ্লেষণ শুনি তখন একধরনের অসহায়তা এবং অবোধ্যতা মনকে আচ্ছন্ন করে—এই আচ্ছন্ন মনই ভূগোলের মূল্যবান শিক্ষা এবং আনন্দ থেকে ছাত্রজীবনকে বঞ্চিত করে—নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আজ সেকথা স্পষ্ট মনে হচ্ছে। কোন্ একটা বই-এ পড়েছিলাম বেলজিয়াম এর ছেলেদের ভূগোল পড়া সম্পূর্ণ করার জন্যে এরোপ্লেনে প্রসিদ্ধ স্থানগুলোতে ছাত্রদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে। রাশিয়াতে ছাত্রদের নাকি ট্রেণ ভ্রমণের যথেষ্ট কনসেশন আছে। আজ এই বিপাশার বুকে বসে তার চেয়ে সত্য—অন্ততঃ ওই দিক দিয়ে আর কিছু মনে হচ্ছিল না।

ইউ, পি'তেই উঁটারোহী রঙীন ওড়না-ওড়ানো মেয়েদের দেখেছিলাম। পাঞ্জাবের মাটিতে যেন তাদের সংখ্যা বেড়েই চললো। উঁটের নাকাল ধরে পুরুষ আগে আগে চলেছে—লাল—নীল ওড়নাজড়িয়ে উঁটে

চড়ে ছেলে-মেয়ে তার পাছে পাছে চলেছে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল, উঁট বেশ তালে তালে ছুটে চলেছে। উঁট এর আগে দেখলেও গাধা আর ঘোড়ার দেশের বাঙালী আমরা—আমাদের কাছে এ দৃশ্য অভিনবই। ট্রেণের মধ্যে মাঝে মাঝে রাজনৈতিক আলোচনার ঝড় চ'লছে। নির্বাচিত সভাপতি বঙ্কিম মুখার্জি আমাদেরই সহযাত্রী। গোপালবাবুর সুক্ষ্ম 'হিউমার' মাঝে মাঝে ভালই লাগছিল। হঠাৎ উত্তর সীমান্তে বাঁকা বাঁকা হিমালয়ের আউট লাইন চোখে পড়ল। যখন একঘেয়ে ভ্রমণের ক্লান্তিতে অবসাদ লাগছে, বসবার নানাপ্রকার প্রক্রিয়া অবলম্বন করেও যখন শারিরীক আস্বোয়াস্তির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছি না—তখন ওই সীমান্তের নীল চিহ্নটুকু যেন আমাদের চোখে সুধা ঢেলে দিয়ে গেল। কি—ই বা দেখলাম আমরা—একটানা নীল—ধূসর রং-এর একটা আবছায়া সীমান্তের মাথায় ঘুমিয়ে আছে অথচ, কত কী-ই যেন আমরা তার মধ্যে দেখছিলাম। আমাদের মগজে রয়েছে হিমালয়ের এক বিরাট ঐতিহ্য, কতরূপ কথা, পৌরাণিক কাহিনীর প্রস্রবন, ইতিহাসের মূল্যবান কত অধ্যায়—সাধু-সন্ন্যাসী, দেবতা-অপদেবতা, মৃত-সঞ্জীবনী লতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ কত কল্পনার কত অফুরন্ত কাহিনী—সব যেন আজ ঝরণা ধারার মত চোখের রেটিনায় নেমে আসতে লাগল। গোধূলির রং মাখানো হিমালয়ের গায়ে যেন আমাদের একটা বিরাট অতীত রেখান্বিত হয়ে উঠলো। তাই, অস্পষ্ট হলেও হিমালয় আমাদের —অন্ততঃ আমার চোখে লাগল ভালো সামান্য হয়েও এক অসামান্য জীবনের পটভূমিকায় সে নাড়া দিয়ে গেল।

আমাদের কামরা আগে থেকে অনেক খালি হয়ে গেছে। বন্ধুবর অবনী লাহিড়ী সপরিবারে এই গাড়িতেই যাচ্ছিলেন—অবনীরও ইনফ্লু-য়েঞ্জা হাওড়ায় পাকড়াও করে—তাই, তারি পরিবারের সাথেই মাঝপথে বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট স্টেশানে তাকে নেমে যেতে হয়। গাড়িটাও

খালি খালি—তারপরে রিজার্ভ—চলেছিও এক অজানা দেশের মাঝ দিয়ে—তাই· বিকালের এই স্নিগ্ধ মুহূর্তটিকে বেশ লাগছিল। সামনেই জানালার কয়েকহাত দূর থেকেই নীল সবুজ রং-এর ঘাসের ক্ষেত সীমান্তে গিয়ে ঠেকেছে—সামনেই হিমালয়ের বিরাট কায়া—অথবা ছায়া বললেই ভাল হয়—এঁকে-বেঁকে ,আমাদের সহযাত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অস্ত সূর্যের জাফরানী আলোয় হিমালয়ের 'স্নো পিক' গুলো মাঝে মাঝে ঝিল মিল করছে। 'স্নো পিক' দেখে মনে পড়লো, নাঙ্গা পর্বতের কথা—জার্মান অভিযাত্রী দলের নেতা হের মের্কেল নাঙ্গা-পর্বতের তুষার শৃঙ্গের গায়েই চিরসমাধি লাভ করেছিলেন। ওই ঝিলমিলে তুষার শৃঙ্গ সে কথাটা আজ স্পষ্ট করে মনে করিয়ে দিল।

গাড়ির ধুলোয় ধুলোয় আমরা সব মুর্তিমান শ্মশানের ধুলোর মত রুক্ষ এবং উদাসীন হয়ে উঠেছি—এখন কিছু গেরুয়াবন এবং কিছু রুদ্রাক্ষের মালা পেলেই ওই হিমালয়ের পাদপীঠে তীর্থযাত্রায় বেরতে পারি। এক স্টেশানে নেমে রুটি আর দুধ খেলাম। পাঞ্জাবের রুটির খ্যাতি আছে, কিন্তু, সেটা যে এত তা জানতাম না। রুটিটা গমের বলে মনে হলো না—হয়তো বজরার। এদিকে প্রায় স্টেশানেই রুটি আর দুধ পাওয়া যায়! বাংলার দারুণ সঙ্কটের মাঝ থেকে আমরা আসছি —তাই এসব আমাদের কাছে অস্বাভাবিকই লাগছিল।

মাঝে মাঝে পাঞ্জাবের গায়ের পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছিলো। বাড়িগুলো এক অদ্ভুত ধরনের দুর্গের মত তৈরি। চারদিকে মাটির নিচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এমন কি ছাদটা পর্যন্ত পাচিলের সঙ্গে ঢেউএর মত ক'রে মিশিয়ে দেওয়া। একটা সদর দরজা জানালার মাত্র আছে—দরজা আর কোন চিহ্ন নজরে এলো না। এই বাড়িগুলোই ঐতিহাসিক পাঞ্জাবের স্মৃতি মনে করিয়ে দিল। প্রাচীন কালের যত বড় বড়

অভিযান শক, হুন, মোগল, পাঠানের অভিযান সব এই পথে এসেছে- লুট-পাট, নরহত্যা, ধ্বংস পশ্চিমের নৃশংস টাইফুন এ পথের সবগুলো ধুলোর কণাকে হয়তো উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে নি—সে ঐতিহাসিক সাক্ষী হ'য়ে আজও কোন ঐতিহাসিক কণা পথ প্রান্তে হয়তো পড়ে আছে। সে স্মৃতির ভ্রান্তি তাদের হয় নি—হ'তে পারে না। দস্যুর পায়ের আঘাতের ক্ষত হয়তো আজ তাদের বুকে বিধে আছে। ঝক্, ঝক্, ঝক্। পাঞ্জাব মেল ছুটছে। যে পথে শোণিতস্রাবী সংগ্রাম হ'য়েছে সেই পথেরই ওপর দিয়ে বিংশ শতাব্দীর এক মহাবিস্ময় ছুটে চলেছে। হুস্ হুস্ ক'রে যেন তাদের সেই স্তিমিত গতির ছন্দকে সে ধীক্কার দিয়ে যাচ্ছে। নীল শূন্যে এরোপ্লেনের পাখায়ও যেন সেই ধিক্কার। এর কাছে প্রাচীন ঘোড়সোয়ার সৈনিকের গতি পাঞ্জাব মেলের গতি দুই-ই হাস্যকর বস্তু বিশেষ—মিউজিয়ামে স্থান পাবার উপযুক্ত। ঘোড়সোয়ার সৈনিক অনেকটা মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে—কিন্তু আগামীকাল হয়তো এই পাঞ্জাব মেলকেও লাহোরের কোন মিউজিয়ামে পুরে রাখবে অথবা, কোন দুরন্ত শিশুর খেয়াল মেটাবার জন্যে পাঞ্জাব মেলকে নিয়ে মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করা হবে। পৃথিবীটা সত্যিই এমন আজব হ'য়ে উঠেছে—নইলে, ১৪মিনিটে নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডনে আসবার নানারকম পরিকল্পনা হবে কেন! মাঝে মাঝে লাইনের পাশেই নানারকম ফলের ক্ষেত দেখা যাচ্ছিলো, 'Punjab is a land of gardens'—কথাটা মিথ্যা নয় তাহলে। গাড়ির দু'ধার দিয়ে পাঞ্জাবী মেয়ে-পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন "The Punjabis are the best conversationalists and story tellers in the world"—The lancer at large বই-এ Feats Brown-এর সেই কথাটা মনে পড়লো। গত যুদ্ধের একটা ছবি মনে ভেসে উঠলো— ফ্রান্স-এর রাজপথে পাঞ্জাবীরা মার্চ ক'রে চ'লছে—তাদের ঘিরে রয়েছে

উৎসুক এবং উল্লসিত জনতার ভীড় তারা নানা দেশের —কিন্তু, সবার উপরে ওক্ গাছের মত অটল এবং উঁচু মাথা যাদের—তারাই—সুবিখ্যাত পাঞ্জাবী। তাদের বলিষ্ঠ কাঠামো দেখে আমাদের গর্ব আসে কিন্তু সেই বলিষ্ঠ কাঠামো যে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ ভাবে যুগ যুগ ধ'রে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পুষ্ট ক'রে এসেছে তাতেই আমাদের দুঃখ—মর্মান্তিক দুঃখের সঙ্গে মনে পড়ছে ডালহৌসির কথা। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিলাতে ব'সেই ডালহৌসী পরম নিশ্চিন্ত ভরে বিলাতের সন্ত্রস্ত রাজনীতিবিদদের লক্ষ্য ক'রে ব'লেছিলেন,—"ভয় নাই হিন্দুস্থানী সিপাহীদের বিরুদ্ধে শিখ এবং গুর্খারা বিশ্বস্তভাবে শয়তানের মতই লড়বে।" ভারতের প্রথম জাতীয় উত্থানের ব্যর্থতার ক্ষতে পাঞ্জাবী সৈনিকের বেয়নটের খোঁচা রয়েছে—তবে কি যুগযুগান্ত ধরে পাঞ্জা'ব শুধু জারের ভাড়াটে কসাকদের ভূমিকাই অভিনয় ক'রবে? তার উত্তর গুরুমুখ সিং, পৃথ্বী সিং, ভগৎসিং—যারা ফাঁসী কাঠে মৃত্যু বরণ ক'রে, দ্বীপান্তরের লোনা মৃত্যুর দুয়ারে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রেছে—তার উত্তর দিয়েছে লালা লাজপৎ রায়ের পাঞ্জাব, ডাঃ সত্যপাল এবং আরও হাজার হাজার দেশ-প্রেমিক পাঞ্জাবীর পাঞ্জাব। তার পরিচয়ই তো পাবো গিয়ে অমৃতসরের ভাকৃনার মাঠে।···গাড়ি দুলতে দুলতে চ'লেছে। বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির ক্রম বিকাশের একটা ছবি যেন আমাদের চোখের উপর দিয়ে খেলে যাচ্ছে। বাঙালী, বিহারী, যুক্ত-প্রদেশী, পাঞ্জাবী—দুর্বলতা থেকে সবলতার ক্রমবিকাশের একটা ধারা-বাহিক স্লাইড্ পর্দার ওপর অভিনীত হচ্ছে। কলকাতার যে মানুষকে লিকৃলিকে ছড়ি হাতে টিক্ টিক্ ক'রে তালপাতার সিপাহীর মত ফুটপাতে ছুটতে দেখেছি, বিহারের মাটিতে তার লিকৃলিকে ছড়িটা ছোটখাট একটা লাঠিতে হঠাৎ পরিণত হ'য়েছে—শূন্য মাথায় পাগড়ী উঠেছে—পেশীগুলো একটু ফোলা, বুকটা একটু উঁচু তবু, তার পায়ের

লিক্‌লিকে গতির একটা আভাস ছিলো। যুক্তপ্রদেশের মাটিতে এসে সে লিক্‌লিকে ভাব আর নেই—পেশীগুলো আরও ফুলেছে বুক আরও উঁচু, ছাতি আরও চাওড়া, মাথার পাগড়ী আরও বড়; লাঠি আরও মোটা—গলায় বাজখাঁই আওয়াজ। পাঞ্জাবে এসে যেন সেই মানুষটা দৈহিক বিকাশের একটা পরিণতিতে পৌঁছেচে। এমন জীবন্ত 'এনাটমি' চর্চা এবং 'এনথ্রোপোলজি' ভাড়ারের খানিকটা খর্চা করতে পেয়ে পরম সুখ অনুভব করলাম। এবার গাড়ির চাকায় চাকায় যেন অমৃতসর অমৃতসর বোল্‌ উঠেছে। দেখতে দেখতে অমৃতসর স্টেশন-প্লাটফর্মে গাড়ি ঢুকলো। 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' এর আওয়াজে ষ্টেশন-প্লাটফর্মে ঝড়ের সমুদ্রের ইঙ্গিত ফুটে উঠলো। বুঝলাম, সত্যকার পাঞ্জাবের সাক্ষাৎ এতদিনে পেয়েছি—হিজলী জেলে, দমদম জেলে, বাসে-ট্যাক্সীতে যে পরিচয় পেয়েছি সেটা ভুয়ো। স্তূপাকার মালার মালায় প্রেসিডেন্ট অদৃশ্য হ'য়ে গেছেন।

রিসেপশান কমিটির মেম্বাররা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে রিফ্রেশমেণ্ট রুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। এক এক কাপ গরম চা খেয়ে যেন এই দীর্ঘ তিনদিনের ক্লান্তি (অবশ্য, এ দিন ২৪ঘণ্টার নয় এর মধ্যে দুটোই ভগ্নাশমাত্র) ভুলে গেলাম। সবাই বেশ হাসি খুশি। ভাবছিলাম, বাংলার গবর্ণর আবার এই রিফ্রেশমেণ্ট রুম এ এসে হাজির না হন্!…চা এলো; চা, না বলে তাকে দুধ বলাই ভালো। পাঞ্জাবীরা লড়াই ক'রতে ওস্তাদ কিন্তু, চা বানাতে পারে না। "The Punjabi's dress better, eat better, laugh more than other Indians. But they can not prepare tea." "The Punjabis receive £50 lakhs for military service" but they should receive nothing for a cup of tea.

অমৃতসর থেকে গাড়ি বদল ক'রে 'খাসা' স্টেশনে গিয়ে আমাদের

নামতে হবে—পাঞ্জাব মেল সেখানে দাঁড়ায় না বলে এই ব্যবস্থা। অমৃতসর আর লাহোরের মাঝে হ'চ্ছে 'খাসা'। গাড়ি এলে উঠলাম। চারদিকেই পাগড়ীর ভীড়—পাগড়ীর রাজত্বে আমরা এসে পড়েছি। ছোট্ট একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে একটা করুণ অথচ মজার দৃশ্য দেখতে পেলাম। আমাদের গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে দু তিনটা ছেলেমেয়ে ত্রিং ত্রিং করে নেচে নেচে কি সব ব'লবার চেষ্টা ক'রতে লাগলো। পাশের বন্ধু সেদিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করলেন। প্রথমটায় হঠাৎ এমনই হাঁসি পেছিলো যে কি বলবো। সে হয়তো কিছু পাবার আশায় তার সুরটাকে করুণ এবং মর্মস্পর্শী করবার চেষ্টা করেছে—কিন্তু, তার ভাবভঙ্গী দেখে সে মর্মস্পর্শীদের সম্মান রাখতে পারছিলাম না। বুঝলাম, এটা অন্যায় হচ্ছে—কিন্তু সুরসুরি দিলে যুক্তি দিয়ে তাকে রোধ করা যায় না—আমার অবস্থাও ঠিক তেমনি হ'য়ে উঠেছে। গাড়ি ছাড়লে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

'খাসা' স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—আমরাও মালপত্র নিয়ে প্লাটফর্মের বাইরে যাবার চেষ্টা করছি। পশ্চিমের আকাশে লালসমুদ্রের আভাস—সূর্য ডুবলে ব'লে। পাঞ্জাবের গৈরিক প্রান্তর তারই স্পর্শে রাঙিয়ে উঠেছে। কমরেড্ বোখারী (ইনি সুদূর সিন্ধু থেকে কেন্দ্রীয় কিষাণ কাউন্সিলের সদস্য) তাঁর স্টিক দিয়ে আমাদের মালপত্র তদারক করছিলেন। তাঁর মুখ ভরা হাসি। দেহভরা গতি, কথাভরা হিউমার আমাদের সবাইকে সজীব করে তুললো। কয়েকখানা টোঙা আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে রওনা দিল। আমরা পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। ভাক্না দু মাইল। সঙ্গীরা গণসঙ্গীত গাইতে গাইতে চললেন। পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বন্ধু ওরা হাস্যকর অনুকরণের চেষ্টা করছিলেন। সুরের জন্য না হ'ক পাঞ্জাব, সিন্ধু, আর বাংলার সম্মিলিত সুরের অপূর্ব সমন্বয়েই আকাশ মহণীয় হ'য়ে উঠলো। এই সায়াহ্নের রক্ত চিহ্ন

ভরা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে কে ভাবতে পারবে যে, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় আজ আমাদের জীবন উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে! কে বলতে পারবে, বাঙালী হ'য়েও আমি ভারতের তীর্থক্ষেত্রে সবার পাশে এসে দাঁড়াতে পারি না। অস্তাচলের আকাশে যেন নবজীবনের সুরের প্রতিধ্বনি গিয়ে বাজলো।...চারদিকেই গমের ক্ষেত—মাঝখান দিয়েই পথ। শান্ত সন্ধ্যার নীরবতা যেন গমের পাতায় পাতায় ঘুমিয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে আমরা মার্চ করে এগিয়ে চলেছি—এক অপূর্ব সুরের আহ্বানে শরীরের সমস্ত ক্লান্তি যেন নিঃশেষে মুছে গেছে।... সন্ধ্যায় আবছা অন্ধকার সারি সারি কয়েকটা তাঁবু চোখে পড়লো। আমরা এসে গেছি। গবর্ণরের নিষেধের গণ্ডী আমাকে আটকাতে পারলো না। মালদহের বন্ধুরা হয়তো এতক্ষণ তাদের দিনান্তের খাবার শেষ ক'রে কম্বলে আস্তানা গেড়েছে। আর আমি আজ হাজার দেড়েক মাইল দূরে পাঞ্জাবের এক অজানা প্রান্তরে তাঁবুতে বসে বিশ্রাম ক'রছে।

তিনদিন মাথায় জলের সম্পর্ক নেই। ক্লান্তি আর অবসাদের মুহূর্তে জলের কথা মনে হচ্ছিল। শুনলাম, কাছেই জল পাওয়া যায়। কয়েক বন্ধুতে মিলে গেলাম সেদিকে। গিয়ে দেখি এক আশ্চর্য ব্যাপার, অন্ততঃ আমাদের বাঙালী চোখে—জলের মাঝ পর্যন্ত নামানো মালার মত সাজানো মাটির এক ধরনের পাত্র—একের পর এক জল ভরে উঠে আসছে আর আপনিই উল্টে পড়ছে। জল যেখানে পড়ছে সেখান থেকে একটা নালি কেটে দূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—শুনলাম সেগুলো বহু দূরে দূরে ক্ষেতের মাঝে নিয়ে যাওয়া হয়েছে- এখানে এইভাবে ক্ষেতে জলের সেচের ব্যবস্থা হ'য়েছে। ব্যবস্থাটা অভিনবই বটে! এর নাম রহট অথবা ইংরাজীতে একে বলে পার্শিয়ান হুইল। পাঞ্জাবের জীবনে এই হুইল এর মূল্য কত এবং পাঞ্জাবের

সবুজ ফসলের ইতিবৃত্ত উৎস কোথায় পরে বুঝেছিলাম। রইটে মাথা বেশ ক'রে ধুয়ে, গা মুছে একটা পরম স্নিগ্ধতার আবেশ নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। ফিরে দেখি চা প্রস্তুত। একটা ত্রিপল ঘিরে সবাই গোল হ'য়ে বসে গেছেন। পছন্দমত চা আর লাস্‌সী দেওয়া হচ্ছে। লাস্‌সী হচ্ছে একধরণের বিশেষভাবে তৈরি ঘোল—ইউ, পি থেকে শুরু করে সমগ্র উত্তর ভারতেই বিশেষ জনপ্রিয়—বিশেষতঃ, পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবে চরম আবহাওয়ার এটা একটা অনিবার্য পানীয়। লাস্‌সী যে এখানকার জীবনে কি সামগ্রী পরে সেটাও বুঝছিলাম।

বেশি রাতে পাঞ্জাবের ফার্ষ্ট্ক্লাস চালের সাদা ভাত, চাপাটি (ছোট ছোট রুটি)। অবশ্য ডাল-তরকারীর পার্থক্য বিশেষ দেখলাম না—ডালও ডাল আবার তরকারীও ডাল—অর্থাৎ, বিশুদ্ধ ছোলার তরকারি দিয়ে খাওয়া শেষ ক'রে নির্দিষ্ট ক্যাম্পে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি ভয়ানক বাতাস—ক্যাম্পের দরজার কাপড় পত্ পত্ ক'রে উড়ছে। কিছুক্ষণ পরে প্রচণ্ড শীত—এপ্রিল মাসে এই ধরনের শীত পড়বে কল্পনাও ক'রতে পারিনি—ভাগ্যি বউদির কম্বলটা এনেছিলাম! তবু সারারাত ধরে—(শুধু সারারাত নয়, যে কদিন এখানে ছিলাম সে কদিনই এই তুরাবস্থায় কেটেছে। ঠক ঠক ক'রে কাঁপলাম। পাঞ্জাবের প্রথম রাতটাকে কিন্তু সম্বর্দ্ধনা জানাতে পারলাম না।

সকালে আর উঠতে হয়নি—কারণ উঠেই ছিলাম। ওঠাবার একটু রকমফের করতে হলো মাত্র। পায়খানা যেতে হ'লো ফ'লের ক্ষেতে ফ'লের গাছে গাছে কত অজানা ফল ফলে রয়েছে—মুখ ধুলাম সেই রইটের জলে। সবই অপূর্ব, অদ্ভুত—শুধু রাতজাগা দেহমনটি ছাড়া। সারি সারি তাঁবুর গায়ে রৌদ্রালোক খেলা করে বেড়াচ্ছে। চা আর চাপাটি খেয়ে মাঠেই ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখতে লাগলাম। কাছেই

ভাক্‌না গদর পার্টির ফাউণ্ডার প্রেসিডেণ্ট সোহন সিং ভাক্‌নার গ্রাম—রাজনৈতিক ভারতের এক মহান্‌ পাঠস্থান। ভাক্‌না শুধু ভাকনাই নয়—এক ঐতিহাসিক ভারতের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে সে—গাছপালা ছাড়িয়েও যেন এক আধ্যাত্মিক সত্তার সন্ধান পাচ্ছিলাম ওই ছোট্ট গ্রামখানার ভেতর।

দুপুরে রহটের জলে স্নান ক'রে জীর্ণ একটা বাড়িতে খেতে গেলাম। সেই ভাত-চাপাটি, ডাল আর তরকারীর এক অভিন্ন সংস্করণ। তবু বেশ লাগছিল—খাবারের স্বাদে-গন্ধে যেন এক দূর এবং অভিনব জীবনের সন্ধান রয়েছে। মনে হচ্ছিল যেন বেদুইনদের তাঁবুতে বসে ঝলসানো মাংস খাচ্ছি। মেরুপ্রদেশের অরোরার আলোয় শীল মাছ সেদ্ধ খাচ্ছি অথবা ভূমধ্যসাগরের তীরে বসে আঙুরের রস পান করছি। ঠিক এই ধরনের রোমাঞ্চকর গন্ধ পাঞ্জাবের খাবারে পেতাম বলে মনে হ'ত। পাগড়ী বাঁধা শিখ বন্ধুরা পরিবেশন করতেন। এক ধরনের লম্বা লম্বা জার্মান সিলভারের গ্লাসে জল খেতাম। যে কদিন ছিলাম গ্লাশগুলো যেন আমাদের পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

প্রথমদিন আর ক্যাম্পের সীমানার বাইরে বেশি দূর যাইনি। দুপুরে যেন লোহা-গলানো রোদ—খাঁ খাঁ করেছে মাঠ—সবুজ গমের ক্ষেত অসীম বিস্তারে গ্রামান্তের নীল রেখায় গিয়ে মিশেছে। ক্যাম্পে ক্যাম্পে অলস ঘুমের মহড়া চলেছে। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনার রেশও ভেসে আসছে। বিকেলে দূর দূর গ্রাম থেকে শিখ বাবারা এসেছেন অতিথিদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে—অথবা পাঞ্জাবের আতিথেয়তার ঐতিহ্যের পরিচয় দেবার জন্যে। গ্রাম্য-মাতব্বররা এখানে বাবা নামে পরিচিত। আমরা যে দূর বাংলা থেকে এখানে এসেছি এজন্যে এঁরা কৃতজ্ঞতা দেখালেন—তাঁদের গ্রামে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। কত অমায়িক হাসিখুশী এঁরা। কল্পিত দৈত্যের মতই

চেহারা এঁদের—মানুষ বললে ভুল হয়। আমাদের ক্যাম্পে এঁদের 'ইন দি ল্যাণ্ড অব পিগমিজ' বলেই মনে হলো। এঁদের কথাবার্তা থেকে মনে হলো এঁরা অনেকেই যুদ্ধের জন্যে ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি ঘুরে এসেছেন। সাম্রাজ্যবাদের রক্তচিহ্ন যেন এঁদের হাতে দেখতে পেলাম। অজানিত ভাবেই এঁরা নিজেদের পায়ের শিকল অরও দৃঢ় করে এঁটেছেন। ঐ শিরাবহুল বলিষ্ঠ হাতে হাতে যেন সহস্র মৃত্যুর সংকেত রয়েছে। ঐ প্রশান্ত হাসির আড়ালে যেন খুনীর উন্মাদ অট্টহাসি ঘুমিয়ে রয়েছে। কাল যারা নৃশংস মৃত্যুর নেশায় মেতে ছিল, আজ তাদেরই মুখে নবজীবনের সৃষ্টির আবাহন—আগামীকাল তাদেরই হাতে হয়তো মুক্তির রক্ত নিশান উড়বে। সমস্ত পৃথিবী তাদের এই নব সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করবে। বিকেলের এই ম্লান আলোয় ওইসব বাবাদের মুখের দিকে চেয়ে রক্ত মাংসের মানুষের চেয়ে যেন জীবনের মর্মগত গভীর সত্যের প্রতিকৃতি দেখতে পেলাম। সত্যের পরস্পর বিরোধী দুটো রূপের সমন্বয় এখানেও উপলব্ধি করলাম। একই সঙ্গে এঁরা সামাজ্যবাদের ক্রীড়নক এবং তার মৃত্যু শেল। ধ্বংস আর সৃষ্টির এই সমন্বয়েই মানুষের হাতে এক নব সৃষ্টির মেঘদূত তৈরি হচ্ছে···শিখ-বাবারা তারই অদৃশ্য লেখনী।

আর তিন চারি দিন মাত্র কন্‌ফারেন্সের বাকী—গোটা মাঠটাই ফাঁকা পড়ে আছে—প্রায় পঞ্চাশ হাজার প্রত্যাশিত দর্শকের জন্যে কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না দেখে কেমন একটা হতাশার ভাব মনে জাগছিল। এদিকে আমরা ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে স্থানান্তরিত হচ্ছি। আমাদের তাঁবু যেন সজীব মানুষের মতই মার্চ করে এগিয়ে গেছে। আমাদের পরিত্যক্ত তাঁবুতে রিসিপসন কমিটির অফিস বসে গেছে। রিসিপসন কমিটির চেয়ারম্যান আতাউল্লা, জাহানিয়ার বিশ্রাম নেই—মুখে তাঁদের হাসি। অমায়িকতার স্নিগ্ধ আভাস তাদের যেন অনুক্ষণ ঘিরে রয়েছে।

সবার সঙ্গেই আলাপ—সবার সঙ্গেই টুকরো টুকরো পরিহাস—অথচ, কত বড় দায়িত্ব তাদের মাথায় সেটা তো বুঝতে পারছি। সামান্য গ্রাম্য থিয়েটার, মিটিং প্রভৃতির বন্দোবস্ত করতেই হিম-সিম খেয়ে যেতে হয়···অবশ্য, এর আয়োজন, এর গুরুদায়িত্বের একটা আন্দাজ করা চলে।

আলাউদ্দিনের প্রদীপে ঘষা লেগেছে। দেখতে দেখতে দিগবিদিক থেকে দৈত্যসুলভ পাঞ্জাবী বালক, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ, নারী ছুটে আসছে। বর্ষার তৃণের মত অগুনতি ক্যাম্প দিকে দিকে মাথাতুলে দাঁড়াচ্ছে। মেইন পেণ্ডেল তৈরির আয়োজন চলছে। কর্মীদের গতি-বেগ যেন ক্রমেই বাড়ছে—জাহানিয়া, জগজিতের চোখের তারায় চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে। গ্রামের প্রশান্ত আবহাওয়ায় নগরে কোলাহল। আমাদের পরিবেশও তেমনি বেড়েছে। অল্প কয়েকজনের নিবিড় সান্নিধ্য দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে। নিত্য নূতন পাঞ্জাবী বন্ধু আবি-ষ্কার করছি। নিত্য নতুন ভলান্টীয়ার ডিউটী মোতায়েন হচ্ছে। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে ক্যাম্পের পাশেই বুটের মচমচ শব্দ শোনা যায়—মাঝে মাঝে সুর ওঠে। 'কমরেড, দি বিউগিলস্ আর সাউণ্ডিং' ডিউটি রত ভলান্টিয়ার, বিউটিফুল আকাশের তারা, নিস্তব্ধ প্রকৃতির ভাবালুতা—রাত্রির প্রহরে প্রহরে পাঞ্জাবের এক প্রান্তের জীবনের এই বিচিত্র সুরের সঙ্গীত শোনা যায়। দূরে ভলান্টীয়ার এর বিউগিল বেজে ওঠে বুঝি।

তাঁবুর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাকনা গ্রামের সাথেও সামাজিক সম্পর্ক আমাদের বেড়ে উঠেছে। ভাকনা গ্রামের একজন যুবকের সাথে আলাপ হয়েছে। সে কলেজে পড়ে।

প্রথম দিন ভাকনায় বেড়াতে যাবার কথাই বলি। এই পাঞ্জাবের গ্রামে প্রথম পদক্ষেপ। পাঞ্জাবের গ্রামের ঘর-বাড়ির একটা আভাস

এর আগেই দিয়েছি। সেই ধরনেরই দুর্গ সুলভ ঘর-বাড়ি এখানেও রয়েছে এবং অধিকাংশই সেই ধরনের। গ্রামে ঢুকতে প্রথমেই নোংরা আবর্জনায় গাটা কেমন ঘিন ঘিন ক'রে উঠল। যেখানে সেখানে ময়লা পায়খানার কারবার হয়তো নেই—কিন্তু, তাই বলে প্রকাশ্য পথে পথেই পায়খানা সৃষ্টির এই নোংরা প্রচেষ্টাকে তারিফ ক'রতে পারলাম না। ওই দুর্গ বাড়িগুলো দেখে যে বিস্ময় ও সম্ভ্রম জেগেছিল এই নোংরামিতে যেন সেটা খানিকটা স্তিমিত হয়ে গেল।···গ্রামের পথে পথে রং-বেরং-এর পাগড়ি বাঁধা লোকজনের জটলা চলছে। কথাবার্তা না বুঝলেও মনে হলো, অধিকাংশ আলোচনারই লক্ষ্য ওই কন্‌ফারেন্স। আমাদের মুখের দিকে অনেকে হাঁ ক'রে দেখছিল। অনেকে সসম্ভ্রমে পথ করে দিচ্ছিল। দূর দূর গ্রাম থেকে কন্‌ফারেন্স উপলক্ষ্যে অনাহূত এবং রবাহূতদের জন্যে একটা জায়গায় খাবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। সে জায়গায় প্রচুর ভীড়—প্রচুর আলোচনা, আলোড়ন।

প্রথমেই আমরা লাস্‌সীর খোঁজ নিলাম। খুঁজতে খুঁজতে একটা দোকানে গিয়ে লাসসীর খোঁজ পাওয়া গেল। দোকানী আমাদের সাদরে দোকানের একপাশে ব'সতে দিল। হঠাৎ দেখি ইতস্ততঃ করে বললো, সক্কর (চিনি) তো নেই—কি করি—বলেই সে পাশের একটা বাড়িতে খোঁজ নিতে গেল। একটু পরেই সে চিনি নিয়ে ফিরে এলো। লাস্‌সী তৈরি হচ্ছে—হঠাৎ দেখি পাশের সেই বাড়ির দোতালার জানালা খুলে গেল। ওড়নার আড়ালে দু'জন মহিলার উজ্জ্বল চোখ কৌতুহলে হাস্‌ছে। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ধরে আমাদের লাস্‌সী খাওয়া দেখছিল এবং খালি হাসছিল। লাস্‌সী খেতে এসে এক্সিবিট হ'য়েছি ভেবে কেমন অস্বাচ্ছন্দ বোধ করছিলাম—বিশেষতঃ দু'জন অজানা বিদেশী মহিলার সাম্‌নে। দাম দিতে গেলে দোকানী ব'ললে, দাম লাগবে না। মেয়েরাও হাত নেড়ে নিষেধ ক'রতে লাগলো—ভাঙা

ভাঙা হিন্দীতে বললে, রোজ রোজ এরকম লাস্‌সী খেয়ে যেও। The Punjabis are traditionally a hospitable people—মহিলাদের চোখে মুখে যেন তার সত্যতা খুঁজে পেলাম।

দেখতে দেখতে ক্যাম্পে ক্যাম্পে অত বড় ফাঁকা মাঠটা ছেয়ে গেছে। সেদিন গভীর রাতে সেই তাঁবুর দেশের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিলো The Punjab is not only a land of a garden but also a **land** of curtain (or more literally camp). তাঁবুর রাজ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পুরনো ইতিহাসের সিংহদ্বার খুলে গেল। মানস চোখে দেখতে পেলাম বাদশাহী শিবিরে প্রান্তরে ছেয়ে গেছে। চারদিকেই শুধু শিবির আর শিবির। বাদশাহী শিবির মাঝখানটায় জমজম্ ক'রছে—হাট বাজার সব শিবিরে শিবিরে। শিবিরে শিবিরে যুদ্ধায়োজন—আলোচনা পরামর্শ। মনে হচ্ছিলো আমরাও যেন কোন্ অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজনে চলেছি। আমাদেরও যুদ্ধায়োজন ঠিকই কিন্তু, এ-যুদ্ধায়োজনে দাসত্বের বাণী নেই—আছে মুক্তির বিজয় সংকেত। ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে এ যুদ্ধায়োজন হ'চ্ছে না—ও আয়োজনের পেছনে আছে লক্ষ লক্ষ সেচ্ছাব্রতী মুক্তি যোদ্ধা—যারা জেল, গুলি, দ্বীপান্তরের প্রাচীর ভেঙে আজ এই মহামানবের মুক্তি সংঘে এসে মিলিত হয়েছে। রাজকীয় আড়ম্বর এদের পরিবেশে না থাকতে পারে, কিন্তু, শক্তি, সাহস, ত্যাগ তিতিক্ষার অম্লান ঐশ্বর্য এদের জীবনের আকাশে ভরপুর হ'য়ে আছে।

কনফারেন্স এবার রীতিমত জ'মে উঠেছে। সামনেই বিরাট তোরনের এক পাশে বিরাট চাষীর মূর্তি—হাতে তার বিরাট এক কাস্তে। দূর থেকে দেখে মনে হ'চ্ছে, with a petty sickle on his hand he is going to storm the heavens. তার হাতের পেশীতে পেশীতে যেন সারা বিশ্বের শ্রমশীল জনসাধারণের শক্তি ও সংকল্পের প্রয়াগ

ক্ষেত্র সৃষ্টি হ'য়েছে—চোখে তার শোষণ ও শাসনের হাত থেকে অদূর-মুক্তির স্বপ্ন।

সভাপতির শোভাযাত্রায় এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা আর আড়ম্বর দেখা গেল। প্রায় দুই মাইল জোড়া শোভাযাত্রা। মনে হচ্ছে যেন লাল সমুদ্রে তরঙ্গ উঠেছে। একের পর এক, দুইএর পর দুই লাল পতাকা ঘাড়ে বীর পাঞ্জাবী কিসান এগিয়ে আসছে—'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', 'বঙ্কিম মুখার্জী জিন্দাবাদ', 'সহজানন্দ জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত। শিখ কৃষকের জাঠায় (কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু সংখ্যা লোকের শোভাযাত্রাকে এখানে জাঠা বলে) জাঠায় চারদিক ছেয়ে গেছে। ইন্দর মোহন (এক শিখ বন্ধু) ফিস্ ফিস্ করে বলেন Lo, a Jatha from Patiala too. খবর নিয়ে জানা গেল পাতিয়ালা থেকে চৌদ্দ দিনের পথ পাড়ি দিয়ে একটা জাঠা এসেছে। যে শক্তি তাদের চৌদ্দ দিনের দুর্গম পথ চলার পাথের দিয়েছে তার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাবো না প্রীতি জানাবো বুঝে উঠলাম না। অবশ্য সে শক্তি যে শুধু চৌদ্দ দিনের পথ চলার পাথেয় দেয় না, জীবন থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যু থেকে জীবনের পথে প্রান্তরে টেনে নিয়ে যাবার শক্তিও যে তার আছে তা জানি।

দেশ দেশান্তর থেকে আগত কত যে নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের camp যেন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সেখানে সুদূর মনিপুরের ধুলো যেমন জমেছে (মনিপুরের রাজবংশের জামাই ইরাবত সিং এসেছেন) তেমনি পেশোয়ারী হাওয়াও তাকে দোলা দিয়ে গেছে—পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ যেন ভারতের এই উত্তর প্রান্তে এসে মিলেছি।

Delegate campএ মিটিং চলছে জোর। কিসান আন্দোলনে যার যেটুকু অভিজ্ঞতা সব রিপোর্ট করলো। এইভাবে সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা

থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যাবে আগামী দিনের পথ চলার সেটাই হবে পথের আলো। নিজের অভিজ্ঞতা বলার সময় এই বৃহত্তের উপলব্ধিতে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে হচ্ছিলো। এত বড় মুক্তি যজ্ঞে আমারও অংশ, আমারও অধিকার আছে। এই অধিকার বোধই তো আমাদের আন্দোলনের জীবনীশক্তি।. ওই নিরাভরনা মাঠ, ওই জীর্ণ কুঁড়ে ঘর, ওই বুভুক্ষু নরনারী, ওই অধিকারহীনা নারী, ক্ষমতাহীন চাষী, বিভ্রান্ত মধ্যবিত্ত, অধিকারবোধের অদৃশ্য যোগসূত্রের যেন সন্ধান পেলাম এই Campএর ভেতর বসেই।

সকালে চায়ের জন্যে delegate-দের হুড়োহুড়ি লেগে যায়। একখানা নিমকী আর একটা মিষ্টির বরাদ্দও তার সঙ্গে আছে। দুপুরে রহটের জলে স্নান—সেখানেও ভিড় হুড়োহুড়ি থালি গায়ে বিরাটকায় পাঞ্জাবী যুবক প্রৌঢ় স্নান করে আর আমরা ক্ষীণজীবী বাঙালীর দল হতাশ ভাবে তাদের কষ্টকল্পিত মাংসপেশীর সঞ্চালনের দিকে তাকিয়ে থাকি। প্রকৃত পাঞ্জাবীরা যে কী, পাঞ্জাবে না এলে তার সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায় না। আট ফিট, সাড়ে আট ফিট লম্বা, বাহান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি যাদের বাংলা দেশে তাদের বড় একটা দেখা যায় না। তাদের দেখতে গেলে আসতে হয় পাঞ্জাবের এইসব গ্রামে।

হ্যাঁ, Conference-এর উদ্বোধনের দিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। পার্টি মিটিং চলছে—হঠাৎ Provincial পার্টি সেক্রেটারী সোহন সিং যোশ ক্যাম্প-এর বাইরে দাঁড়িয়ে বললেন Baba is coming to pay his respect to the party. বাবাকে বুঝতে না পেরে এর ওর মুখ চাওয়া চায়ি করছি হঠাৎ দেখি এক পক্ককেশ ঋষি মূর্তি বৃদ্ধ বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। ধব ধব করেছে তাঁর গায়ের রং, পাকা আমের মত লাল পুষ্ট নাকটা টস টস করছে। মুখে একটা প্রশান্তির আভাস। পাশের কানাকানি থেকে বুঝলাম, ইনিই সোহন সিং ভাকনা—গদর

পার্টির ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট ভাক্‌না গ্রামের জ্যোতিষ্ক ভারতের মুক্তি আন্দোলনের একজন শক্তিশালী নওজোয়ান। এই বৃদ্ধ বয়সেও যিনি শান্তিপূর্ণ জীবনের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন নি তিনি নওজোয়ান ছাড়া কি? বাবা প্রসন্নমুখেই সবার সঙ্গে কর মর্দন করলেন। আজই গুজরাট জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ইনি আসছেন। এর অভাবে যখন সবাই একটা হতাশা বোধ করছিলো তখন নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এঁর উপস্থিতিতে সমগ্র কনফারেন্সের ওপর যেন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি করলো। ক্যাম্প এর বাইরে দাঁড়ানো এই বৃদ্ধটির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছিলো, ও যেন রক্তমাংসের একটা মানুষ নয় ও যেন পরাধীন ভারতের একটা জীবন্ত ইতিহাস। বাবা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলেন, পার্টি মিটিংও আবার যথারীতি চলতে লাগলো।

Open conference এর আগের রাতে ক্যাম্প-এ বসে গল্প করছি হঠাৎ কোত্থেকে যেন সিংহের গর্জন উঠলো—সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম, সিংহ নয় মানুষ, গর্জন নয় গান। অর্থাৎ, Conference এর ওপেনিং সঙ এর ট্রায়াল দেওয়া হচ্ছে পরে শুনেছিলাম। 'হিন্দী হাম চাল্লিশ ক্রোড়' —মানুষের গলার আওয়াজ বিশেষতঃ মেয়ে মানুষের গলার আওয়াজ যে এমন হতে পারে সে অভিজ্ঞতা এই প্রথম। শুনলাম, গায়িকা স্বয়ং সরোজিনী নাইডুর বোন সুহাসিনী চট্টোপাধ্যায়—এডগার স্নোর 'রেড ষ্টার ওভার চিনাতে' যাঁর নামের উল্লেখ আছে। মাও সে তুং দুজন ভারতীয়ের খোঁজ নিয়েছিলেন—একজনের নাম জওহরলাল আর একজন সুহাসিনী চট্টোপাধ্যায়। ইনিই তিনি।···গলার তারিফ না করে পারলাম না। রাত্রির অন্ধকারে গোটা কনফারেন্স-এর মাঠ নিঝুম মেরে সে গান শুনলো। গান থামলে মনে হলো অনন্তকাল ধরে যেন আমরা প্রলয় দিনের গর্জনের মধ্যে ডুবেছিলাম।

পাঞ্জাবের চড়া আবহাওয়ায় শরীরটা বড় কড়া হ'য়ে উঠেছে-নাক দিয়ে রক্ত

ঝ'রছে রোজ রোজ। সেদিন বিকেলে লাস্সীর খোঁজে ষ্টলের পাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করছি—দেখি কয়েকজন পাঞ্জাবী মেয়ে (তাঁদের হাল দেখে মার্জিত রুচিসম্পন্না শিক্ষিতা মহিলা ব'লে মনে হ'লো) কিসের সন্ধানে আমাদেরই মত ঘোরাফেরা ক'রছেন। পাঞ্জাবের হাওয়ায় একটা Forward ভাব আছে—তাই, হঠাৎ forward march ক'রে তাঁদের বাঞ্ছিত সামগ্রীটী কি জানতে চাইলাম। বললেন one of our comrades is a bit sick and so we are running after milk. milk! ব'ললাম, We are also running after lassi. Lassi! You too are running men like us? কি আর করি অপরাধ স্বীকার করলাম। আলাপে পরিচয়ে জানলাম, এঁরা school mistress. লাহোর থেকে আজই আসছেন। অনেকক্ষণ ঘোরাফেরার পরে আবার এঁদের সঙ্গে দেখা। দূর থেকেই ওঁদের একজন জিজ্ঞেস ক'রলেন, hallo lassi! এবার offensive ওঁরাই নিয়েছেন। রুষ counter attack-এ অভ্যস্ত আমরা (অন্ততঃ, খবরের কাগজে)—চট ক'রে উত্তর ক'রলাম, pardon, milk! হাসির হররা ছুটলো। পাঞ্জাবের মাটিতেই বোধ হয় এমন চকিত আত্মীয়তা সম্ভব! The Punjab is also a land of philanthrophy. Long live Panjab! আকাশের গায়ে গোধূলির রং ধরেছে-সবুজ দিগন্তে একটা চলন্ত উটের ছায়া ভেসে উঠলো।

পাঞ্জাবের হাওয়ার ছোঁয়া লেগেই শরীর যেন এ ক'দিনেই বদলে গেছে। পাঞ্জাবের জল আর হাওয়ার কদর নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো। বক্তা কমরেড মুখার্জী লাহোরে থাকেন। বিহ্বল শ্রোতা আমরা, তিনি যা ব'লছিলেন তাতে পাঞ্জাবের বাইরের যে কেউ বিহ্বল হ'তে পারেন। তিনি ব'লছিলেন, আরে ভাই, পাঞ্জাবের জলের কথা আর কি ব'লবো। অদ্ভুত, অদ্ভুত—সত্যিই অদ্ভুত—ধারণা ক'রতে পারেন—

দুধের মধ্যে ৩।৪ সের ঘি ঢেলে চুমুক দিয়ে সেরে দেয় এরা! আমি নিজেই তো প্রায় দুসের দুধ মারতে পারি আজকাল। মুখার্জীর শরীরের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস না হ'লেও পাঞ্জাবীদের বাহান্ন ইঞ্চি বুকের কথা ভেবে বিশ্বাস করি আর না করি অবিশ্বাস ক'রবার ভরসা পাচ্ছিলাম না খুব বেশি। সমস্যাটা জটীলই! তবে আমাদের দেশে 'length without breadth' ভদ্রলোকদের যে ভাবে খাবার পরে আশীখানা কাঁঠিখোঁচা পিঠে (এর আর এক নাম বোধ হয় আসকে পিঠে) খেতে দেখেছি তাতে এটা আলাউদ্দীনের প্রদীপের গল্প নাও হ'তে পারে। সেদিন দুপুরের খাওয়ার পরে একটু গাছের ছায়ার তলে যাবার লোভ হচ্ছিলো। Camp এ যা গরম! ফাঁকা মাঠে রোদ্দুর যেন একেবারে গা ছেড়ে দিয়ে নেমেছে। কোথায় যাওয়া যায় ভাবছি, এক বন্ধু ব'ললেন, চলুন, আপনাকে একটা চমৎকার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি! চললাম তার সাথে। গিয়ে দেখি চারদিকে গাছে-ঘেরা তপোবনের মত একটা জায়গা। এখানে বেদানা, ওখানে কমলালেবু, সেখানে গোলাপ-এই ধরণের ফল-ফুলে ছাওয়া যেন মর্তলোকের এক অমরাবতী। তারই ছায়ায় একটা Camp প'ড়েছে—শুনলাম, স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী নিখিল ভারত কৃষক সভার সে বছরের সম্পাদক—এখানে থাকেন। গিয়ে দেখি ফাঁকা মত একটা জায়গায় অনেকটা আতপ চাল ঢালা—দুজন লোক—শুনলাম, স্বামীজীর শিষ্য—সেই চাল বাছছে। স্বামীজী ওরই ভাত খান এক বেলা আর একবেলা দুধ ফল মূল-ইত্যাদি খান—একেবারে সাত্বিক আহার। শিষ্যরা ব'ললে, স্বামীজী গাড়িতে ব'সে কোন কিছু খান না। তাঁর বহু শিষ্য আছে। এই ধরনের গল্প অনেকক্ষণ ধ'রে শিষ্যেরা করলো। বিখ্যাত লোকদের ব্যক্তিগত জীবনের ছোটখাট বিবরণ শুনতে আমার কেন যেন ভাল লাগে—তারপর, এই ঠাণ্ডা গাছের ছায়ায় ব'সে সে ধরনের গল্প আরও উপভোগ্য হ'চ্ছিলো।

এক পাশের একটা Campএ ব'সে স্বামজীর সেক্রেটারী টাইপ ক'রছিলেন। conference এ আগত লোকদের কেউ কেউ তার আসেপাশে শুয়ে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা-সুখ উপভোগ ক'রছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছি—হঠাৎ স্বামীজী এলেন। স্বামীজীর গেরুয়া কাপড় দেখে প্রশ্ন করার কৌতূহল আমাকে চট্ ক'রে পেয়ে ব'সলো—ফট্ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে ব'সলাম, Does not your religious robe prove to be of hindrance to your work—specially when you meet Muslim people? স্বামীজী কি বুঝলেন জানি না। furious হ'য়ে উঠলেন এই একটা প্রশ্নেই। উত্তর করলেন—মনে হ'ল যেন এক ঝলক আগুন ছুটে এলো—Methink, your own complexity finds silly play in your own argument! বক্তব্যের হুবহু photograph হয়তো এটা নয় (এটা তাঁর বক্তব্যের একটা সারমর্ম নিশ্চয়ই)—নিজের অবিমৃষ্যকারীতাকে দায়ী ক'রবো, না নেতার ধৈর্যহীন অযোগ্যতাকে দোষী ক'রবো মনের আবেগে সেটা বুঝে উঠলাম না। বাইরের ফ্যাকাশে রোদের মতন ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে ফিরে এলাম। কাশ বন দূর থেকেই ঘন দেখায়—কাছে গিয়ে তাকে পাতলা করে তুলবার প্রবৃত্তি যেন না আসে আর। বিখ্যাত লোকের খ্যাতি যেন দূর থেকেই শুনি তার পারিপার্শ্বিক অন্ধকারকে ডিঙোবার প্রবৃত্তি যেন না যায়। বুদ্ধির বিচারের ক্ষমতা আমার তখন লোপ পেয়েছে। disillusioned হ'য়ে about turn করলাম। মুহূর্তের জন্য পাঞ্জাবের সবুজ গমের ক্ষেতও যেন কেমন পিঙ্গল হ'য়ে উঠলো।

দুপুরের রোদের মধ্যে পতাকা উত্তোলন হ'চ্ছে—ইন্দুলাল যাজ্ঞিক পতাকা উত্তোলন ক'রছেন। একটা উঁচু ভিঁটের উপর pole পোঁতা আছে। সেই poleকে গোল হ'য়ে ঘিরে অজস্র জনতার ভিড়। বাংলা দেশ হ'লে হয়তো এই পরিমাণ লোককে অজস্র বলা চ'লতো না। কেননা,

পাগড়ী পাঞ্জাবী আর পায়জামায় ঢাকা এক একটা বিরাট বপু বাংলা দেশের চারজন লোকের স্থান দখল ক'রে ব'সেছে। চারদিকে যেন পাগড়ীর সমুদ্র। হলুদ রোদে সিক্ত রক্ত পতাকা ধীরে ধীরে নীল আকাশের মুখে উঠছে। উদ্‌গ্রীব জনতার দৃষ্টি সেদিকে। শহীদের খুনে রাঙা, শ্রমশীল মানুষের রক্তে রাঙা লাল নিশান হাওয়ায় দুলে দুলে যেন এক মহাসংগ্রামের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এক সূত্রে গ্রোথিত জীবনের রক্ত ইঙ্গিত হাজার হাজার উৎসুক নরনারী প্রাণভরে গ্রহণ করলো। বাতাস ফিস্ ফিস্ ক'রে যেন ব'লে গেল, সাগরের পারের দেশে দেশেও আজ এমনই, রক্ত ইঙ্গিতের তুফান ছুটছে। শোন সর্বহারা মানুষ শোন! ইনক্লাব জিন্দাবাদ্—মুক্তির প্রলয় সমুদ্রের তীরে যেন মহাতরঙ্গের গর্জন উঠেছে।—তীরের বাধন আর সে আঘাত সইতে পারছে না।

সেদিন সেই রাতের অন্ধকারে যে গর্জনকে সিংহ গর্জন ব'লে ভুল ক'রেছিলাম—আজ প্রায় ত্রিশ হাজার জনতার সামনে ব'সে সেই গর্জন শুনলাম। আরও কয়েক জনের সঙ্গে মিলে সুহাসিনী চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধনী সেই গানটি গাইছিলেন। পেছনে ব'সে মনে হচ্ছিলো যেন একটা ক্ষুধার্ত অজগর সামনের শিকারে ছোবলের পর ছোবল মারছে—পেছনে ব'সে তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত চুলের বিনুনীর আস্ফালন এবং তাঁর উচ্ছ্বসিত উন্নমুল দেখে সেই কথাই মনে হ'চ্ছিলো। কতটা অকপট আবেগ অবরুদ্ধ থাকলে মানুষকে এমনি উদ্বেগ ক'রতে পারে ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। একের পরে এক বক্তা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন-আর তারই প্রতিধ্বনি উঠছিলো চারদিকের জন সমুদ্রের মাঝে—এই ইনক্লাব জিন্দাবাদ বোধ হয় জীবনে শুনিনি। আমাদের মুক্তি সম্বন্ধে কোন সংশয় না থাকলেও এতটা নিঃসংশয় কোনদিন হ'তে পারিনি। বীর পাঞ্জাবী নরনারী উন্নত ললাটের দীপ্তির দিকে

চেয়ে মনে হ'লো জীবনে মুক্তিকে বোধ হয় এত কাছ থেকে কোনদিন দেখি নি। মালদহের জেলমুক্তির দিনটিকে আজ দূর থেকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারলাম না।...সোহন সিং ভাকনা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁর উন্নত প্রশস্ত বুকের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিলো যে দেশে বার্দ্ধক্যকে অগ্রাহ্য ক'রেও বুকের ছাতি এমনি উচু হ'য়ে থাকতে পারে সে দেশের আবার মুক্তির ভাবনা!

মঞ্চের উপর গোটা ভারতবর্ষ যেন এসে মিলেছে। ওই ওধারে ব'সে আছেন সুদূর কাশ্মীর থেকে আগত প্রতিনিধি সেখ্ আব্দুল্লা—কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের সভাপতি। ওধারে গোয়ালিয়র, সে ধারে বেরার, উড়িষ্যা, মণিপুর, বেহার, ইউ. পি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—জাতিগত সমস্যার এমন সহজ সমন্বয় এখানে হয়েছে—অথচ এই প্রশ্নটি আজও আমরা মীমাংসা ক'রে উঠতে পারি নি। আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে বৃহত্তর অধিকার সৃষ্টির এমন একটা সহজ উত্তর এই মঞ্চটির দিকে চেয়ে পেলাম যা বাংলার এক প্রান্তে ব'সে শুধু বই-এর মারফৎ কোনদিন পাই নি। অখণ্ড আর স্বতন্ত্র ভারতের এ সমন্বয়ই আজ নতুন দৃষ্টিতে দেখলাম—অখণ্ড ভারতওয়ালা এবং খণ্ডিত ভারত-ওয়ালাদের সংস্কারের বাধা নিয়ে তুর্ক তুলি না কিন্তু, সেই বাধা কাটাবার এমন সহজ উত্তরও বোধ হয় আর কোনদিন পাওয়া যায় নি। আজ জাতীয় আন্দোলন যখন বিভিন্ন জাতির মহামিলনের তীর্থক্ষেত্রে রূপান্তরিত তখন সেই কঠিন প্রশ্ন অনেকটা সহজ হ'য়েছে ব'লেই মনে হয়।

মূল অধিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে কেন্দ্রীয় কিসান কাউন্সিলের সভ্যদের বৈঠক হচ্ছিলো। এঁদেরই গৃহীত প্রস্তাব দ্বিতীয় দিনের মূল অধিবেশনে ওঠান হ'লো—রাশীকৃত বোঝা দিয়ে আর ভ্রমণ কাহিনীকে অনাবশ্যক ভাবে ভারি ক'রতে চাই না। তবে এটা জানা ভালো যে, জাতীয়

নেতাদের মুক্তি থেকে আরম্ভ ক'রে জাতীয় মুক্তি, সরকার, খাদ্য সংকট থেকে আরম্ভ ক'রে জাতীয় জীবনের যত রকম সংকট কোনটাই প্রস্তাব থেকে বাদ পড়ে নি। দ্বিতীয় দিনের এই প্রস্তাব পাশের অধিবেশন এতই দীর্ঘ হ'য়ে উঠলো যে সত্যি ব'লতে কী দেশপ্রেমের দোহাই দিয়েও আর চঞ্চল মনকে স্থির রাখতে পারছিলাম না। একটু ইতস্ততঃ ক'রে অপরাধ মূলক মনোভাব নিয়েই মঞ্চ থেকে আর এক বন্ধুর সঙ্গে বেরলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখি আমাদের মত অপরাধ অনেকেই অনেকক্ষণ আগে ক'রে বসেছেন। অস্ত-আকাশে তখন দিনান্তের সূর্য ঝুঁকে পড়েছে। তারই রক্তাভ আভায় সমস্ত কনফারেন্স অঞ্চলটি রঙিন হয়ে উঠেছে। কয়েকটি পাখী সাঁ সাঁ ক'রে ছুটে গেলো। পথে মহেশদার সঙ্গে দেখা। মালদহের অন্যতম প্রতিনিধি—ইনি আজ বেঁচে নেই, এঁর মত নিঃস্বার্থ নির্যাতিত দেশ প্রেমিককে আজ কি ব'লে অর্ঘ পাঠাবো জানি না। মহেশদা ব'ললেন, কী ভাকনার দিকে চ'লেছেন নাকি। আমরা প্রায়ই ভাক্না যাতায়াত ক'রতাম—সেই থেকে আন্দাজ ক'রে তিনি ব'ললেন। আবীর মাখানো আকাশে হঠাৎ পিতলের আভাস লেগেছে। সমস্ত কনফারেন্স অঞ্চলটি একেবারে জম-জমাট হ'য়ে উঠেছে- ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলাম। এর মধ্যে সেই লাস্সীর দোকান থেকেও একবার ঘুরে এসেছি। ঘুরতে ঘুরতে Soviet Posters Exhibition এর দিকে একবার গেলাম! দেখি, এখানেই সবচেয়ে বেশি ভিড় পাঞ্জাবী চাষীদের ভিড়ে জায়গাটা দুর্ভেদ্য হ'য়ে উঠেছে। কর্তৃপক্ষের প্রশংসনীয় শৃঙ্খলা রক্ষার প্রচেষ্টায় আমরা ঢুকবার অনুমতি পেলাম না। একজন মেয়েকর্মী এই বিভাগের In charge. তাঁর এই কঠোর নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার কৃতিত্ব দেখে যারা বলে মেয়েরা শুধু রান্না ঘরেরই উপযুক্ত, তাদের দিকে একবার অগ্নি ভ্রূকুটি ক'রতে হ'চ্ছে

হ'চ্ছিলো। পরের দিন এই সোভিয়েট চিত্র প্রদর্শিনীতে ঢুকতে পেরেছিলাম অবশ্য। ঢুকে সাধারণ পাঞ্জাবী চাষীকেও সোভিয়েট জীবনের বিভিন্ন বিবরণের নোট নিতে দেখে অবাক হ'য়েছিলাম। শুনেছি, আমাদের দেশের চাষীরাও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হ'চ্চে—কিন্তু এতবড় সত্য পরিচয় আজ পর্যন্ত পাই নি। এই অভিজ্ঞতায় লাভবান হই। প্রদর্শনীয় বাইরের জীবন আর ভেতরের জীবনে কত গরমিল! যে জীবনে শোষণ নেই শাসন নেই অবহেলা নেই, অনাদর নেই—নরনারী নির্বিশেষে সবারই এগিয়ে যাবার, সম্মুখের স্থান অধিকার ক'রবার অধিকার রয়েছে সে জীবন যে কী, ওই হাঁটু গেড়ে নোট নেওয়া পাঞ্জাবী চাষী তা মর্মে মর্মে বোঝে। তাই, ওর চোখের তারায় তারায় ভেনাসের আলো দেখে অবাক হইনি—সূর্য্যের আলো হ'লেও অবাক হ'তাম না। কেননা, ওই জীবনই যে তার মনের তারে তারে স্বপ্ন রচনা ক'রে আছে জন্মাবধি। স্বপ্নকে বাস্তব মনে ক'রতে তার ধর্মভীরু মন এতদিন ভরসা পায় নি—আজ কিন্তু, তার সে স্বপ্ন সংশয় দূর হ'য়ে গেছে তাই সে অমন উদ্‌গ্রীবভাবে ব'সে ব'সে জীবনকে গাঢ়ভাবে অনুভব ক'রছে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় একত্রিত ক'রে।

আজ সকালে আবার ভাকনা গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। confreence এ ভাঙন ধরেছে। আজ আমরা অমৃতসর দেখতে যাবো-সেখান থেকে ফিরে এসে ভাকনা থেকে বিদায় নেবার পালা—অবশ্য, লাহোরের দিকে! ভাকনা গ্রামে ঢুকে দেখি সে রকমই জটলা চ'লছে। সেই ধরণেই প্রাচীর ঘেরা এক বাড়ির দরজায় পাশ দিয়ে যেতেই দেখি একদল পাঞ্জাবী লাস্‌সীর আসর জমিয়েছে—আমাদের দেশের চায়ের আসরের মতই এখানে লাস্‌সীর আসর জমে। আমরা দরজার পাশ দিয়ে যেতেই একজন দৌড়ে এসে দরজার ভেতর দিয়ে ঝুকে পড়ে

ব'ললো, যাইয়ে বাবুজী, যাইয়ে—লাস্‌সী পীজিয়ে থোরা মেহের বানি ক'রকে! এ ধরনের অভিজ্ঞতা এর আগেও হ'য়েছিলো তাই অবাক না হলেও এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করলাম। ওদের আসরে আমরাও ভিড়ে পড়লাম। দুধের লাস্‌সী চাই না দইএর লাসসী চাই—এ প্রশ্নে বিব্রত বোধ করলাম। নতুন অভিজ্ঞতার জন্যে দুধের লাসসীর বরাদ্দ দেওয়া গেলো—কিন্তু, দুধের লাসসীতে চুমুক দিয়ে নিরাশ হ'লাম। দইএর লাসসীর পাশে এর কোন দাম নেই। লাসসী খেতে খেতে ওদের হৈ হল্লাতে আমরাও যোগ দিলাম—কোন রকম সঙ্কোচ বা আড়ষ্টতা বোধ করলাম না। এটা তাদেরই অকপট হৃদয়ের সাফল্য না আমাদের মনোগত উৎকর্ষতা? এ বিষয়ে আমাদের চেয়ে তাদের কৃতিত্বই বেশি মনে হ'লো। সাতদিন প্রায় পাঞ্জাবে আছি—একদিনও তীব্রভাবে অনুভব ক'রতে পারলাম না, দেশের সঙ্গে আমাদের হাজার দেড়েক মাইলের ব্যবধান রয়েছে।

লাসসী খাবার পর একজনকে বললাম, 'বাবার গ্রামটা ভাল ক'রে দেখতে চাই। এ কদিনের programme এর ভিড়ে ভালো করে গ্রাম ঘুরে দেখবার সুযোগ পাইনি। খুশি হয়ে একজন আমাদের সঙ্গে চললো। যেতে যেতে ভাল-খারাপ দু'ধরনের বাড়িই চোখে পড়লো যেমন অন্যত্রও চোখে পড়ে থাকে। দুটো জগতের সীমান্ত এখানেও আছে। আমাদের দেশের মত এখানেও গরীবদের বাড়িগুলো গ্রামের পাশে পাশে। জীর্ণ রুক্ষ গলিত কুটীরগুলো সারির পর সারি আমাদের দিকে দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে—হতাশায়, অবসাদে—আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে মুক্তির দিন গুনছে হয়তো। ভাক্‌না কন্‌ফারেন্সের খবর এদেরও কানে এসে ঢুকেছে—তাই আকাশ চাওয়া দৃষ্টি আজ মাটির মুখে ফিরেছে—ফিরেছে ওই অনাদ্রিত প্রান্তরের পানে—যেখানে মুক্তির বাতাস আজ ভাঙন

ও সৃষ্টির নেশায় আকুল হয়ে উঠেছে। ঘুরতে ঘুরতে গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের সামনে গিয়ে পৌছলাম। মূল ঘরটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-একটু আধুনিক ধরনের বলা চলে। অন্ততঃ দুর্গঘরের আগল নেই এতে। সামনে কিছু কিছু ফুলের গাছও আছে। গ্রামের একেবারে শেষে এই ঘরটা-তাই বেশ ফাঁকা ফাঁকা। ডাকনা গ্রামে যা গলি ঘিঞ্চী-চারিদিকে উঁচু উঁচু দেওয়ালের শ্বাসরোধী রাজত্ব এখানে অন্ততঃ তার ব্যতিক্রম হয়েছে। শুনলাম, এখানে গুরুমুখী বর্ণমালায় পাঞ্জাবী লেখা পড়া শেখান হয়। সুনীতি বাবুর "ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যার" কথা মনে হলো। তাতে আছে, "শিখেরা দেবনাগরীর জ্ঞাতি সরদা লিপি হইতে উদ্ধৃত গুরুমুখী বর্ণমালায় পাঞ্জাবী লিখেন। আজকাল মুসলমানেরা ফারসী বা উর্দু অক্ষরে পাঞ্জাবী লিখিয়া থাকেন। পাঞ্জাবের বেশির ভাগ লোকই হিন্দী ও উর্দুর চর্চা করে থাকে। শিক্ষাজীবনে জনগনের ক্রমবর্দ্ধমান অংশ নেবার ফলেই পাঞ্জাবের ভাষা সমষ্টীর মৃত্যু পরিণতি হবে-ভাবতে ভাবতে ফিরলাম। পেছনে ওই স্কুলঘরটা হয়তো সেই মৃত্যু ভাষা সৃষ্টিরই লেবরেটারী।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি—Conference এর পরে নিজেদের কাজের ত্রুটি বিচ্যুতি সফলতা নিয়ে আলোচনা হয়। তাতে বড় বড় নেতাদের বক্তৃতার যে ভাবে সকরুণ এবং অকপট সমালোচনা হলো তাতে এই মনেকরে আনন্দ হচ্ছিল যে প্রশ্নহীন "দাদাবাদের" দিন শেষ হয়েছে। গড্ডালিকা প্রবাহ যে এমনি করে স্তব্ধ হতে পেরেছে তাতে ভবিষ্যতের আশা পোষণ করাচলে এবং নিঃসংসয়েই চলে। "A Party is invincible, if it does not fear criticism and self criticism." লেনিনের সেই অমূল্য কথাটা মনে হলো।...বঙ্কিম মুখার্জী এবং জেহানিয়ার বক্তৃতা ভালো হয়েছে। ডাকনা Conference পাঞ্জাবী

কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনার বৃদ্ধির পরিচায়ক।...প্রস্তাবগুলো বড়ই দীর্ঘ হয়েছে—এর পর থেকে কমাবার জন্যে suggestion দেওয়া হলো। কায়ুর কমরেডদের প্রস্তাবটি বেশ ভালভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। ফসল বাড়াও প্রস্তাবটি ভালভাবে উত্থাপিত হতে পারে নি। কিসান সভাকে কোন দলীয় নিতির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার বিষয় খুব হুঁসিয়ারী দেওয়া হলো সকলকেই কোন দলীয় চক্রান্ত বা দলীয় রাজনীতির পীঠস্থান কিসান সভা নয়। নিজস্ব নীতি এবং সময়োচিত হয়েছে বলেই মনে হলো কেননা এ নিয়ে বেশ একটা সন্দেহ এবং সংশয়ের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। জি, অধিকারীর ধীর বিশ্লেষণ আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো।

যারা অমৃতসর যাবে তাদের সকাল সকাল খেয়ে নিতে হবে। আনন্দে উল্লসিত হয়ে রহটের জলে স্নান করতে ছুটলাম। আনন্দতো হবারই কথা, গোটা ভারতের (এমন কি পৃথিবীরও বলা যেতে পারে।) জাতীয়তার যে জীবন্ত রক্তাক্ত স্বাক্ষর পড়েছে জালিয়ান্ ওয়ালাবাগে তাকে সত্যি সত্যি দেখবার সুযোগ পাবো—এটা শুধু এতদিন কল্পনাতেই ছিলো। বাস্তবে যে সুযোগ পাওয়াটা কী—রহটের জলে ব্যস্তভাবে স্নান করতে করতে সেটা বুঝলাম। অনেকদিন পরে মাথায় তেল দিয়ে স্নান করতে পেরেছি। মাথা আঁচড়াবার সময় বেশ আরাম লাগছিলো। বেশ পাতলাও লাগছিলো মাথাটা। সেই চাপাটি ডাল আর ভাজি দিয়ে খাওয়া শেষ হলো। আজ আবার খাবার শেষে পাঞ্জাবের বৈশিষ্ট্য লাস্‌সী খাওয়াবার ব্যবস্থা ছিলো। মালের চোঙায় চোঁ চোঁ ক'রে সেবে দিলাম অনেকটা। সুহাসিনী চট্টোপাধ্যায় লাস্‌সী দিচ্ছিলেন। সেচ্ছাসেবকরা অন্যান্য খাবার দিচ্ছিলেন। সম আদর্শবোধ মানুষকে কতটা উন্নত করতে পারে তাই চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। হোটেলের ঠাকুর-চাকর হলে, অথবা ভাড়াটে লোকজন হলে এভাবে

হাঁসি মুখে খাটা, প্রাণভরে অকপট যত্নে খাওয়ান সম্ভব হ'তো কী? পাশে ব'সে খাচ্ছিলেন অঙ্কের নাম্বুদ্রিপাদ ত্রিশহাজার টাকার সম্পত্তি যিনি পার্টির নামে উৎসর্গ ক'রেছেন তাঁর প্রশস্ত হৃদয়টাকে যেন বাহির থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'Are you nambudripad? তোতলাতে তোতলাতে উত্তর দিলেন তিনি। বুঝলাম, তাঁর তোতলামিটা একটু মাত্রাতিরিক্ত। তাঁকে আর বিরক্ত করা সঙ্গত বোধ করলাম না। ওদিকে যাবার তাগিদও ছিলো।

হাত মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে দেখি বাংলার সব ডেলিগেটই যাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। রওনা দেওয়া গেলো। সেই গমের ক্ষেতের মাঝ দিয়েই পথ। সেদিনের সেই অস্ত আলোর আভাস আজ আর নাই দুপুরের রোদে গমের শিষ ঝলকাচ্ছিলো।

গাড়ির দেরি ছিলো বাজারে গিয়ে এক দোকানে লাস্‌সীর অর্ডার দিয়ে বসা গেল। এইভাবে সময়টা কাটিয়ে গাড়ির সময় ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হওয়া গেলো। 'খাসা' ষ্টেশান খাসা একটুও নয়। এই Conference ছাড়া এত জনসমাগম কোনদিন হয়েছে কিনা সন্দেহ—তবু সোহন সিং ভাকনার গ্রামের ষ্টেশন সেই হিসেবেই এর মূল্য কম নয়।

অমৃতসরে আবার পৌঁছনো গেলো। অবশ্য আগেরবারের পৌঁছনের সঙ্গে এবারকার পৌঁছনোর একটু স্বাতন্ত্র আছে। সেবার দীর্ঘ ট্রেণ যাত্রার পরের ক্লান্তি একটা নতুন দেশ, নতুন ভাব কেমন যেন খাপছাড়া লাগছিলো এবার সবগুলোতেই তার বিপরীত ভাব বোধ করেছি। স্নান করে খেয়ে দেয়ে এসেছি। সঙ্গে জিনিসপত্র কিছুই নেই—পাঞ্জাবের হাবভাবে বেশ কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি—সবচেয়ে বড় কথা জালিয়ানওয়ালাবাগের . স্মৃতি তীর্থ এতদিনে ভৌগলিক কল্পনা থেকে সম্ভাব্য বাস্তবে পরিণত হয়েছে—আমাদের কাছে।

প্রথমে পার্টি অফিসে গিয়ে ওঠা গেল। পার্টি অফিসের কর্মীরা সাদর অভ্যর্থনা জানালেন আমাদের। একজন শিখ যুবকের সঙ্গে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠলো। এঁদের সঙ্গে এত অল্পক্ষণের আলাপ অথচ মনে হচ্ছিলো যুগ যুগ ধরে যেন এঁদের সঙ্গে সম্পর্ক। উন্নত এবং নিরাভরণ আদর্শের ঐক্য মানুষকে এমনি কাছে নিয়ে এসে ফেলে।

বন্ধুরা Refreshment এর আয়োজন করছিলেন। Refreshed হয়ে মূল গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হওয়া গেল। কাঠ ফাটানো রোদ্দুর। অমৃতসর শহরের বাজারের মধ্য দিয়ে পথ। দুধারে সারি সারি দোকন। কত সুন্দর সুন্দর জিনিস কাপড় চোপড়, গালিচা বাসন কোসন খাবার মানুষকে আকৃষ্ট করবার কত বিচিত্র উপকরণে দোকান সব ভর্তি। অবশ্য দামও কল্পনাতীত হওয়াই স্বাভাবিক। যুদ্ধের বাজার তো! আধঘন্টা খানেক চলার পর জালিয়ানওয়ালা-বাগের গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। Caretaker হচ্ছেন একজন বাঙালী—নাম শরৎ মুখার্জী (মুখার্জী কিনা ঠিক মনে পড়ছে না তবে শরৎ নামটা ঠিকই মনে আছে, তাঁর দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটালাম সম্ভবতঃ আমরা। আমাদের ডাকে হাই তুলতে তুলতে অলস গতিতে এগিয়ে এলেন। আমাদের উদ্দেশ্য শুনে এবং বাঙালী জেনে খুশি হয়ে চাবি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। খোলা গেট দিয়ে আমরা সেই বাগে (এখানে বাগ বলতে সম্ভবতঃ বাগান পার্ক প্রভৃতিকে বোঝায়) ঢোকা গেল।

এই জালিয়ানওয়ালাবাগ—ভারতের চল্লিশ কোটী নরনারীর স্মৃতিতীর্থ—তাদের লক্ষ লক্ষ কামনার মূক প্রতীক—তাদের মুক্তির আকাঙ্খার রক্তাক্ত স্বাক্ষর। মাইকেল ওডায়ার আজ বেঁচে নেই—তিনিও রক্তাক্ত স্বাক্ষরই বিলাতের মাটিতে রেখে গেছেন (জনৈক শিখ যুবক তাঁকে

গুলি করে মেরেছে,—কিন্তু তার রক্ত স্বাক্ষরে জালিয়ানওয়ালাবাগের বীর শহীদের অক্ষয় গৌরব নেই আছে শুধুই ধিক্কার, আছে কলঙ্ক, আছে স্বাধীনতাকামী ইংরেজ নরনারীর বিদ্রূপ আর অভিশাপ।… এই এখান থেকে ও'ডায়ার গুলি চালিয়েছিলেন—শরৎ বাবুর কথায় ফিরে তাকালাম। দেখি সাধারণ ধরনেরই একখানি মাটি যেন আপন দুষ্কৃতির ভারে আপনি খ্রিয়মান হয়ে রয়েছে। ওডায়াদের বুটের স্পর্শে কেন যে চৌচির হ'য়ে ফেটে যেতে পারেনি ভাববার ক্ষমতা থাকলে এই কথাই সে ভাবতো। তাহ'লে তো পরাধীন ভারতের এত বড় লজ্জা ও বেদনার সাক্ষী হয়ে তাকে থাকতে হ'তো না। …এই যে দেখুন মৃত শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ কত নিরীহ দেশপ্রেমিক নরনারীর রক্তে এই জায়গাটা লাল হয়ে গিয়েছিলো! শরৎ বাবুর চোখে আর ঘুম জড়ানো জড়তা নেই, ব্যথা ও সহানুভূতির পবিত্র অশ্রু সেখানে চিক চিক করছে। তাঁর অশ্রু উদ্বেল চোখে যেন পরাধীন ভারতের অপমান ও লাঞ্ছনার অশ্রুই দেখতে পেলাম।

ঘুরতে ঘুরতে একটা প্রাচীরের কাছে নিয়ে গেলেন তিনি। আঙুল দিয়ে দেখালেন ওই দেখুন দস্যুদের গুলির দাগ দেখুন। এক, দুই, তিন সব শুদ্ধ তেরোটা গুলির সুস্পষ্ট দাগ দেওয়ালের বুকে বিঁধে রয়েছে—পরাধীন ভারতের বুকে অমনি ক্ষতই বিঁধে রয়েছে মানস চোখে দেখতে পেলাম। জালিয়ানওয়ালাবাগের চারদিকেই ঘর বাড়িতে ঘেরা সামনে শুধু এই প্রাচীর। পুলিশ গুপ্তচরের মিথ্যা ঘোষণায় অনুপ্রাণিত হয়ে যারা এই সভায় উপস্থিত হয়েছিলো, পুলিশের গুলির মুখে একটা পথই তাদের সামনে খোলা ছিলো (অবশ্য খোলা ছিলো বললে ভুল হবে কেননা এই প্রাচীরটাও বেশ উঁচু) এই প্রাচীরের পথ। তাই, এই প্রাচীরের পথেই ডায়ারের পৈশাচিক গুলি ছুটেছিলো। যে সহস্রাধিক নরনারী, শিশু বৃদ্ধ এই

মরণযজ্ঞে আহুতি হয়েছে, এই প্রাচীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন তাদের অসহায় চাহনী আজও ভেসে আছে।

তাদের সমাধির বুকে গিয়ে দাঁড়িয়ে ভালো করে একবার পার্কটার চারদিকে চাইলাম। মৃতেরা যেন সমাধির তল থেকে চীৎকার করে বললো, কই, আজও তো তোমরা আমাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারনি! মৃত্যুর প্রতিশোধে আরও পঁয়ত্রিশ লক্ষ্য মৃত্যুই (বাংলার দুর্ভিক্ষে) সৃষ্টি করেছো আমরা চাই, মৃত্যুর বদলে জীবন, হত্যার বদলে সৃষ্টি। সত্যিই আমরা ওদের মৃত্যুর প্রতিশোধ আজও নিতে পারি নি। লজ্জায় ব্যথার বুকটা ভারী হয়ে উঠলো। হিন্দু মুসলমানের রক্ত মিলিত রক্তেই জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি অভিষিক্ত হয়েছে—অথচ, এদেরই বংশধর আমরা সে রক্তের সম্মানে সে মিলিত আত্মোৎসর্গের মর্যাদা রাখতে পারিনি—তাই প্রাচীরের এই গুলির দাগের মতই পুরনো ক্ষতের বেদনায় আমরা পাগল।* দেখা শেষ হয়েছিলো, কথা বলা যেন এখানে মানায় না তাই, নিস্তব্ধ গম্ভীরভাবে একটা কঠিন সঙ্কল্পের উপলব্ধি নিয়ে আমরা সেই শহীদের দেশ থেকে বেরিয়ে এলাম, ক্লিক ক্লিক্ করে গেটে তালা পড়ে গেল।—শরৎ বাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করে বেরিয়ে এলাম। শরৎ বাবুর কাছেই শুনলাম জালিয়ানওয়ালাবাগের এই property (যেটা আজ জাতীয় সম্পত্তি কংগ্রেস থেকে কিনে নেওয়া হয়)। গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসকে বেআইনী করার সঙ্গে সঙ্গে (আগষ্ট আন্দোলনের সময়) বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিলো—

---

* শোনা যায় ডায়ার তাঁর এই অপূর্ব বীরত্বের জন্য কুড়ি হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পান—বিলাতী সাম্রাজ্যবাদী বন্ধুদের কাছ থেকে এবং বিলাতের সূর্যস্পর্শা মেয়েরা তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানায়।

অমৃতসরের Golden Templeএর দিকে এবার আমরা চ'লতে লাগলাম। শিখদের মহাপবিত্র স্থান ওই মন্দিরটা। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পৌঁছলাম। রোদের তাপে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামবার আগে স্যাণ্ডাল্ খুলে রাখতে হলো। মন্দিরের areaটা রাস্তা থেকে বেশ একটু নিচুতে। সামনেই বিরাট মন্দির। সোনালী রংএর চূড়াগুলো সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে। বন্ধুবর বলবন্ত সিংকে জিজ্ঞেস করলাম, চূড়াগুলো কী সত্যি সোনার? বন্ধু ব'ললেন, না। সোনার না। সোনালী রং করা—দেখছেন না রং কেমন ফিকে হ'য়ে যাচ্ছে! সত্যিই তাই—অনেক জায়গাতেই রং ফিকে হয়ে গেছে।..মন্দিরের চারদিকেই বাঁধান পুকুর—জলের রং সবুজ। বয়সের গন্ধ যে জলের কণায় কণায় র'য়েছে! ঘুরে ঘুরে মন্দিরগুলো দেখতে লাগলাম। ঘুরবার সময় সবাইকে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছিলো। কেউ যেন সিগারেট না খায়। এর আগে একবার আমাদের কয়েক বন্ধু লুকিয়ে সিগারেট খেয়ে এক ফ্যাসাদ বাধিয়ে দিয়েছিলো। Religious sentimentএ অহেতুক আঘাত দেবার কোনই অর্থ হয় না। মাঝখানের মন্দিরটায় ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে দেখলাম, একজন শিখ (হয়তো মন্দিরের পূজারী হবেন) একখানা বিরাট বই-এর পৃষ্ঠা দুই হাত দিয়ে উল্টিয়ে যাচ্ছেন। অতবড় বিরাট বই যার ওজন আধ মণের কম হবে বলে মনে হ'লো না—দেখে চমকাবারই কথা! শুনলাম, এ-ই হচ্ছে সুবিখ্যাত গ্রন্থ সাহেব—শিখেরা যার পূজা করেন। ...আর একটা মন্দিরে গিয়ে দেখলাম সুর ক'রে গ্রন্থ সাহেব পাঠ হচ্ছে। ধার্মিক লোকেরা ঘিরে ব'সে সেই পাঠ শুনছে। ভাষা দুর্বোধ্য তাই, interest পেলাম না কিছু।

এবার আমরা একটা খুব উঁচু মিনারে এসে উঠেছি। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে অবস্থা কাহিল। উপরে উঠে খুশিতে চোখ উজ্জ্বল হয়ে

উঠলো। গোটা অমৃতসর শহরটা দেখা যাচ্ছে—দাবার ছকের মত। উতলা বাতাস চারদিক থেকে এসে সেই মিনারের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ওই যে অমৃতসর D.A.V. College. দূরের একখানা অস্পষ্ট দালানের দিকে ইঙ্গিত করে একজন শিখ বন্ধু বললেন। চারদিকে ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম করে নেবে এলাম। ভাল করে ঘুরে ঘুরে সুবিস্তৃত—সুদৃশ্য Golden Temple এর সমস্ত এলাকাটা দেখলাম। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে ছবি দেখে একদিন ইতিহাসের আংশিক ভয় ভুলেছি আজ ওরই সত্যিকার অস্তিত্ব আমাদের সামনেই। ছোটবেলায় এর অস্তিত্ব এমনিভাবে কাছে অনুভব ক'রতে পারলে ইতিহাসের বিভীষিকা হয়তো কাটাতে পারতাম যেমন আজ কাছ থেকে দেখে দেখে কাটিয়ে উঠছি।...সামাল! পেছনের বাসখানা ফ্যাচ্ ক'রে থেমে গেল। ড্রাইভারের অগ্নি দৃষ্টির বাইরে যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি রাস্তার একপাশে চলে গেলাম। পার্টি অফিস হয়ে ষ্টেশনে গিয়ে পৌছলাম। দেরি করার উপায় ছিল না। আবার ট্রেন খাসা স্টেশানে এসে দাঁড়ালো। পলমের (গম) খেত পেরিয়ে ভাকনার ক্যাম্পে যখন ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

সারু, মাণ্টা, মিরঠা গাছের (একরকম ফলের গাছ) ভালো ভালো কিশোর ফলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। আমারও ঘুম পাচ্ছিলো। চাপাটির চাপে গভীর ঘুমের দেশে গিয়ে পৌছলাম। কিন্তু, মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখলাম, সেই শীতের দেশেই আছি। শীতের চোটে কাঁপছি, যেন ওই নিঃসঙ্গ রাতের তারার মতই কাঁপছি। বৌদির কম্বলও সেই কাঁপুনি বন্ধ ক'রতে পারলো না।...স্বপ্নে দেখলাম, জালিয়ান্‌ওয়ালা-বাগের বীর শহীদেরা কবরের তল থেকে বেরিয়ে এসেছে। স্বপ্নেই শুনলাম, আমাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ তোমরা নিতে

পার নি! ধিক তোমরা! স্বপ্নের ঘোরেই শীতের কাঁপুনির চেয়েও দুরন্ত কাঁপুনি অনুভব করলাম।...

Conference ভাঙার আগে পাঞ্জাবের পার্টির সভ্যদের এক সমাবেশ হলো। পাঞ্জাবের সমস্যা সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনার পর একজন উঠে বললেন, আমরা সোহন্ সিং যোশ (পাঞ্জাব প্রাদেশিক সেক্রেটারী) আর জি. অধিকারীকে এখানে International (তখনও Communist International উঠে যায় নি) গাইতে অনুরোধ করছি। হঠাৎ বিরাট দাড়ি গোঁফ ছাওয়া একখানা মুখ শ্রোতাদের মাথার ওপর ভেসে উঠলো। ইনিই সোহন সিং যোশ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্য। জি. অধিকারীর লম্বা, পাতলা দেহটাও কখন নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের মিলিত হাস্যকর সুরও বিশ্বসর্বহারার সংগ্রামের সংকল্পকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছিলো। হঠাৎ মনে হ'লো ঠিক এই ধরনের চিত্র যেন আরও কোথায় দেখেছি। মনে প'ড়লো, Red Star Over China বইটিতে Edgar Snow একটা চিত্র দিচ্ছেন। Peoples Theatre এর উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে মিয়াংএর কোন এক জায়গায় অভিনয়, নাচ, গান ইত্যাদি হচ্ছে। হঠাৎ শ্রোতাদের মধ্য থেকে রব উঠলো। আমরা মাও সেতুং আর চু-তের (চীনের কমিউনিস্ট নেতা) নাচ দেখতে চাই। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেলো, মঞ্চের ওপর সত্যি সত্যিই চু-তে আর মাও সেতুং গিয়ে উঠেছেন; শুধু ওঠা নয় রীতিমত নাচতে শুরু ক'রেছেন। সোহন সিং-এর গান শুনে অন্ততঃ শরৎ বাবুর সেই কথা মনে হচ্ছিলো কাবুলিওয়ালাও গান গায়!

সোহন সিং আর অধিকারীকে গাইতে দেখে সমবেত জনতা দাঁড়িয়ে উঠে গাইতে আরম্ভ ক'রে দিলো। মানুষের গভীরতম অন্তরের স্বপ্ন, কামনা ও সাধনা যেন সেই সুরে মূর্ত হয়ে উঠলো বাতাসও কানে কানে সেই গান গেয়ে গেলো। মনে হ'চ্ছিলো না যে পাঞ্জাবের

এক চাঁদোয়ার নিচে দাঁড়িয়ে আছি, মনে হচ্ছিলো, পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি আর সামনের ওই জনতার মধ্যে ইংরাজ, রুষ, মার্কিন, চীন, ভারতীয়...পৃথিবীর সব জাতি এসে মিলেছে, নতুন এক শোষণহীন জীবন রচনার সুর তাদের কণ্ঠে কণ্ঠে। গান থেমে যাওয়ার পরেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত তার রেশ থেকে গেলো। চারদিকে বেশ উৎসাহ, উদ্দীপনা, উল্লাসের জোয়ার ব'য়ে যাচ্ছিলো। সমগ্র Conference এর সার্থকতা এতক্ষণে উপলব্ধি করতে পারছি।...

Camp ভাঙার পালা শুরু হয়েছে। আলাউদ্দীনের অদৃশ্য দৈত্যরা যেন আবার প্রদীপের আহ্বানে সজাগ হয়ে উঠেছে। সেই ভাঙনের হাটে ব'সে বন্ধু ইন্দর মোহনের সঙ্গে গল্প ক'রছিলাম। ইন্দর মোহন্ উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের অধিবাসী, পড়ছে লাহোরে। এর আগে আলমোড়া না কোথায় থাকতো। বিস্ময়কর ভাবে সেখানে তাকে ম্যালেরিয়া পাকড়াও করে। সেই থেকে ভুগছে। তার কথাবার্তায়ও সেই ধরনের অবসাদ ছিলো। দেশের স্বাধীনতার জন্যে তার উদগ্র পিপাসা। কাজ করবার উৎসাহও খুব, কিন্তু রোগে ভুগে ভুগে সে উৎসাহ কাজে পরিণত হ'তে পারছে না। তারই সাথে গল্প করছিলাম। ব'সে বসে বলছিলাম, আর দুদিন পরে এই মাঠটা আবার ফাঁকা হয়ে যাবে। এ কয়দিন কত বিচিত্র জীবনের স্পর্শ সে লাভ ক'রেছে। স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় কত জাতি এই মাঠের বুকে ছুটে এসেছে। আবার তারা দলে দলে মাঠ খালি ক'রে চলে যাচ্ছে। জীবনে আর কোনদিন হয়তো আসবো না তবু, এই ক'টি দিনের দাগ কারও স্মৃতি থেকে মুছে যাবে না।

লাহোরের পথে

নিজের মনের দিকে তাকিয়ে কনফারেন্সের ফলাফল যাচাই করলাম। মনের সঞ্চিত ফসলে খুশি না হয়ে পারলাম না। কত বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শ এ কদিন ধরে লাভ করেছি। পৃথিবী-বিসারী মনের ক্ষুধা আজ কিছুটা শান্ত হয়েছে বলে মনে হলো। ছোটবেলা কতদিন এই সব দূর দেশের গল্প শুনেছি। কিশোর মন পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত নিরুদ্দেশে ছুটে গেছে। আজ এই ক্যাম্পে বসে যেন সেই কিশোর মনের সন্ধান পেলাম।…কত অভিজ্ঞতা এই কদিনে লাভ করেছি, কত অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্কে গড়ে উঠেছে। জানি এ সম্পর্ক দুদিনের তবু তাকে উপেক্ষা করতে পারছিলাম না। ওই যে বলদেব রাজ লাহোরের ছাত্র। বারে বারে এসে বলেছে, make haste comrade, we will sadly miss the Tonga. শেষবারে সে নিজের হাতেই সুটকেশটা উঠিয়ে নিলো সেটা কি শুধু ক্ষণিকের বলেই উড়িয়ে দেওয়া যায়?…যে বৃহত্তর রাজনৈতিক পটভূমিকায় :একটা দিন কাটলো, যে বিচিত্র অনাস্বাদিত ক্যাম্প জীবনের Routine life এ কদিন ধরে কাটালাম তাদের দাগ কি সারা জীবনে মুছে ফেলতে পারবো? ..একটা বিষাদের সুর যেন ক্রম-অনাবৃত মাঠে রণিয়ে উঠছে। তার ধ্বনি অশ্রুত বলেই তার আবেদন এত গভীর বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য মনের মধ্যেই সেই বিষাদের বাসা বলে তাকে এত গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারছি। টোঙ্গা আমাদের মালপত্র নিয়ে রওনা দিয়েছে। আশে-পাশে সবাই

যাবার জন্যে ব্যস্ত। এরাই আবার হয়তো আর একদিন ভারতের আর এক প্রান্তে গিয়ে তাঁবু গাড়বে, সেখানে আবার এমনি কনফারেন্স হবে, এমনি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আলোচনা হবে, দিগ্বিদিক থেকে স্বাধীনতা পূজারী বীর সৈনিকরা ছুটে আসবে, আবার ক্যাম্প ভাঙার পালা শুরু হবে। স্বাধীনতার পথে এমনি কত ক্যাম্প ভাঙা গড়া চলেছে আরও কত চলবে কিন্তু আমার জীবনে আজকের এই ক্যাম্প ভাঙা দিনের মত দিন আবার ফিরে আসবে কিনা জানি না। কমরেড, একটা বাংলা গান ধরুন পেছন থেকে বন্ধু প্রিতম লাল বললেন। সঙ্গীত চর্চার সুযোগ পাই নি বলে পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোকে অভিসম্পাত দিতে ইচ্ছে হলো, নিজের অক্ষমতা জানালেও বন্ধুরা শুনতে রাজী নন্। একদিন রাতে camp duty দিতে দিতে নাকি প্রিতম লাল আমাকে গুন গুন করে গাইতে শুনেছিলেন। মনে পড়লো, পাঞ্জাবের রহস্যময় রাত্রির নীরবতায় মুগ্ধ হয়ে একবার গান গাইতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু, সে গানে সুরের চেয়ে ভাষাই ছিলো বেশি। তবে চলতি ধারণানুযায়ী জাতীয় সঙ্গীতের ভাষায় আবেদনই বেশি তাই, শেষ পর্যন্ত প্রিতমলালের দাবীতে সম্মত হ'লাম। 'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে' রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা ধরলাম। এত গম্ভীর যে বলদেবরাজ সেও দেখি হাতেই তাল দিতে আরম্ভ করেছে, হয়তো গানের মধ্যে পাঞ্জাব এই কথাটাই শুধু সে বুঝতে পেরেছিলো তবু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকবির এই জাতীয় সঙ্গীতের সুরটি (যদিও আমার গলায় তার মর্যাদা না থাকারই কথা) তাকে মুগ্ধ করেছিলো হয়তো। দুধারে সুদূরপ্রসারী গমের ক্ষেত সকালের রোদে অপূর্ব হয়ে উঠেছিলো। টুং টুং শব্দ করতে করতে উট ছুটে চলেছে। উটের পায়ের তলের নির্যাতিত হলুদ ধুলোর কুণ্ডলী তার পিছু পিছু ধাওয়া করে চলেছে। অথর্ব ধুলোর

গায়েও কি আজ বিপ্লবের স্পর্শ লেগেছে?...ওই যে খাসা ষ্টেশান এসে গেছে। বড় জল পিপাসা লেগেছিলো সবাই গিয়ে একে একে জল খেয়ে এলাম কাছের একটা কুয়ো থেকে।

কন্‌ফারেন্স ফেরৎ লোকেই ষ্টেশান গম্‌গম্ করছে। আমরা এবার লাহোরের যাত্রী। টিকিট কাটার হাঙ্গামা ছিলো না কেননা, আমরা হাওড়া থেকে সোজা লাহোরের টিকিটই কেটে ছিলাম; এতদিনের Break Journeyতেও সেটা শেষ হয়নি। ট্রেণ এলো কিন্তু দূর থেকে তার অবস্থা দেখে চক্ষু স্থির। হ্যাণ্ডেল ধরে সারি সারি এবং গাদি গাদি পাগড়ীধারী মানুষ বাদুরের মত ঝুলছে। ট্রেণ থামলে এক ঝলক চেয়েই বোঝা গেলো, কোন রকম চেষ্টা করাই বৃথা। এক একটা হ্যাণ্ডেলের মালিক এক একজনই শুধু নয় একজনের হাত ধরে অন্ততঃ তিন চারজন ঝুলছে—অর্থাৎ, আমাদের বাঙালীর কল্পনায় যা অসাধ্য তাই। এমনিভাবে ঝুলতে ঝুলতেই হয়তো এরা রাওল-পিণ্ডি চলে যাবে। এইবার দুধে ঢেলে খাওয়া দু তিন সের ঘির মাহাত্ম্য বুঝতে পারলাম। The Punjab is aland of magic and undreamt of physique—at last for we Bengalees. অসহায় ভাবেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ট্রেণ ছেড়ে যাওয়া দেখলাম। আবার দু ঘণ্টার প্রতীক্ষা। কী করে, সময় কাটান যায় ভেবে অস্থির হচ্ছি হঠাৎ ভাক্‌নার সেই সিংহ গর্জন শুনতে পেলাম—'হিন্দী হাম চাল্লিশ করোড়।' ছুটে গিয়ে দেখি সুহাসিনী চট্টোপাধ্যায় গান আরম্ভ করে দিয়েছেন আর তাঁকে ঘিরে একটা বিরাট জনতা তাঁর পাছ দোয়ারীর কাজ করছে। শেষ পর্যন্ত যে যেখানে ছিলো সবাই এসে তাতে যোগ দিলো। সুহাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে সবাই বিপুল বিক্রমে গান গাইতে শুরু করে দিলো। সবাই একেবারে তন্ময় হয়ে গান গাইছে। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় দাঁড়িয়েও যিনি এতগুলো লোককে সুরের উন্মাদনায় নাচাতে

পারছিলেন তাঁর শক্তির একটা স্পষ্ট আন্দাজ করা শক্ত। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম, আমরা ছাড়া অতবড় জনতার সবাই দেখি সে গানের প্রতিটি ভাষা জানে। গান বহুক্ষণ ধরে একই বেগে চললো। এইভাবে অনেকটা সময় কেটে গেলো। নতুন করে উদ্দীপনাও বোধ করলাম। ট্রেণের প্রতীক্ষায়-থাকা অবসাদগ্রস্ত মনগুলো আবার চাঙা হ'য়ে উঠছে।

বহু প্রতীক্ষিত ট্রেণ আবার সীমান্তে বিন্দুর মত ফুটে উঠলো। বুকটা ঢিব্ ঢিব্ ক'রছে—আবার কি সেই দশাই দেখতে হবে? ওই যে সেইরকম লাউএর বোঁটার মত সারি সারি ঝুলান হাত! আশঙ্কায় ঢিবঢিবির গতি বেড়ে গেলো। ট্রেণের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত হাস্যকর ছুটাছুটি—সর্বত্রই নো ভ্যাকান্সীর অদৃশ্য নোটিশ হঠাৎ দেখি এক সেকেণ্ড ক্লাশ কামরার ভেতর থেকে কনফারেন্স-এর G.O.C. কমরেড বেদী আমাদের সবাইকে ডাকছেন। সবাই হৈ হৈ করে একই কামরায় ঢুকে পড়া গেলো। এর আগে সাঁওতালদের দলে দলে একই কামরায় ঢুকতে দেখে কত বিরক্ত বোধ করেছি—ভেবেছি এদের কি স্বভাব! আজ কিন্তু, নিজেদের স্বভাব এবং অন্যের বিরক্তি বিশ্লেষণ করবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলাম। দল মাহাত্ম্য যে কি সেটা এতই সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

গোটা কামরাটাকে যিনি এতক্ষণ খাস কামরার মত ব্যবহার করছিলেন সেই ভদ্রলোক দেখি বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছেন। আড়ষ্ট ভাবে তিনি এক পাশে সরে গেলেন। আমরাই যেন এই খাস কামরার মালিক হয়ে উঠলাম। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক আলাপ করতে শুরু করলেন। তিনি ভেবে অবাক হচ্ছিলেন, আমরা কেন এইভাবে হৈ হৈ করে বেড়াই? এতে সত্যিই কি কোনদিন স্বাধীনতা পাওয়া

যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁর চকচকে স্যুট-এর নিচে যে এমন একটা মরচে ধরা গোলামী মন রয়েছে ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। আর অবাকটা বা হই কেন! এই ধরনের লোকের সংস্পর্শ তো প্রথম নয়। ইনি তো তবু স্বাধীনতার পথ নিয়ে বিচার করছেন—কিন্তু, এমন লোকও তো আমাদের দেশে আছে যারা স্বাধীনতাকে নিয়ে পর্যন্ত প্রশ্ন তোলে। আমাদের সৌভাগ্য যে জাতীয় আন্দোলন আজ এই ধরনের লোকের অবশেষ আর বড় বেশি রাখেনি। G.O.Cর সঙ্গে ভদ্রলোকের তুমুল তর্ক শুরু হয়ে গেলো। স্বাধীনতা লাভের ক্ষমতা থাক বা না থাক—ভদ্রলোকের ইংরাজী বলার ক্ষমতা ছিলো এবং অসার কথা সাজিয়ে গুজিয়ে জোরের সঙ্গে প্রয়োগ করারও দক্ষতা ছিলো। Poetisation of disease and abnormality-টাইফয়েড রোগের উপসর্গকে কবির ভাষায় বর্ণনা করলে যেমন শোনায় অনেকটা তেমনিই শোনাচ্ছিলো। তর্ক ক্রমে মন্দা হয়ে এলো। নিজ আভিজাত্যে ভদ্রলোকের প্রবল আস্থা তাই নিজ অসার যুক্তির উপর অনাস্থা প্রকাশ কিছুতেই করলেন না। স্বাধীনতা তাঁর কাছে আকাশের চাঁদের মতই সুন্দর অথচ অলব্ধ বস্তুর পর্যায়েই থেকে গেলো।

এইবার শুরু হলো গান—বাংলার বন্ধুরাই গাইছিলেন। নীরস তর্কের পরে সুরহীন গানও ভালো লাগছিলো। দীর্ঘ এক বছর ধরে যুক্তির সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে হাঁপিয়ে উঠেছি যেন। হঠাৎ চলন্ত ট্রেণেই মূর্তিমান কুযুক্তির মতই চেকারের আবির্ভাব হলো। এতক্ষণে হুঁস হলো আমরা বেআইনী কাজ করে ফেলেছি তো! অবশ্য পরাধীন ধনতান্ত্রিক দেশে আইনটা এর মতই অবুঝ সামগ্রী তাও জানা আছে। আবার যুক্তি, পাল্টা যুক্তির পালা আরম্ভ হলো। বেদী চেকারের patriotic sentiment-এ appeal করলেন আমা-

দের অসুবিধার কথা বুঝাবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু একের difficulty যেখানে অন্যের opportunity তখন চেকার সাহেব আর সে নীতিকথাকে উপেক্ষা করবেন কেন। যুদ্ধের এই মাহেন্দ্রক্ষণে কোটীপতি লক্ষপতি মুনাফা শিকারীদের আদর্শ সামনে থাকতে তিনি বা আদর্শ ভ্রষ্ট জীবনের পথে ছোটেন কী করে। আধ ঘণ্টা তক্ যুদ্ধের পরে বেদী বোঝালেন আর আমরা বুঝলাম যে, লাহোর ষ্টেশান প্লাটফর্মের কোন নিরালা স্থান ছাড়া এ সমস্যার মীমাংসা হবে না। কয়েকটী মুদ্রার আসন্ন বিরহ বুকের ফুসফুসে একটু খোঁচা দিয়ে গেলো। সেকেণ্ড ক্লাসের গদীটা আর তত নরম বলে মনে হচ্ছে না। চেকারের মুখে কিন্তু বেশ নির্বিকার ভাব যেন এধরনের প্রাত্যহিক যুদ্ধে তিনি অভ্যস্ত। গড়াতে গড়াতে গাড়ি লাহোর ষ্টেশানের প্লাটফর্মে ঢুকলো। আমরা নেমে পড়লাম। বেশ নির্জন দেখে একটা জায়গায় চেকারের সঙ্গে বেদীর নিজর্ন এবং শেষ সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। চেকারের হাতখানা যখন লম্বা পকেটের মধ্যে ঢুকলো তখন দূর থেকে তাঁর মুখের তেমনি নির্বিকার ভাব লক্ষ্য করা গেল।

লাহোর ষ্টেশান। অনেকটা দুর্গের মত। উঁচু গম্বুজ গোটাদুই আকাশের দিকে উঠে গেছে। সামনেই লাহোর সিটি। রঞ্জিৎ সিং এর লাহোর—ইতিহাসের কত স্মরণীয় ঘটনা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একদিন। যাদের আত্ম গৌরবের অর্থহীন দাপটে লাহোরের হৃৎপিণ্ড বিসুবিয়সের দেশের মতই কেঁপেছে—পম্পেই-এর ধ্বংসাবশেষ মত তাদের এতটুকু চিহ্নও আর নাই। কিন্তু আজও লাহোর সেই অর্থহীন ব্যর্থ গৌরবের বন্দীশালায় বন্দী হয়ে আছে। সেই গৌরবও আজ পম্পেই-এর ধ্বংসের মতই ঐতিহাসিক অনাসৃষ্টিতেই পরিণত হতে চলেছে। ভাকনায় তো তারই আয়োজন হলো।

প্রশস্ত পীচঢালা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে লাহোরের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করছিলাম। প্রথম ধারণা কিন্তু খুব ভালো হলো না। চারদিকেই কেমন যেন একটা রুক্ষতা, চারদিকেই যেন একটা ধুলি-ধূসর ভাব। গাছে এতটুকু শ্যামল চিহ্ন নাই। কলকাতার মত মোটরের ভিড় চোখে পড়ছে না। চারদিকেই টোঙার কর্মচঞ্চলতা। ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পার্টি অফিসে উঠলাম। ভাকনায় অনেক পরিচিত মুখের সঙ্গে দেখা হলো। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর এক হোটেলে খেতে গেলাম। ভাত-চাপাটি, প্রচুর পিঁয়াজযুক্ত স্যালাড আর তারপরে লাস্সী। এখানে লাসসীটা এত ভালো লাগলো যে, পর পর বড় বড় দু গ্লাস লাস্সী পরম নিশ্চিন্ত ভরে শেষ করে দিলাম। Bill দেখে চমকে উঠলাম। এক টাকার বেশি খেয়ে ফেলেছি। লাসসীকেই ধিক্কার দেবো না অখাদ্য স্যালাড শ্রাদ্ধ করবো বুঝলাম না। সে রাত্রে ওই পর্যন্তই লাহোর।

জাহাঙ্গীর টুম্ব্

সকালে উঠেই লাহেরের প্রোগ্রাম ঠিক হ'লো। ঠিক হ'লো প্রথমে জাহাঙ্গীরের টুম্ব্ দেখতে যেতে হবে। ওদিকে বহু জোড়াতালি দেওয়া স্যাণ্ডালজোড়া বেঁকে বসেছে। মেরামত না করলে আর চলা যাবে না। গেলাম রাস্তার ধারে এক মুচির কাছে। মুচি কি আর পাওয়া যায়! কলকাতার মত মুচি এখানে সস্তা নয়। খুঁজতে খুঁজতে তো পেলাম তার সন্ধান। তার কথা বলবার ভাব দেখে যেন সকাল বেলাই মনটা খিঁচ্ড়ে গেলো। আমি গিয়ে দেখি লোকটা সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে ব'সেছে। তার পাঁয়তারা ভাঁজতেই বেশ কিছুক্ষণ লাগলো। তারপর স্যাণ্ডাল নিয়ে ব'সলো তো তার আর শেষ হয় না। তার শেলাই করার ভ্রমর জাতীয় যন্ত্রটা এতই দীর্ঘসূত্রী হ'য়ে উঠলো যে মনে হচ্ছিলো যেন সারা জীবন ওই দুর্বিসহ ভ্রমরের মুখোমুখিই বুঝি যেন ব'সে আছি। পাক খেয়ে সুতোগুলোও ঘুরছে যেন গদাই লস্কর চালে—মনে হ'চ্ছে বিকাশের পথে পৃথিবীর মানুষের আবাসস্থলে পরিণত হতে বোধ হয় এর চেয়েও কম সময় নিয়েছিলো। সহসাথীরা বোধ হয় এতক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে—কেন এই দুর্বোধ্য মুচির কাছে এসেছিলাম ভবে অসহ্য লাগছিল। শেষে এক মুচির পাল্লায় পড়ে বুঝি ঐতিহাসিক লাহোর দেখার সুযোগ হারাতে হয়। মুচি কিন্তু পরম নির্বিকার। মহাভারতের সেই ভীমের মত বক রাক্ষসের কীলবৃষ্টি উপেক্ষা করেই (এক্ষেত্রে আমার 'তাড়া'-বৃষ্টি যা শেষ পর্যন্ত বকের কীলের চেয়ে কোন অংশেই কম প্রচণ্ড হয় নি) সে কাজ ক'রে যাচ্ছে। মুখে

বিড় বিড় করে কি সব বকছে। হয়তো ফুটপাতে কাল রাতে তার ভালো ঘুম হয় নি—অথবা দেশের ছেলেটার উদ্দেশ্যে গালি বর্ষণ হ'চ্ছে কেন সে শীগ্‌গির শীগ্‌গির বড় হচ্ছে না। এই পরম ঘুমের মুহূর্তটিকে এমনি ভাবে হারাতে হ'তো না।

দাঁড়িয়ে বাবু—তেমনি অচঞ্চল . ভাবেই একজোড়া কালো হাত সামনে এগিয়ে এলো। মুচির বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে একদৌড়ে পার্টি অফিসে এসে হাজির হ'লাম। দেখি বন্ধুরা প্রায় বেরিয়ে পড়েছিলেন আর কি! দেরি না ক'রে তক্ষুনি সবাই মিলে বেরিয়ে পড়া গেলো। পথে নিখিল ভারত কৃষক সভার ডাকনার নির্বাচিত সহঃ সম্পাদক রসুল সাহেব আর গোপাল হালদারের সঙ্গে দেখা। ওঁরা, জিজ্ঞেস ক'রলেন। 'স্নান ক'রে নিয়েছেন তো! ..স্নান করেন নি—কোন কিছু দেখতে বেরবার আগে স্নান ক'রে বেরতে হয়।'

বুঝলাম কথাটা সত্যি, আরও পরে বুঝছিলাম কথাটা কত সত্যি!

টাঙা ঠিক হ'লো তিনটে। চারজন ক'রে উঠলাম। আমাদের টাঙায় গোয়ালিয়রের একজন ডেলিগেটও ছিলো। থট্ থট্ শব্দ ক'রতে ক'রতে টাঙা ছুটেছে। টাঙাওয়ালাকে বলে রেখে ছিলাম, পথে যে সব জায়গা দিয়ে যাবে তার পরিচয় দিতে। বাজারের মধ্য দিয়ে টাঙা ছুটলো। সবই মামুলী। সেই পাগড়ী বাঁধা লোকজন, সাধারণ জিনিস পত্র। সাধারণ পথ-ঘাট তবু সকালের এই স্নিগ্ধ মুহূর্তটির স্পর্শে সেই মামুলী জিনিস-পত্রও যেন বেশ লাগছিল। লাহোর তো! এর মাটিরও একটা দাম আছে। হয়তো এই পথেই রঞ্জিৎ সিং, আকবর, আওরঙ্গজেব, প্রভৃতি বাদশারা চলা কেরা করেছেন! চেঙ্গিস্ খাঁ শত্রুর পেছনে ছুটতে ছুটতে হয়তো এই পথেই এসে ছিলেন। কাবুল, কান্দাহার, গজনী, বোখারা, সমরকন্দ অতীতগন্ধী এই রাজপথই হয়তো তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছিলো। অজস্র অশ্বারোহী, উঁটারোহী নির্ভিক, মধ্য এশিয়ার বিজয়ী

বীররা হয়তো এই পথেই এসে ঢুকেছে একে একে। আজ এই আধুনিক লাহোরের পথের প্রান্তে বসে যেন দূরাতীত যুগের আহ্বান শুনতে পেলাম। ভারতের বহু বিচিত্র ভাষা, বহু বিচিত্র জাতি, বহু বিচিত্র সভ্যতায় এই রাজপথের দামও কম নয়। গ্রীক, মোগল, ইরাণী, তুরাণী, আরব, শক, হুণ পাঠান দিগবিদিক থেকে এই পথেই এসে একদিন ক্ষীণ-স্রোতা ভারতীয় স্রোতধারাকে বলিষ্ঠ এবং সতেজ করে ছিল। এই হট্টো, হট্টো—লাগামের টানে ঘোড়াটা পেছনের পা দুটো উঁচু ক'রে লাফিয়ে উঠলো। সামনের লোকটা চকিতে টাঙাওয়ালার দিকে অপরাধীর দৃষ্টি তুলে ধীরে ধীরে রাস্তার এক পাশে সরে গেলো। এইবার রাবি নদীর ব্রীজ। নদীর জল বেশ লাল। দুধারে গোলাপী বালুর চর সেই লাল জলকে উপহাস ক'রছে। শুনলাম, এই নদী দিয়ে মস্ত মস্ত কাঠ ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই রাবি নদীর তীরেই তো একদিন পরাধীন ভারতের এক যুগান্তরকারী ঘটনা ঘটেছিলো। ১৯২৯ সালের লাহোর কন্‌ফারেন্স এই রাবি নদীর তীরেই প্রথম স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হয়। রাবি নদী সেই দিক দিয়ে পাঞ্জাবের এক গৌরবময় tradition হয়ে আছে। এই নদীর নামটার মধ্যে যেন একটা ইতিহাস জেগে রয়েছে। রাবি নদীর জলে যেন কংগ্রেসের সেই আগেকার পতাকার রক্তাক্ত অংশটির আভাস দেখতে পেলাম।...রাবি নদী ছাড়িয়ে কিছুদূর যাবার পর রাস্তার ধারে ধারে প্রচুর ভাঙের গাছ শুরু হলো। ভাঙের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। ভাঙ-সেবী মহাদেবের দল এখানে প্রাতভ্রমণে এলে প্রচুর আনন্দ পেতে পারেন। পথে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি। পেশোয়ারগামী রেলপথ ডিঙিয়ে টাঙা এগিয়ে চললো। বিলীয়মান ট্রেণখানার দিকে একবার লুব্ধ চিত্তে তাকালাম। একটু পরেই টাঙা জাহাঙ্গীর টুম্বের ফটকের সামনে এসে নামলো।

অনেকক্ষণ টাঙার মধ্যে বসে বসে হাত-পায় কেমন জড়তা এসে গেছে। মোড়ামুড়ি ছেড়ে একবার চাঙা হবার চেষ্টা করলাম। সামনেই ছোট্টো একটা দোকান। দেখি, গোল গোল আখের খণ্ড বিক্রী করছে। পরম আগ্রহে কিনলাম।

জাহাঙ্গীর টুম্ব সামনেই দেখা যাচ্ছে—ছবির মত। বিরাট কম্পাউণ্ড চারদিকে নানারকম ফুলের গাছ। কম্পাউণ্ডটা উঁচু প্রাচীর দিয়ে চারদিক গোল করে ঘেরা। একজন বললেন, দেখেছেন, কি বিরাট কম্পাউণ্ড! টুম্বের দিকে এগোতে এগোতে একজন বললেন, বাঃ! টুম্বের চারপাশে চারটে গম্বুজ উঠে গেছে। বিচিত্র রঙে রঙীন এই টুম্ব যেন ঝক্‌মক্ করছে। বহু যুগের পুরনো বলেই মনে হয় না। এর মেঝেতে উঠতেই কতকগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হলো। উঠতেই একজন ছেলে এগিয়ে এলো—জুতো খুলতে হবে এবং সে-ই জুতো প্রভৃতি পাহারা দেয়। স্যাণ্ডেল খুলে রেখে খালিপায়ে সেই ভাঙা মার্বেল-এর মেঝের উপর চলতে বেশ আরাম লাগছিল। ধীরে ধীরে একটা গম্বুজে গিয়ে উঠলাম আমরা। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে অমৃতসরের কথা মনে হলো। উপরে উঠে চারদিকে তাকিয়ে দেখে বেশ আনন্দ লাগলো। চারদিকে গাছপালা। অন্য তিনটা টুম্বও দেখা যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখলাম। নূরজাহানের জন্যে উন্মাদ জাহাঙ্গীর মৃত্যুর কোলে শুয়ে আছেন—যেখানে প্রেমের উত্তাপ মৃত্যুর অতল শীতলতার রাজ্যে পৌঁছতে পারে না জাহাঙ্গীরের অদৃশ্য দেহ আজ সে রাজ্যের বন্দী। প্রেমকাতর দেহ আজ সামান্য ধূলায় পরিণত। যে শক্তি নূরজাহানের স্বামী শের-আফগানকে জীবনের এপারে থাকবার অধিকার দেয় নি—তারও জীবনের অধিকার যে এমন করে বাজেয়াপ্ত হবে তা যদি জাহাঙ্গীর জানতেন! মার্বেল, হর্ম্যের উজ্জ্বল আড়ম্বর ও জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর অন্ধকারকে ঢাকতে

পারছে না স্পষ্টই দেখলাম। থুপ্ থুপ্ থুপ্—সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে আবার নিচে নেমে এলাম। চারদিকে ঘুরে ফিরে একবার দেখলাম। দেখবার যা ছিল শিখবার তার চেয়েও বেশি ছিলো। ইতিহাসের গতি স্তব্ধ ভেবে যারা জনসাধারণের জীবনের উপর খবরদারি করছেন, তাদের নিচু হয়ে থাকার সর্তে উঁচুতে বসে বাদশাহী চাল চেলেছেন, সুর্মা লাগানো চটুল আঁখি রঙিন সুরায় রাঙিয়েছেন, তাঁরা ভাবতেও পারেন নি। ইতিহাস এমন নিষ্করুণভাবে সবচেয়ে সম্ভাব্য নিচুতে তাঁদের টেনে নামিয়ে দেবে। চীনের সম্রাট, ইংলণ্ডের সম্রাট, রাশিয়ার জার। অবশেষে জার্মানীর কাইজার একে একে সবাই সেই নিচুতে নেমে এসেছেন। সাম্রাজ্যবাদী মানব আজও দানবের মত সে কথা অস্বীকার করতে চাইছেন কিন্তু রাবি নদীর তীর কি সে কথার স্থির উত্তর নয়! ইতিহাসে পড়েছি কিন্তু ইতিহাসের মর্মবাণী এমন কাছ থেকে কখনও অনুভব করি নি। আজ জাহাঙ্গীরের সমাধির পাশে দাঁড়াইয়া যেন বিশ্বজোড়া দম্ভ আর আধিপত্য শোষণ আর শাসনের সমাধির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেলাম। পুত্রহন্তা জাহাঙ্গীর, আকবরের বিলাসী ছেলে জাহাঙ্গীর আজ মহাকালের বন্দী। কম্পাউণ্ড এর চারদিকে ঘুরে ঘুরে আবার প্রধান ফটক দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়াচ্ছে আর খাবারের আশায় ধুলোর ওপর ফঁস্ ফঁস্ শব্দ ক'রে নিঃশ্বাস ছেড়ে খাবার খুঁজবার বৃথাই চেষ্টা করেছে। টাঙাওয়ালা টাঙার মধ্যেই নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে। সঙ্গীরা দেখি টাঙায় না উঠে প্রাচীরের ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। জিজ্ঞেস করে জানলাম, নূরজাহানের কবরও কাছেই।

ভাবতে ভাবতে চললাম, জাহাঙ্গীর বিদ্রোহের অভিযোগে তাঁর ছেলেকে বন্দী করে তার চোখ অন্ধ ক'রে তার ক্ষমতা খর্ব করেছিলেন। আজ মহাকালের অদৃশ্য হাত তাঁরও চোখের সবটুকু দৃষ্টি কেড়ে

নিয়ে তাঁর ক্ষমতা চির অবসান ক'রেছে। জাহাঙ্গীর আর উঠবেন না। কিন্তু, পৃথিবীতে জাহাঙ্গীরের প্রতিনিধিরা আজও মহাকালের নিয়ম ব্যতিক্রম করবার চেষ্টায় আছেন। জাহাঙ্গীরের টুম্ব তো তাঁদেরই স্মরণে।

অভিশপ্ত নূরজাহান

নূরজাহানের কবরও এখানে শুনে একটু আশ্চর্য এবং তার চেয়ে বেশি আনন্দিতই হয়েছিলাম। পেশোয়ারগামী রেললাইন পেরিয়ে চললাম। লাইনটার শেষ পর্যন্ত আর এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে ইচ্ছে হলো। খানিকটা এগোতেই সামনে খানিকটা জঙ্গলা মত একটা জায়গা একখানা সাদা ছোট দালান দেখা গেলো। কাছে যেতে শুনলাম এটাই নূরজাহানের সমাধি। একটু অবাকই হলাম। 'লাইট অব দি ওয়ার্ল্ড' নামে যে রমণী একদিন ইতিহাসের কয়েকটা পৃষ্ঠায় বিদ্যুৎ চমক রেখা ফুটিয়েছিলেন আজ তাঁর মৃত্যুর শিয়রে সে বিদ্যুৎ ছটা কোথায়! বিদ্যুৎ-চমক না চমকের বিদ্যুৎ—ম্লান-স্তিমিত-নিরাভরণ একটা সমাধির দিকে তাকিয়ে এ প্রশ্নেরই মীমাংসা খুঁজছিলাম। সমাধি গৃহের মাঝখানে ছোট্ট একটা শ্বেত পাথরের বেদীর নিচে 'পৃথিবীর আলো' পৃথিবীর আকণ্ঠ অন্ধকার নিয়ে শুয়ে আছেন। বাদশাহী হারেমে যাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিলো, সাম্রাজ্যের ওঠা-পড়ার সঙ্গে জড়িত থাকার শক্তি ছিলো যাঁর, উঠতে-বসতে সহস্র কুর্নিশ যাঁর জীবন ঘিরে রেখেছিলো, যিনি পুরমহল (ঘরের আলো) থেকে নূরজাহানএ (পৃথিবীর আলো) রূপান্তরিত হয়ে পড়েছিলেন 'শের আফগানের বিবাহিতা স্ত্রী সেই মেহেরুন্নিসার শেষ জীবনের দুর্দশার প্রতিচ্ছবি হয়ে আছে এই সমাধিগৃহ। ইতিহাস মানুষের ক্ষমতা কি এমনি করেই তাচ্ছিল্য করে! ঝরা-পাতার ক্রন্দনে যেন শুভ্র পাষাণ ফলক সিক্ত হয়ে উঠেছে। শ্বেত করবীর মৃত্যুবিলাপ যেন সমাধি শিয়রে

সদা জাগ্রত প্রহরী। বাদশাহী প্রতাপে যাঁর শেষ বিবাহিত জীবন কেটেছে—শেষের জীবনে শাজাহানের দেওয়া (শাজাহান তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী মমতাজকে বিয়ে করেন এবং এই শাজাহানকেই এক সময়ে নূরজাহান করুণা করতেন বলে শোনা যায়) সামান্য পেন্সনে তাঁকে দিন কাটাতে হবে ভাবতেও কেমন অদ্ভুত লাগে। এই অদ্ভুতই তো ভৌতিক পৃথিবীর শিল্প-চাতুর্য। পৃথিবীর অথবা প্রকৃতির এই চাতুর্য না থাকলে জীবনকে আমরা এত কাছ থেকে অনুভব করতে পারতাম না। তবু একটা ঐতিহাসিক আড়ম্বরের করুণ পরিণতি মানুষের মানবিক দিকটা স্পর্শ ক'রে যায়—আমারও স্পর্শ করেছে। মানুষের যে রাজনৈতিক দিক আছে সেদিক থেকে নূরজাহানের স্মৃতিকে একটা বিচারহীন অন্যায় ব্যবস্থার প্রতিভূ বলে মনে হলো। এই প্রতিভূ মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ করে না—সৃষ্টি করে সীমাহীন ধিক্কার। ব্যথার অশ্রু, ধিক্কারের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ একই মনের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুই সত্বাকে উপলব্ধি করলাম। কোচোয়ান কিন্তু নির্বিকারভাবে টোঙার মধ্যেই নাক ডাকাচ্ছে। এই সব দ্বন্দ্বের জন্যে ওর মন তৈরি হয় নি। ওর মনের ক্ষেত্রও তো প্রস্তুত করলো সেদিনের সেই ভাকনার কনফারেন্স। ক্ষেত্র উপযোগী হওয়া পর্যন্ত এই ভাবেই ও ঘুমোক ওর যদি জীবনের সহস্র ক্ষুধাকে একটু ভুলতে পারে। অবশ্য ক্ষেত্র প্রস্তুতের দায়িত্ব ওরও রয়েছে একথা কোনমতেই ভোলা উচিত নয়।

পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিৎ সিং

এবার রঞ্জিৎ সিংএর ভগ্নপ্রায় ফোর্টের সামনে এসে টোঙা থামলো। বিশাল গেট—রাজকীয় জমকে দীর্ঘ এবং বলিষ্ঠ প্রাচীরে চারদিক ঘেরা। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমেই কেমন একটা বিস্ময় এবং সম্ভ্রম বোধ মনের মধ্যে দেখা দিলো। বুঝলাম, এই বিস্ময় এবং সম্ভ্রম বোধই সামন্তদের ঘিরে ছিলো বলে সামন্তরা দেবজগতে উন্নীত হতে পেরেছিলেন। ফলে, তাঁদের নীতি অথবা সামন্তব্যবস্থার সমীচীনতা নিয়ে লোকে প্রশ্ন তোলে নি বহুদিন। আজও আমাদের দেশে বহু লোকের মনে রাজা জমিদার প্রভৃতিদের নামের সঙ্গে দেবত্ব কথাটার কেমন একটা অস্পষ্ট যোগাযোগ র'য়েছে। তাই, আজও কালাতীত এই সব বিগ্রহরা কিছু কিছু স্তাবকতা পেয়ে থাকেন—দুধ ঘী দিয়ে এঁদের শ্রীবৃদ্ধি সৃষ্টির কাজে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই টুকুই তো লাভ। সামন্তের উপর শ্রদ্ধা থাকলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আর অশ্রদ্ধা কেন জমবে। দুয়েরই তো নাড়ীতে নাড়ীতে যোগাযোগ! একের পরিপুষ্টির ওপর অন্যের পুষ্টি নির্ভর করে। তাই যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদীরা দেশে দেশে এইসব মিউজিয়ামের পুতুলকে মণ্ডপে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু, এই যোগাযোগই তো পরাধীন জাতির দৃষ্টি শক্তিকে সাহায্য করেছে। রঞ্জিৎ সিং-এর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে এতগুলো কথা মনে হলো। মনে পড়লো, লাটদরবারে এঁদের মুন্সিয়ানার কথা। সম্ভবতঃ চার আনা পয়সা দিয়ে এক খানা টিকেট কিনে ভেতরে ঢুকতে হলো।

'গাইড্ বাবু?'—পাশ থেকে কয়েকজন লোক এসে হাজির। তারা রঞ্জিৎ সিংএর ফোর্টের কোথায় কি আছে না আছে সব বুঝিয়ে দেবে। কলকাতায় সরবতের মতই এঁদের রেট। যেরকম পয়সা দেবেন সেই পরিমানে স্বাদ-গন্ধ-তৃপ্তি পাবেন। একজন বললে, ব্যস্, আপলোক বাঙলা সে আতে হেঁ—আপকো ওয়াস্তে ম্যয় আট্ আনামে বিলকুল সব দেখলায়েঙ্গে! মায় হিন্দী, পাঞ্জাবী, আংরেজী (সম্ভবতঃ ফ্রেঞ্চ আর লাটিনটি বাদ পড়েছিলো) হর বাৎ জানতে হুঁ—আপলোগকা মরজী!

মরজী আমাদের বড়ই খারাপ। তাই, তার চোখের মণিতে একটু বিস্ময়ের রেশ রেখে আমরা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলাম তার ইংরাজী ভষারও কদর আমরা দিতে পারলাম না।

পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিৎ সিং—একটা সামান্য মিসল (দল) এর সর্দার থেকে যিনি একজন স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় গৌরব অর্জন করেছিলেন। তাঁর ক্ষমতায় এবং বুদ্ধিতে কারও প্রশ্ন ওঠে না। অবশ্য তাঁর ভাগ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিলেন, পানিপথ বিজয়ী আহম্মদ শাহ দুরাণীর পৌত্রকে পাঞ্জাব অধিকারে সহযোগিতা। সেই সময়ের পাঞ্জাব বিভিন্ন মিসল অথবা দলে বিভক্ত ছিল। রঞ্জিৎ সিংএর কৃতিত্ব সেই বিভিন্ন দলকে এক সঙ্গে মিলিয়ে এক অখণ্ড পাঞ্জাবের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন এবং এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে সাম্রাজ্যবাদীরা চিরকাল সমীহ করে চলে বলেই অমৃতসরের সন্ধিতে রঞ্জিৎ সিং-এর রাজত্বের মর্যাদা রাখতে ইংরাজরা সম্মত হন। সামন্তব্যবস্থার অন্যায়কে স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে রঞ্জিৎ সিং খণ্ডিত কতকগুলো ভৌগলিক অংশকে একটা অখণ্ডতার রূপ দিতে পেরেছিলেন। শিখদের ইতিহাসে এটা একটা গৌরবময় ঐতিহ্য হয়ে আছে।

সেই রঞ্জিৎ সিং-এর জরাজীর্ণ শিষমহলের মধ্যে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট

ছোট ছোট আয়নার মত কাঁচগুলোকে অবাক হয়ে দেখছিলাম। ঘরটা আগাগোড়া এমনি কাঁচে ছাওয়া ছিলো। নিদর্শন হিসেবে দু একখানা কাঁচ নেবার লোভ হচ্ছিলো। এমনি লোভ হয়তো আরও অনেকের হয়েছে তাই, শিষমহল ক্রমবর্ধমান গতিতে নিরাভরণ হয়ে উঠছে। রঞ্জিৎ সিং-এর আমলে শিখ মিসলের মত কাঁচ-গুলোও হয়তো পরস্পর থেকে এইভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

এক ঘরে পুরণো যুগের অস্ত্র শস্ত্র দেখা গেল। গাদা বন্দুক থেকে আরম্ভ করে বল্লম পর্যন্ত সবই রয়েছে। এক জায়গা থেকে বহু নিচুতে সাজানো মোটর ট্রাকের শ্রেণী দেখা গেল। যুদ্ধের প্রতীক্ষায় রয়েছে তারা হয়তো। তাই ট্রাকগুলোর দিকে দৃষ্টি পড়তেই রঞ্জিৎ সিং-এর গাদা বন্দুক যেন করুণার পাত্র হয়ে উঠলো। রঞ্জিৎ সিং যদি এ ধরনেব ট্রাক কিছু পেতেন তাহলে তাঁর রাজ্য হয়তো কাশ্মীরের ডাল হ্রদ পেরিয়ে কাবুলের ওপারে গিয়ে পৌছতো। মোটরকারের যুগে যে রঞ্জিৎ সিংরা অচল আবার রঞ্জিৎ সিং-এর যুগে মোটরকার তাঁর চেয়েও বেশি অচল। এই অচলতা আর সচলতার মিলন একই ফোর্টের মধ্যে হয়েছে। রঞ্জিৎ সিংও জাহাঙ্গীরের মতই আজ ঐতিহাসিক মিউজিয়ামেই পরিণত হয়েছেন। ভাবীকাল ওই ট্রাকশুদ্ধ আমাদেরও একদিন ঐ ধরনের মিউজিয়ামেই পরিণত করবে—তবু সান্ত্বনা থাকবে যন্ত্র জগতের উদ্দাম-গতির দিনেই আমরা জন্মগ্রহণ করেছিলাম। ওই ট্রাকের সঙ্গে এই টোঙার যতটা পার্থক্য আমাদের সঙ্গেও কী ভাবীকালের অমনি গভীর পার্থক্য থাকবে! থাকবে হয়তো নইলে, কী আশ্বাসে বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন, "We are only at the cock crowing and the morning star"।

দেখবার খুব বেশি কিছু ছিল না। এখানেও সেই ভাবময় জগতের উপলব্ধিই বেশি—হয়তো সমস্ত ঐতিহাসিক স্থানই এমন। জগতের

গতিশীলতার এমন পরিচয়, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, পরিচ্ছেদ এক কথায় সব কিছুর সুষ্ঠু বিকাশের স্বাক্ষর আর কোথাও এমন অনুভব করা যায় না। যারা ইতিহাসের এই উন্নত গতিবেগকে স্বীকার করেন না, তাঁদের উচিত খোলা মন নিয়ে এইসব ঐতিহাসিক স্থান দেখা। দেখলেই বুঝতে পারবেন, যে বিজলী-বাতির তলে বসে অন্ধকার রাত্রির বুকে কক্ষচ্যুত উল্কার মত মস্কো, তেহেরান, মিচিগান, টাঙ্গানিকা তাঁরা নিমেষে পাড়ি দেন তার মূল্য কত। ইতিহাসের বুকে তারা কি অমূল্য অবদান। শূন্যে ছবি ছুটছে, আকাশে মানুষ ছুটছে, পাতালে মানুষের আনাগোনা—স্বর্গ-মর্ত-পাতালের এইসব অধীশ্বররা কি সত্যই এইসব অতীত-ফেরানো চক্ষুর কাছে অবহেলা ও অবজ্ঞার পাত্র! ফিরবার পথে এইসব ভাবছিলাম্। একটা দিকে আমাদের যেতে দেওয়া হলো না শুনলাম, পল্টন রয়েছে। রঞ্জিৎ সিং-এর দুর্গে আজ স্টেনগানধারী রেজিমেন্ট হয়তো আধুনিক কামানও দু'চারটে আছে যার একটা গোলার ঘায়েই রঞ্জিৎ এর এই দুর্ভেদ্য (?) প্রাচীর চৌচির হয়ে উড়ে যাবে! গেটের কাছে দেখি সেই সব আংরেজী জানা গাইড তেমনি ভাবে নতুন শীকারের প্রতীক্ষায় আছে। পৃথিবীর বিবর্তন দেখে মনে হয় আগামী দিনে এদের আংরেজীর সঙ্গে রুষ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, লাটীন, নিগ্রো, এস্কিমো সব ভাষাই জানতে হবে—নইলে, নেহৎ পোষাবে না।

অতীতের লাহোরকে পেছনে ফেলে এবার আধুনিক লাহোরের দিকে টাঙা ছুটলো। মাথার ওপর সূর্য জ্বল জ্বল করছে। নিচের মাটি থেকে ঝাঁজ উঠছে। ক্ষিদে তৃষ্ণাও বেশ লেগেছে। তবু থামবার উপায় নাই। আর একদিন মাত্র লাহোরে থাকবো আর আসা হবে কিনা ঠিক নেই। যা পারি দেখে নিই। দূর দেশে বেরিয়েছি এবার দেশ দেখবার নেশা লেগেছে। পাশের গোয়ালিয়রের বন্ধুর

কাছ থেকে তাঁর লস্কর এর ঠিকানা (গোয়ালিয়রের রাজধানী) নিলাম—ফেরার পথে যদি সুযোগ নিতে পারি। তিনিও উৎসাহের সঙ্গে লিখে দিলেন।...সেই ভাঙ্‌ গাছের গন্ধ পেরিয়ে রাবি নদীর ব্রীজ ডিঙিয়ে, আনারকালির বাজার ছাড়িয়ে আধুনিক লাহোরের রাজপথে এসে টাঙা থামলো।

সময় বেশি নেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে হলো। 'শালিমার বাগ' দেখার সুযোগ আর হয়ে উঠবে না—বেশ কিছু দূর সেটা। কাছেই লরেন্স গার্ডেন—দেখবার মত জিনিস। অতএব, রোদের মধ্যেই রওনা দিলাম।

লরেন্স গার্ডেন

লরেন্স গার্ডেনে যেতে পাঞ্জাবের Assembly হাউস চোখে পড়লো। পাঞ্জাবের ভাগ্য নিয়ে এখানে ছিনিমিনি খেলা হয়। দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সমস্ত রূপই এখানে প্রতিফলিত হয়। জনসাধারনের অর্থপুষ্ট আমলারা এখানে কত সুষ্ঠুভাবে তাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার ব্যবস্থা করে। পাঞ্জাবের এই হৃৎপিণ্ডটির দিকে তাকিয়ে যেন তার ধুক ধুকি আওয়াজ শুনতে পেলাম। জুলজিকাল গার্ডেনের পাশ কাটিয়ে খর মধ্যাহ্নের মধ্যে হন্ হন্ করে চ'লেছি, হঠাৎ পাশের রাস্তায় দেখি ডাক্‌নার সেই "হ্যালো মিল্ক" লেডিস্ সাইকেলে হন্ হনিয়ে চ'লেছেন। জিভের আগায় "হ্যালো মিল্ক" কথাটা এসেও থেমে গেলো—লোকে কি ভাববে!

এবার লরেন্স গার্ডেনের সীমানা শুরু হ'য়েছে। গোটাকয়েক কৃত্রিম পাহাড়ের মাথায় নন্দন কানন তৈরি হয়েছে। বিশ্বকর্মা নাকি সেকেন্দর হায়াৎ খাঁ। সারাদেশ আখের ছিবড়ের মত শুকিয়ে দিয়ে দু'চারটা লরেন্স গার্ডেন তৈরি হোক—বিলাত ফেরৎ যোহুকুম দের দু চার জনের আয়েস ও আরামের স্থানের বিঘ্ন না হয়। বিদেশীরাও এদেশ বেড়িয়ে গিয়ে বলতে পারবেন,—ওঃ, ভারত যেন একেবারে প্যারাডাইস, ভারতের পাঁজরের শুকনো হাড়গুলো লরেন্স গার্ডেনের লতা বিতানে ঢাকা পড়েছে যে!

পাহাড় (মানুষের তৈরি মাটির কৃত্রিম পাহাড়, ডিঙিয়ে উঠতে দুধারে সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ, চারদিকে সবুজ ঝোপ—ঝাড়, রঙীন ফুল

প্রকৃতির ওপর মানুষের অধিকারের চিহ্ন হিসাবে চারদিক আলো করে আছে। লরেন্স গার্ডেন যেন একই সঙ্গে মানুষের লজ্জা আর জয়গৌরবের নায়ক। লজ্জা এই জন্যে যে চারিদিকের রিক্ত জীবনের মাঝে যেন এ আড়ম্বর মনুষ্যত্বের উপর চরম অপমান আর জয়-গৌরবের কারণ। বিশৃঙ্খল এবং ছন্নছাড়া বন্যপ্রকৃতি মানুষের সুললিত কল্পনায় কি সুন্দর রূপ নিয়েছে! কখনও পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে কখনও নেমে চলতে হচ্ছিলো। এক জায়গায় পথের পাশে দেখি একটা কল রয়েছে—পিপাসা পেয়েছে প্রচুর—পাশের বন্ধু বললেন, এত রোদ্দুরে ঘুরে চট্ করে জল খাবেন না—সর্দি লেগে যাবে। নিরস্ত হলাম। সামনে একটা জায়গায় সিন্দুরে, গোলাপী, জাফরাণী—নানা রঙের কলাফুলের ঝাড় দূর থেকে অপূর্ব দেখাচ্ছিলো। সঙ্গী পাঞ্জাবী বন্ধু বললেন, চলুন এবার আপনাদের ওপ'ন এয়ার থিয়েটার দেখাবো। বস্তুটি আমাদের কাছে নতুন। তাই দেখবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে উঠলাম।

ওপ'ন এয়ার থিয়েটার সামনেই সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো গোল করে তৈরি দর্শকের বসবার একটানা আসন—অনেকটা প্রাচীন গ্রীস রোমের স্টেডিয়াম-এর মত। তারই মুখোমুখি খুব উঁচু—স্টেজের প্লাটফর্ম। মাথার উপরে ছাদের বালাই নেই—সেই জন্য নাম হয়েছে ওপ'ন এয়ার থিয়েটার। চমৎকার পরিকল্পনা—জ্যোছ্না রাতে চমৎকার লাগবার কথা। পাঞ্জাবী বন্ধু বললেন, এখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দলবল নিয়ে নাচগান, নাটক প্রভৃতি করে গেছেন। কবিগুরুর উপস্থিতি যেন মানস চোখে কল্পনা করলাম। সুদূর বাংলার এক সুমহান সম্পত্তি যে এখানে তার প্রভাব রেখে যেতে পেরেছে ভেবে তৃপ্তি বোধ করলাম। এবার পাঞ্জাবের পালা।

শুনলাম, সারাভারতে একমাত্র লাহোরেই ওপ'ন এয়ার থিয়েটার

আছে—পাঞ্জাব সেদিক দিয়ে গর্ব করতে পারে। পাশেই গ্রীন রুম ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পাহাড়ের মাথায় এক গাছতলায় বসা গেল। কি আরাম! ঝির ঝির করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। চঞ্চল গাছের ছায়া যেন তন্দ্রালু উত্তপ্ত মধ্যাহ্নকে গাঢ় তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে তুলেছে। পাশের বন্ধু চিমটি কেটে দেখালেন, একটা লোক কেমন বসে বসে মস্ত একটা হাঁ করে ঝিমচ্ছে। সিগারেটের গন্ধে বাতাস বিভোর। সেকেন্দার হায়েৎ খাঁর কীর্তি এই গার্ডেন—অনিবার্য ভাবেই সেকেন্দার এবং তাঁর ইউনিয়নিষ্ট দলের কথা উঠে পড়লো। পাঞ্জাবী বন্ধু তাঁর মুখ দুটোকে যতদূর সম্ভব বিকৃত করে বললেন আরে ছেড়ে দিন্ ছেড়ে দিন। ইউনিয়নিষ্টদের কথা যত সব জমিদার, রাজা, মহারাজাদের আড্ডাখানা হচ্ছে এই দল। এদের দাপটে পাঞ্জাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা বান্চাল হয়ে গেছে। পাঞ্জাবে তো আগষ্ট আন্দোলনের ঢেউ তেমন করে আসে নি—তবু দেখুন শত শত কংগ্রেসী বন্দীর ভিড়ে জেলখানা গমগম করছে। এদের তিলমাত্র নীতির বালাই নেই। হিন্দু, মুসলমানের যতসব ওঁছা লোক এখানে এসে ভিড় পাকিয়েছে—আসল লক্ষ্য হল এদের গণআন্দোলনকে দুর্বল করা —বুঝেছেন? পাগড়ী মাথায় পরতে পরতে এক নিঃশ্বাসে সে এত-গুলো কথা বলে গেলো। বুঝলাম, ইউনিয়নিষ্ট দল সম্বন্ধে একটা তীব্র বিক্ষোভ বন্ধুর মনের মধ্যে জমে আছে।

দেখা শেষ হয়েছে। এবার রওনা দেওয়া গেল। পার্টি অফিসে ফিরে এসে দেখি কন্‌ফারেন্স ফেরৎ আরও অনেকে এর মধ্যে এসেছেন। বিশ্রাম করে এদের সঙ্গে আলাপ করা গেল। এদের মধ্যে অনেকে কলেজের ছাত্র। একজন প্রফেসার—সবাই রাওলপিণ্ডির। টানা ফরাসে আমরা লম্বা হয়ে সবাই শুয়ে আছি—প্রফেসর রাওলপিণ্ডির গল্প করছেন। মনে হচ্ছিলো স্বপ্নময় এক জীবন প্রভাতে দিদিমার

বুদ্ধিমানের মত আমরাও নিরস্ত হ'লাম। ওঠার সময় বুঝলাম, রুটি বেশ কিছুক্ষণ পেটে থাকবে।

ঠিক সময়ে সত্যব্রত বেদী হাজির—মাথায় এঁর পাগড়ী নেই। কিন্তু জেলখানায়, ক্যাম্পে, আন্দামানে প্রগতিশীল ভাবধারার সংস্পর্শে এসে-শোনা যায়, এঁদের মধ্যে অনেকে বাইরে বেরিয়ে একটু অবাস্তব হ'য়ে ওঠেন। পাগড়ী ফেলে, বালা খুলে ফেলে, দাড়ী ছেঁটে এঁরা কৃষক আন্দোলন করতে গিয়েছিলেন-ফলে এঁরা নাকি কৃষকদের মধ্যে একেবারেই পাত্তা পান নি (শিখ কৃষকদের মধ্যে)—তাই, এঁরা অনেকে আবার সে সব ধরেছেন। সত্য মিথ্যা জানি না-এই রকম একটা গল্প এক শিখ বন্ধুর কাছে শুনলাম এবং এঁদের জীবন ধারার বর্তমান পটভূমিকায় এটা সমীচীন ব'লেই মনে হ'লো। মানবজীবনে নতুনের সংস্পর্শ এসে এই ধরনের উগ্রতা অনেকস্থানে দেখা গেছে সত্যি—কিন্তু গণআন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাঁরা, তাঁদের এ ধরনের র‍্যাডিকালিজ্‌ম্‌ মানায় না-আর মানাতে কেউ পারেও না। সাহিত্যের মধ্যে আমাদের দেশে এরকম প্রচেষ্টা এক সময় অনুকরণীয় বলে মনে হতো। ইওরোপীয়ান মানুষকে আমরা আমাদের বলে চালাতে চেষ্টা ক'রেছিলাম কিন্তু, আমাদের মাটিতে যে পুরণো-সোঁদা গন্ধ নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিলো, নতুনের মোহে আমরা সেটা ভুলেই যাই। শিখ কর্মীদের গণমুখী-চেতনার মত আমাদের সাহিত্যিকের চেতনাও ধীরে ধীরে সে মোহ কাটিয়ে উঠেছে।

সত্যব্রত লাফিয়ে সাইকেলে উঠে পড়েছে। একে একে আমরা দুজনও উঠলাম—আমি আর আমার মার্দানের বন্ধু রেবতী ঝা। কত শান্ত, অমায়িক, বিনয়ী, হাসিখুশি এই সত্যব্রত—গুরু গোবিন্দের রক্ত হয়তো আজও ওর মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। সত্য সেটা জানে কিনা জানি না, আমি কিন্তু, ওঁর হ্যাণ্ডেলে রাখা হাত, ওঁর সম্মুখে প্রসারিত খর দৃষ্টির মধ্যে গুরুগোবিন্দের উষ্ণ রক্ত ধারার সন্ধান পেলাম।

লাহোর ইউনিভার্সিটির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দূর থেকে এর বিশেষত্ব কিছুই চোখে পড়লো না। কাছে গিয়ে দেখলাম ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। লেবরেটারীতে সত্যবেদীর এক বন্ধু কাজ করতো। তাকে গিয়ে খোঁজ ক'রে পাওয়া গেল না। দেখবার বিশেষ কিছুই নাই। তবু লাহোরে এসে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় না দেখানো ইংলণ্ডের 'ককনী' এবং আমাদের দেশের চলতি কথায় 'বাঙালের' পর্যায়ে পরে তাই, বাইরে থেকে কমপাউণ্ডটা একবার চক্র দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরের একটা ছবি মনের মধ্যে তুলে রওনা দিলাম।

এবার মিউজিয়াম। মিউজিয়ামও তেমনি বিশেষত্বহীন। অবশ্য ঘর-দুয়োর এরও বন্ধ। বাইরে দুটো মান্ধাতার আমলের কামান পড়ে রয়েছে। হাবভাব থেকে কলকাতার মিউজিয়ামের সঙ্গে কোনদিক দিয়েই তুলনীয় মনে হলো না।

মিউজিয়াম শেষ করে আর একটা কলেজের কম্পাউণ্ডে ঢুকলাম। নামটা ঠিক মনে প'ড়ছে না। সম্ভবতঃ এফ, সি, কলেজ, এখানেও ওপ'ন এয়ার থিয়েটার-এর একটা স্টেডিয়াম আছে।

লাহোর হাইকোর্ট বাজার, স্কুল এবং অন্যান্য দর্শনীয় জিনিস দেখে ঘন্টা দুই পরে পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরলাম। কলকাতার সঙ্গে কোন দিক দিয়েই লাহোরের তুলনা হয় না। জাঁক জমকও নেই, অমন সজীবতা বা স্নিগ্ধতাও নেই কেমন যেন রুক্ষ—ধূসরতা লাহোরের গায়ে মাখানো। লোকগুলো কেমন রুক্ষ রুক্ষ। কথা বলে বড় জোরে জোরে ভাষা আর তাগদই বোধ হয় এর কারণ। এখানে বাঙলার সেই দুনিয়া দুর্লভ জন্ গাম্বারের সেই বাঙালী বাবু নেই—হাতে কোঁচা, আঙুলে চুন, তরমুজাকৃতি ভুঁড়ি। এখানকার লোক পায়জামা হাফসার্ট পরে বুক ফুলিয়ে হাঁটে, পেটের চেয়ে বুকের পরিধি এদের ছোট নয়। কথাবার্তার ভাবালুতার কৃত্রিমতার আবরণ

নেই তবু মনে হচ্ছিলো, সেই বাঙালীবাবুর দেশই যেন আজ আবার একান্তভাবে আকর্ষণ করছে। দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, বিশৃঙ্খলা সব একত্র হয়েও আমার সেই শ্যামল মাটির আস্বাদকে তেতো ক'রতে পারে নি। আজ বুঝতে পারছিলাম বাংলাদেশকে সত্যিই ভালবাসি। যদিও লাহোর আমার অপ্রিয় নয় বরং বাংলায় ফিরে গেলে আবার হয়তো লাহোরের কথা মনে পড়বে। বসন্তের উতলা সন্ধ্যায় আবার হয়তো নিরুদ্দিষ্ট মন লাহোরের পথে পথে 'হ্যালো লাসসী' শুনবার জন্য আকুলি বিকুলি করবে। মনে হবে সত্যব্রত বেদীর সঙ্গে লাহোরের কালো রাস্তার যে অপূর্ব মুহূর্তটি একদিন অতিবাহিত করেছি আর কি সে মুহূর্তটি ফিরে আসবে না! চৈতালি গোধূলির বুকে যেদিন রক্ত সন্ধ্যার আগমন জাগবে সেদিন হয়তো মনের মধ্যে ভিড় ক'রে আসবে ভাকনা, অমৃতসর, লাহোর, জাহাঙ্গীরের কবর। লরেন্স গার্ডেন আরও কত কি। সেদিন কি সত্যব্রতকে এমনি ক'রে আর কমলালেবু ছাড়িয়ে দিতে পারবো! পার্টি অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে কমলালেবু খাচ্ছিলাম একজন বললেন, কি, আপনারা কোথায় ছিলেন—এদিকে মিটিং হয়ে গেলো। শহরের গণ্যমান্য লোকেরা এসেছিলেন! আর আপনারা ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! লজ্জিত হলাম তাঁর কথা শুনে। যদিও জানতাম না যে আজ এ ধরনের মিটিং এর আয়োজন হয়েছে। সত্যি বলতে কি—আজকে লাহোর ছেড়ে চলে যাবার আগে একটা মিটিং-এর চেয়ে আমার কাছে লাহোর শহর দেখার মূল্যই যেন বেশি বলে মনে হচ্ছিল। হ'তে পারে এটা দুর্বলতা, এটা ত্রুটি। কিন্তু, দুটোকে পাশাপাশি খাড়া ক'রলে কোনটা সত্যি বেশি জরুরী লাহোরে ব'সে সেদিন সেটা বিচার করার ক্ষমতা ছিলো না। হতে পারে এটাও দুর্বলতা কিন্তু, এ দুর্বলতাকে স্বীকার ক'রে নিতে সেদিন আপত্তি ছিল না। মিটিং এর সুযোগ বহু পেয়েছি আরও পাবো

পড়াশুনা জানার জন্যে যখন তীব্র আকাঙ্খা রয়েছে তখন রাজনৈতিক চেতনা বন্ধ হয়ে থাকবে না সেটাও নিশ্চিত কিন্তু, লাহোরে এসে সীমাবদ্ধ সময়টুকুকে ঘরের মধ্যে কাটাতে হবে এ চিন্তাও অসহ্য।... কে কে এই ট্রেনে দিল্লী যাবেন শীগ্‌গির আসুন সময় নেই। যাওয়ার কথাটা এতক্ষণ মনেই ছিলো না। চট্ ক'রে আমি আর রেবতী উপরে সুটকেস্ আনতে ছুটলাম। সুটকেস্ নিয়ে সোজা নেমে আসলাম ব্যাস। এমন নিরাভরণ এবং হালকা যাত্রার লগ্ন জীবনে কোনদিন আসে নি। লাগেজের জটিলতা নেই অশ্রু ঝরার অবসান নেই শুধুই অপেক্ষমান টাঙায় গিয়ে উঠা। কিন্তু, তবু যেন চোখের অপ্রকাশ্য মনি কোঠায় স্তব্ধ অশ্রুর আবেগ অনুভব করলাম যখন দেখলাম সত্যব্রত বেদী সাইকেলের ওপর ভর দিয়ে করুণ ভাবে হাত নাড়ছে। শুধু সত্যব্রত বেদী নয় মনে হলো যেন সমগ্র পাঞ্জাব আজ তার অমলিন আতিথেয়তা নিয়ে আমাদের বিদায় জানাতে এসেছে। টাঙা চ'লছিলো স্টেশনের পথে—যে পথ প্রাচীন আর নবীন পৃথিবীর মিলনের শঙ্খ ধ্বনিতে মুখর হয়ে আছে।

ফেরার পথ

বাংলার ডেলিগেটদের মধ্যে কেউ থেকে গেলেন। আপাততঃ আমরা দিল্লী পর্যন্ত এক সঙ্গেই চলেছি তারপর, অন্ততঃ আমার পক্ষে, বিদায় নেবার পালা। আমি যাবো ইন্দোরে এক বন্ধুর আমন্ত্রনে।

লাহোর স্টেশানে কি ভিড়। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেল পথের তামাটে গাড়িখানা মানুষের ভিড়ে পাগল হ'য়ে উঠেছে! এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি কোনই ফল নেই। শেষ পর্যন্ত উপায়হীন হ'য়ে একগাদা ভিড়ের মধ্যেই কোন রকমে সুটকেস্ নিয়ে আমি আর রেবতী এক কম্পাটমেন্টে উঠলাম—সে শুধু ওঠাই, বসা আর নয়। বসা তো দূরের কথা পাশের লোকগুলো যদি স্থান সম্বন্ধে চার আঙুল অকৃপণ হয় তো বেঁচে যাই! একই সঙ্গে কারও নিঃশ্বাস ঘাড়ের উপর অনুভব কর'ছি, কারও জুতোর খোঁচা বাংলাদেশের সুজলা পাখানাকে খোঁচা মারছে। মাঝে মাঝেই সেই তাল গোল পাকানো জনতার ভিড়ে তরঙ্গ উঠছে আদিম পৃথিবীর মহা আলোড়নের দিনেও আভাস দিয়েছে কি না সন্দেহ। পৃথিবীর আলোড়ন যেমন তার ভার সাম্যের আভাস দিয়েছে সেদিন, এই জনতা মানুষটি তার ভারসাম্যের চেষ্টা এইভাবে করছিলো। কিন্তু প্রাণ যে অস্থির। এতগুলো লোকের অক্সিজেন সরবরাহ করবার মত বাতাস কোথায়!···অবশেষে মুক্তির মাহেন্দ্রক্ষণটি সত্যিই এসেছে—দিল্লীর স্টেশান আর বড় জোর এক মাইল দূর। সদ্যমুক্ত বন্দীও তার মাতৃভূমির স্পর্শ লাভের জন্য এমন অধীর হয় কিনা সন্দেহ,

সারারাত দুঃস্বপ্নের মত কেটে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমাতে ঝিমাতেই সদ্য অতীতের সুখকর দিনগুলো যেন স্বপ্নভরে অনুভব করছি। লাহোর, অমৃতসর, ভাকনা, সোহন সিং, জেহানিয়া, Hallo Milk, সব যেন খণ্ড খণ্ড ভাবে মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারছিলো। পতাকা উত্তোলনের ধ্বনি যেন বোম্বে এক্সপ্রেসের নৈশ চীৎকারকেও ছাপিয়ে যাচ্ছিলো। সারা ভারতের মুক্তি পিপাসা যেন আমার তৃষ্ণার্ত শুকনো গলায় অনুভব করছিলাম। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিলাম বীর পাঞ্জাবী নরনারী রক্তপতাকা ঘাড়ে নিয়ে এগিয়ে চলেছে—তরঙ্গের পর তরঙ্গ,—তাদের বজ্র কঠিন বুকে বেয়নেট ভোঁতা হয়ে যায়। ব্রেনগানের সাধ্য নাই তার ভেতরে পথ করে নেয়—সোহন সিং এর ভাকনা, ভাকনার পাঞ্জাব, পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মৃতির তীর্থক্ষেত্রে যেন এরা এক অবিনশ্বর, অপরাজেয়, অক্ষয় জীবনের বাণী বহন করছে। মৃত্যু নেই, পরাধীন ভারতের মৃত্যু নেই। যার পুরোভাগে রয়েছে এমন ছাপান্ন ইঞ্চি বুকের প্রাচীর তাকে লঙ্ঘন করার সাধ্য কার? The Punjab is not the lackey of imperialism, it will be sacking the foundation of imperialism itself on. দিল্লীর Distant Signal লাল কাঁচে যেন জালিয়ানওয়ালাবাগের বীর শহীদের রক্ত চিহ্নই দেখতে পেলাম। ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই একটা প্রদেশ পাড়ি দিয়ে এসেছি—দীর্ঘজীবী হোক দিল্লী নগরী। ঝিমানো চোখ তেমন অপূর্ব বিস্ময় নিয়ে আর দেখতে পাচ্ছিলো না—অথচ, বাঁ ধারেই রেড ফোর্টের সুদীর্ঘ প্রাচীর দর্পভরে দাঁড়িয়ে আছে। বিখ্যাত জুম্মা মসজিদের পাশ দিয়েই তো চলেছি। আধজাগা দেহখানাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে পার্টি অফিসে উঠলাম।

আমলাতন্ত্রের প্যারাডাইস

ভূস্বর্গ কাশ্মীর—কিন্তু, কাশ্মীরের অরণ্য হ্রদে আমলাদের রুচি নেই তাই সারা দেশ দেউলে করে আসমানস্পর্দ্ধী হর্ম্যতুলে আমলারা এক নতুন প্যারাডাইস অথবা স্বর্গরাজ্য তৈরি করেছেন এই দিল্লীতে। স্বর্গে যার স্থান নেই ধার্ম্মিক মহলে সে দুর্ভাগা। দিল্লীতে যে আমলা একবারও রাজকীয় খানায় হাজিরা দিতে পারেন নি তিনি ততোধিক দুর্ভাগা। স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের জন্যে নাকি বহুগুণের প্রয়োজন—কিন্তু এ স্বর্গরাজ্যে একটা দস্তুর মত খানাপিনার আয়োজনই যথেষ্ট। দেব কুলের সেই বহুবাঞ্ছিত স্বর্গরাজ্যে বসে বিশ্রাম করছি ভাবতেও সুখ। কিন্তু, সেই রাজ্যে প্রবেশের সঠিক অধিকার ছিলো কিনা সেটা ভেবে দেখি নি।

বিশ্রাম করে বন্ধুবর তারকেশ্বর মৈত্রের (ইনি আজ বেঁচে নেই—এতবড় অকৃত্রিম সুহৃদ হারিয়ে যে ক্ষতি বোধ করেছি তার উল্লেখও বোধ হয় তার মূল্য কমিয়ে দেয়) বাসার দিকে রওনা হ'লাম। এবার বন্ধুদের সঙ্গে বিদায়ের পালা। যাদের সঙ্গে দীর্ঘ কত আয়োজন অনুষ্ঠানে একদিন নিবিড় ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম আজ প্রয়োজনের মুহূর্তে সংক্ষিপ্ত একটু হাসির সঙ্গেই সেই সংযোগ শেষ হয়ে গেলো। চাঁদনী চক কাছেই। জুম্মা মসজিদের ধার দিয়ে হেঁটে যেতে মিনিট দশেক লাগলো। মোড়েই Calcutta National Bank. সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করতেই পাশের ঘর দেখিয়ে দিলো। তারক বলে ডাকতেই দরজা খুলে গেলো—সে এসে জড়িয়ে ধরলো

তার প্রাণের সব উত্তাপটুকু যেন সে উজার করে দিলো—সে উত্তাপ অনুভব করার মত। তারক বললে কি এত দেরি হয়ে গেলো যে—আপনার তো অনেক আগেই আসার কথা।

বললাম একটু ঘুরাফিরা করায় দেরি হয়ে গেছে দু তিন দিন।

সে বললো, আর দেরি না, আপনি বিশ্রাম করুন আমি চট করে স্নান করে আসি আপনাকেও এক্ষুনি স্নান করতে হবে। অফিসের বেলা প্রায় হ'য়ে এলো।

তারক স্নান করে ফিরে এলে দেখি তার হাতে সদ্য কাচা আমার ময়লা কাপড়খানা।

অপ্রস্তুতভাবে বললাম, করেছো কি তুমি!

নির্বিকারভাবেই উত্তর করলো সে হয়েছে, হয়েছে থাক। যা ময়লা করেছিলেন।

ওর সরল মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে ভাবছিলাম, রাজধানীর জটিলতাও ওর মুখের একটা রেখা বদলাতে পারেনি—ভেতরেবাইরেও তেমনিই আছে। ওর মহত্ব, ওর মানবত্ব ওর অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি এই তো আমার স্বর্গরাজ্য। দিল্লীর ভাইস্‌রয় প্যালেসের চেয়েও সে যে বহু উচ্চ—এ প্যালেসের মধ্যে কি তার নাগাল পায়।

স্নান করে এসে তারকের সঙ্গে খেতে চললাম। জৈন হোটেলে সে খায়। চাঁদনী চক দিয়ে সেই হোটেলে গিয়ে উঠলাম। রান্নার যা শ্রী তাতে বহু চেষ্টা করেও একটু সুশ্রী কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না। তরকারীতে তেল ঘিয়ের গন্ধও নেই। শুধু সিদ্ধ হলেও এর চেও বিশুদ্ধ হ'তে পারতো। কিন্তু রুটির বেলায় ঘী দেখলাম উদার। রুটিতে ঘী মাখিয়ে নির্বিকারভাবে সবাই খেয়ে চলেছে। তারক আমার মুখের দিকে চেয়ে বললো, এই খেয়েই বেঁচে আছি অমল দা।

বললাম, তবু তো বেঁচে আছো—কিন্তু বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ লোক যে

এভাবে বাঁচতে পারলে ধন্য মনে করতো! (বাংলায় তখন পুরোদমে হাহাকার চলেছে)।

নিঃশ্বাস ফেলে সে উত্তর করলো, তা ঠিকই। দুবেলা খাবার অধিকার আমাদের এখানে অন্ততঃ আছে!

খেয়ে দেয়ে এসে সটান শুয়ে পড়লাম। তারক বিছানা-পত্র সব ঠিকঠাক ক'রে দিলো—বাড়ির মেয়েদের মতই যত্ন ক'রে। কার ডাকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো—চেয়ে দেখি ব্যাঙ্কের পিওন—এক হাতে মাটির এক গ্লাস লাস্‌সী আর এক হাতে কয়েকখানা বিস্কুট। এর পেছনে তারকের অদৃশ্য প্রীতির সন্ধান পেলাম—বিদেশে এর মূল্য যে কত তা বোঝা যায় না।

বিকেলে তারক এলো—এলো অবশ্য পাশের ঘর থেকেই। ওদের ব্যাঙ্কএর অফিস সেটাই কিনা। আজ আর কোন কিছু দেখা নয়—শুধু আসেপাশে খানিকটা ঘোরা—অনির্দিষ্টভাবেই। আমরা পুরনো দিল্লীতে আছি—তাই, এখানকার সব কিছুতেই পুরনো যুগের গন্ধ। এর এক পাশে বিরাট লাল দুর্গ (রেড ফোর্ট) আর এক পাশে প্রকাশ্য জুম্মা মসজিদ—এরও রং অবশ্য লাল—এটাও বাদশাহদেরই তৈরি। পুরনো স্মৃতিতে ভরপুর। জুম্মার পাশ দিয়েই ট্রাম যায়—সে-ও যেন সে যুগের—নিতান্তই মামুলী একখানা করে Compartment, হলদে পাটকেলি রংএর। নেহাৎই বাজে—কলকাতার নতুন ধরনের ট্রামগাড়ির কাছে এটা রেড ফোর্টের মতই পুরনো এবং প্রাণহীন। বাড়িগুলো কেমন গাদাগাদি—পার্কটার্ক বিশেষ কোথাও চোখে পড়ে না। বাড়ি ঘর-দুয়োরেও আধুনিকতার বিশেষ চিহ্ন চোখে পড়লো না। তবু পুরনো দিল্লীই যেন প্রধান আকর্ষনীয় স্থান—কেননা, এখানে রেড ফোর্ট আছে—আর মণিকোঠায় হারানো যুগের সন্ধান রয়েছে। যে যুগ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে পুরনো দিল্লী তাকে বন্দী করেই বিজয়ী।

তাই, তার জয়ের চিহ্ন দেখবার জন্যে মনের মধ্যে বেশ চঞ্চলতা অনুভব করছিলাম। কিন্তু আজ দেখার সময় পার হয়ে গেছে। আজকের দিনটি বিশ্রামের দিন। সন্ধ্যার দিকে আবার সেই হোটেলে হানা দেওয়া গেলো। গিয়ে দেখি, আমাদের চারদিকেই টেবিল ঘিরে টুং-টাং নানা শব্দ এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। খানার Formটা দস্তরমত সাহেবী কিন্তু, Content যা তার আভাস তো আগেই দিয়েছি। একটা বিশেষ অবস্থায় এসে এখানকার রান্নাব বিষয়বস্তুগুলো থেকে নাকে মসলা বা তেলের সঙ্গে তার পূর্ণ সহযোগিতার পরিণত সুযোগ তারা পায় না। তাই, অবিকৃত সাদা আলুর টুকরোগুলো জলে ভাসে—ভাকনার মত ডাল আর তরকারীর বিশেষ কোন প্রভেদ এখানেও নাই। তবে, ঠাকুরের হাসিটি অমায়িক। সামনে ওই বাটির ঝোলের মতই মসলার কোন ভেজাল তাতে নাই।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাকনার গল্প সব তারককে বললাম। তারপর কালকের Programmo ঠিক করা হলো। কাল শনিবার। ব্যাঙ্কের সকাল সকাল ছুটি। ঠিক হলো কাল শুধু Red Fort দেখা হবে। পরশু কুতবমিনার, নিউ দিল্লী প্রভৃতি অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলো ঘোরা যাবে।

ঘুম আসছিলো না। শুয়ে শুয়ে যেন ঐতিহাসিক দিল্লী নগরীর করুণ বিলাপ শুনতে পেলাম। এই দিল্লীরই রাজপথে আওরঙ্গজেব তাঁর পরাজিত বড় ভাই দারাসিকোহকে ভিখারীর বেশে হাতীতে চড়িয়ে ঘুরিয়ে বেড়িয়েছেন একদিন। দারার করুণ বিলাপ যেন নিশীথ নগরীর অদৃশ্য শূন্যে পাক খেয়ে ফিরছে। আকাশের ওই উজ্বল তারাটি কি সেদিন সূর্যালোকের আড়ালে বসে এক হতভাগা রাজপুত্রের জীবন-অভিনয় লক্ষ্য ক'রেছে!···এই দিল্লী নগরীর পথে পথেই একদিন নাদির শাহের হত্যা-উল্লাস নৃত্য ক'রে বেড়িয়েছে। নাদির শাহ্ আজ

কোথায়? কোন্ ঊষর মাটির দেশে তিনি শুধু হয়তো কতকগুলো নিঃসঙ্গ মাটির কণায় পরিণত হ'য়ে আছেন। ইতিহাস তাঁদের আজ আর গ্রাহ্যই করে না! বাবর, হুমায়ুন, শেরসাহ—কত অগুনতি বাদসাহ এই দিল্লীর বুকে রাজত্ব ক'রে গেছেন। রাতে দিল্লীর কোলাহল ক্রমে থেমে আসছে। ঘুমন্ত দিল্লীর বুকে পুরনো দিল্লী মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। চোখের পাতা ভারী হ'য়ে আসছে এবার নিঃশব্দ অতল ঘুমের দেশে তলিয়ে যাওয়া।

ভোরে উঠে খানিকটা বেড়িয়ে আসা গেলো। আজও সেই জৈন-হোটেলের মেম্বার হওয়া গেলো। কাল থেকে অন্য বন্দোবস্ত। একই নিয়মে, একই ধারায় দিনের পর দিন একই সঙ্গে বহু লোকে খেয়ে চ'লেছে। কারও সঙ্গে কারও সম্পর্ক নাই। বড় জোর মুখ ধোবার পর রুমালে হাত মুছতে মুছতে একটু মৃদু হেসে কাউকে জিজ্ঞেস করা—"কেমন আছেন?"—অবশ্য দৈবক্রমে পরিচিত হ'য়ে যাওয়া কাউকে। যার যার লক্ষ্যে (অবশ্য লক্ষ্য ব'লতে কিছু আছে কিনা সন্দেহ—এখানে লক্ষ্য হ'চ্ছে উপলক্ষ্য মাত্র) স্বতন্ত্রভাবে, আপন আপন একাকীত্বের মধ্যে জীবনের সীমাবদ্ধ আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির চেষ্টা। জীবনের এই বহু বিচিত্র রূপের মধ্যে একটা মহান্ অখণ্ডতার আভাস নেই। স্বতন্ত্র অথচ এক সমগ্র জীবনের ব্যঞ্জনা এখানে নাই। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার এই কপাটবদ্ধ জীবনের লক্ষ আড়ালের মাঝে বাস করতে করতে এদের জীবনের পূর্ণিমা রাত্রি দেউলে হয়ে গেছে—শুধু চুপিসারে পড়ে আছে অন্ধ অমানিশার দৃষ্টিহীন হৃদয়াবেগ—আলো আরও আলো! কিন্তু, সেই অদৃশ্য আলোর ঝরণা আমলাতান্ত্রিক দিল্লীর প্রাসাদ-শিখরে অবমানিত হয়ে ফিরে ফিরে যায়। দিল্লীর প্রাসাদোপম অট্টালিকায় অঙ্ক বসিয়ে যাওয়া এদের কাজ। অঙ্কময় এদের জীবন। জীবনের অলক্ষ্য পথে প্রেম যদিও বা কখনও আসে—অঙ্কের হিসাব নিয়ে আসে হিসাব নিয়েই

ফিরে যায়। এই হিসাবনবিশী ত্রিশঙ্কু-মধ্যবিত্ত আকবর আওরঙ্গজেবের সময় এরা ছিলো না, তবু এরা ছিলো। উজীরী, আমীরীর উত্তানোন্মুখ জীবনের অস্তিত্ব চিরকালই ছিলো কিন্তু এমন রূপে নয়। এমন গুণেও নয়। রূপ আর গুণে এরা জন গান্থারের বর্ণিত সেই বাঙালী বাবুরই সগোত্র। তফাৎ শুধু কোঁচার—পায়জামা, মাসল আর মেদে, ভুঁড়িতে আর উদরে।...তারক ঘীয়ের বাটীটা রুটির ওপর ঢেলে দিলো—বললো খাবেন কি তা না হলে!

খাবো আর কি। খাবার সত্যিই কিছু ছিলো না। বাংলার সুকৃতনী চচ্চড়ী, মুড়িঘণ্টর সঙ্গে পরিচিত যারা তাদের পক্ষে সত্যিই খাবার কিছু ছিলো না। চেষ্টা করেও মানুষ এত খারাপ রাঁধতে পারে—বাংলার রন্ধনের ঐতিহ্য সেকথা স্বীকার করে উঠতে পারে না। ঘরে ফিরেই ঠাকুর কবজী নাড়িয়ে নাড়িয়ে সবজীর যাচাই করছে। বুঝলাম সবজীটা বোধ হয় আজ কিছু সস্তা মিলেছে।...

একা শুয়ে আছি। হঠাৎ তারক ঢুকে বললো, চুনীবাবু ডাকছেন আপনাকে চলুন। চুনীবাবু যে এখানে আছেন তারক সেকথা আগেই বলেছিলো। চুনী বাবুর সঙ্গে পরিচয় হিজলী জেলে। দশ নম্বর ব্লকে একই সঙ্গে থাকতাম আমরা। মাদারীপুরে বাড়ী। পূর্ণদাসের শিষ্য তখন। অন্যান্য অনেকের চেয়ে এঁর সঙ্গেই অন্তরঙ্গতা জমেছিলো বেশি। সেটা এঁরই সরলতা অকপটতা প্রভৃতি গুণে। মনে পড়লো I. A. পরীক্ষার ফলাফল জানবার জন্য জেলের বন্ধন যখন অসহ্য হয়ে উঠেছে এমনি একদিন চুনী বাবু দৌড়তে দৌড়তে পাশের খবর নিয়ে এলেন। আজ এই মুহূর্তে ঠিক সেই মুহূর্তটির কথা হঠাৎ মনে হ'লো কেন জানি না।

জামা গায়ে দিয়ে গেলাম। দেখি চুনীবাবু তাঁর স্বতন্ত্র কামরায় বসে আছেন। আজকাল আর হিজলী জেলের সেই কোর্তা জামাপরা

সদা অশান্ত সেই চুনী নন। দেখি স্যুট হ্যাট ধারী পরিমার্জিত চেহারার এক যুবক চেয়ারে বসে আছেন। বহুদিন পরে দেখা। উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে সম্বর্ধনা জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ানকে দু'গ্লাস লাসসীর অর্ডার হলো। তারপর শুরু হলো গল্প। এতদিনের তাঁর বিচিত্র জীবন। কোথায় সিঙ্গাপুর কোথায় রেঙ্গুন নাকি সব ঘুরে এসেছেন। কি একটা Insurance পরীক্ষায় নাকি ফার্ষ্ট হয়েছেন। আজ এক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজার তিনি। Insurance এর জন্যে কত বড় বড় লোকের বাড়ি যেতে হয় প্রসঙ্গক্রমে সেসবও উল্লেখ করলেন। আজই নাকি India Government এর Home Secretaryর কাছ থেকে মোটা একটা Case এর প্রতিশ্রুতি আদায় করে এসেছেন। আজব জায়গা দিল্লী। সেই আজবের ছোঁয়াচ চুনী বাবুর গায়েও লেগেছে হয়তো।...চুনীবাবু অনর্গল কথা বলছেন। লাসসীর গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তাঁর কথাগুলো হঠাৎ যেন রকেটের গতিতে ছুটতে লাগলো। অত কথায় আমি চিরকালই ভয় পাই। তবে লাসসীর ভরসা ছিলো খানিকটা।

শেষের দিকে বললেন, কাল থেকে আমার মেসে আপনাদের দু'বন্ধুর (এর মধ্যে রেবতীও আমার এখানে এসে উঠেছে। পার্টি অফিসে ওর ভাল লাগে নি) খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এ দুটো দিন আপনাদের খুব কষ্ট হয়েছে তা বুঝেছি—তারকবাবুর হোটেল তো! আমার বেশ জানা আছে।

অফিস সকাল সকাল ছুটি হলো। তারকের সঙ্গে লাল কেল্লার উদ্দেশ্য বের হওয়া গেল। কাছেই লাল কেল্লা, এ দুদিন বাইরে থেকেই তাকে দেখেছি। এবার ভেতরে ঢোকার পালা। তারকের এক বন্ধু (বাঙালী এবং বাঙাল অর্থাৎ ইষ্ট বেঙ্গলের) ফোর্টে কাজ করতেন। তিনি আমাদের সঙ্গে চললেন। ফোর্টে কাজ করতে করতে তাঁর জীবন যে

দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে তাঁর মিলিটারী পোশাকের Smartness সে কথা চেপে রেখেছে।

যাক ফোর্টে তো ঢোকা গেলো। বিশাল ফোর্ট। শাজাহানের তৈরি দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস দেখলাম। দেওয়ানী আম হচ্ছে বাদশাহরা যেখানে সাধারণ লোকদের নিয়ে সভা করতেন—আম মানে—Public (প্রকাশ্য)। দেওয়ানী খাস বাদশাহাদের খাস মহলের অন্তর্গত—যেখানে বাচাই করা, পেয়ারের দলের প্রবেশাধিকার ছিলো। দেওয়ানী খাসে (সম্ভবত) দেখলাম একটা ঘরে বালি বোঝাই বস্তা রয়েছে—বোমার বিরুদ্ধে হুঁসিয়ারী হিসেবে। অবশ্য, দিল্লীতে তখন বোমা ফেলবে কে তার কোন হদিস ছিলো না। বাদশাহদের পুরনো ফোর্টেও আজ আধুনিক যুদ্ধের ছোঁয়াচ লেগেছে—একেই বলে সামগ্রিক যুদ্ধ। তারক রহস্য করে তার বন্ধুকে বললেন'—বাদশাহী আমলের ধুলো—একটু কুড়িয়ে নাও হে। বাদশাহ যদি হতে পারো!

বন্ধু হতাশভাবে বলল, রক্ষে করো বাবা, বাদশাহ হবার অভিলাষ নাই—আপাততঃ। এই ফোর্টের বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পেলেই বলে বাঁচি!

দেওয়ানী খাসটাই ভালো লাগলো। বাদশাহের একটু বেশি নিজস্ব বলে হয়তো এর সৌষ্ঠবটুকুও বেশি।

ঘুরতে ঘুরতে ফোর্টের এক প্রান্তে গিয়ে পড়লাম। সামনেই যমুনার বালুকাময় চর। যমুনা আজকাল অনেকটা সরে গেছে। আগে নাকি ফোর্টের প্রাচীরের মধ্যে পর্যন্ত যমুনার জল ঢুকতো। একখানে গিয়ে তারক দেখালো, নিচে ওই জায়গাটায় হাতির লড়াই হতো—আর, এইখানে দেওয়ালে জালের মত ফুটো দিয়ে বেগমরা সেটা দেখতেন। যমুনার বালুচরের বাবলা গাছের সারি উদাসী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন বাদসাহের জীবন-পরিণতির উদাসী স্বাক্ষর তাদের গায়ে গায়ে। কত হতভাগী বেগমের জীবনের মর্মস্থলে হয়তো ওমনি ধুধু করা বালুচরের

রিক্ত আর্তনাদ আসন গেড়ে রেখেছিলো। বাদশাহী লালসার আসনে কত যৌবন ব্যর্থতায় ঝরে গেছে হয়তো ভাষা থাকলে বালুচর সে কথা শুনাতে পারতো।

তারক একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে একটা চৌবাচ্চা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, বলুন তো এখানে কি হতো? সেই চৌবাচ্চার সঙ্গে লাগানো মস্ত একটা বাঁধানো ড্রেন যমুনার দিকে চলে গেছে। আন্দাজে বললাম বেগমরা হয়তো স্নান করতো এখানে ঠিক না?

সে বললো, হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন। বেগমদের স্নানের জায়গা ছিল এটা। আধুনিক ধরনের Bathroom সে সময়ে না থাকলেও বেগমদের স্নানের ব্যবস্থা খুব খারাপ ছিলো না। অবশ্য বাদশাহী যুগের অনেক আগে মহেঞ্জো দঁড়োতেও Bathroom এর ব্যবস্থা ছিলো ঐতিহাসিকরা অন্ততঃ তার নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন।

মাঝে মাঝে একটা হেঁয়ালী ধরনের কথা কিন্তু মনে কেন যেন আপনিই উঁকি ঝুঁকি মারছিলো। যেখানে একদিন বাদশাহ বেগম ওমরাহ, সিপাহী সান্ত্রীতে গম্ গম্ করতো যে জায়গা দেখবার জন্য পৃথিবীর কত দেশের লোকের পায়ের ছাপ পড়েছে—যে জায়গায় একদিন কত উৎসব, হয়তো কত হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত ঘটে গেছে এবং যে জায়গায় অবাধে চলাফেরার অধিকার এমনকি বেগম সাহেবাদের পর্যন্ত ছিলো না সেখানে সেই সুদূর বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার এক নগণ্য গ্রামের অমল সান্যাল তার বন্ধুদের সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছি—সেখানে আর কেউ নেই শুধুই আমরা তিনজন দৃশ্যতঃ—আর অদৃশ্যতঃ কত ঐতিহাসিক ঘটনার পাদপীঠ। ভাবতেও যেন কেমন লাগছিলো শাহাজাদীদের কৃপাকটাক্ষের জন্যে হয়তো কত হতভাগা এখানে আনাগোনা করেছে! সেই দেব দুর্লভ স্থানটিতে আজ শুধুই আমি আর তারকেশ্বর মৈত্র আর তার বন্ধু। বাদশাহজাদীরা যদি সেদিন

জানতেন তাঁদের মূল্যবান হারেম এমন সব ওঁছা মানুষের পায়ের ছাপে কলঙ্কিত হয়ে উঠবে তাহ'লে কি শাস্তির ব্যবস্থা করে যেতেন কে জানে—অবশ্য সুলভ গর্দানের কৃপায় তাঁদের শাস্তির কথা ভাবতে হতো না ঠিকই। কিন্তু, আমাদের মত ওঁছা লোকরাই যে আজ রাজা বাদশাহদের গণ্ডী অতিক্রম করে ফেলেছে, মহাকালের অদৃশ্য জগতে রাশিয়ার জার, অষ্ট্রীয়ার হাপসবুর্গ বংশীয় সম্রাট, ফ্রান্সের ষোড়শ লুই হয়তো সে কথা তাঁদের বলতে পারতেন যদি সে ক্ষমতা সত্যিই তাঁদের থাকতো আর স্বর্গ আর নরক নামক ইন্দ্রিয়াতীত জগতে তাঁরা একসঙ্গে থাকবার অধিকারী হতেন।

তারক এগিয়ে এসে বললো, এবার আপনাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবো যে জায়গাটা দেখে আপনি একটু অবাকই হবেন। তারকের পেছন পেছন আমরা চললাম। একজায়গায় একটা শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো সামান্য কিছু উঁচু বেদীর মত জায়গায় এসে সে থামলো (লিখবার সময় জায়গাটা খুব স্পষ্ট করে মনে পড়ছে না) আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, আচ্ছা আন্দাজ করুন তো এখানে কী ছিলো।

আন্দাজ আর কী করবো রাজা বাদশাহদের ব্যাপার কি আর আমাদের মত প্রাকৃত জনের পক্ষে আন্দাজ করার ব্যাপার! আমার আন্দাজ মত বড় জোর এখানে বাদশাহের গুরুজী এসে বসতেন নয়তো কোন সঙ্গীতকার এখানে তানপুরার রাগিনী ধরতেন, নয়তো মদের প্রকাণ্ড জালা থাকতো যার মধ্যেকার ভর্তি মদের মাঝখানায় ফুল পাইপ দিয়ে টেনে নেবার প্রতিযোগিতা চলতো কিংবা কোন নিঃশেষিত যৌবনা হতভাগা বেগমের গর্দান নেওয়া হয়ে থাকবে। এখানে বাদশাহের সম্বন্ধে এর চেয়ে উঁচু কল্পনা আমার সাধ্যাতীত।

তারক বললো, পারলেন না আন্দাজ করতে? এখানে থাকতো শাজাহানের সেই বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন।

ময়ূর সিংহাসন! তাই নাকি। মনে পড়লো নাদির শাহ দিল্লী থেকে ময়ূর সিংহাসন আর কোহিনূর লুটে নিয়ে গিয়েছিলেন পারস্যে। কল্পনায় দেখিতে পেলাম, "৬ ফিট দীঘ ও ৪ ফুট প্রস্থ আগাগোড়া পেটানো সোনার তৈরি একখানা সিংহাসন—হীরার চন্দ্রাতপ মরকত মণি খচিত বারোটা স্তম্ভের উপর স্তম্ভিত। প্রত্যেক স্তম্ভের মাথায় হীরামণি মাণিক্যের একজোড়া ময়ূর মুখোমুখী বসানো, ময়ূর দুটির মাঝে মাঝে মণিমুক্তোর একটা গাছ দেখলে মনে হতো ময়ূর দুটো পেখম মেলে সেই গাছের মুক্তোফল খাচ্ছে"। সেই ময়ূর সিংহাসন এখানে ছিলো আর তারই সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

শিল্প চাতুর্যের দিক দিয়ে তাজমহলের মতই ময়ূর সিংহাসন লোকের মুখে মুখে অমর হয়ে আছে। কিন্তু শিল্প রসিক বাদশাহের শিল্প খেয়াল মেটাতে যে লক্ষ লক্ষ হতভাগার জীবন শীতের আকাশের মত শূন্য হয়ে গেছে তাদের কথা কিন্তু লোকে ভুলে গেছে। অথচ তারাই এই শিল্পকলা থেকে আরম্ভ করে মানুষের মহান যত কিছুর অমর উপাদান। তারাই আজ নেপথ্যে আর তাদের রক্তের স্রোতে যিনি তাঁর বিলাসী আসন তৈরি করলেন তিনি আজ অমর। তাঁর প্রেম নাকি অমর্ত্য লোকের। আসলে এর পেছনে রয়েছে সে যুগের লোকের যুগমোহান্ধ দৃষ্টি। রাজা বাদশাহদের আড়ম্বর জাকজমক তাঁদের শোষণ মূলক কীর্তিকলাপকে ঢেকে রাখবার প্রধান অবলম্বন ছিলো। বৃত্তিভোগী ঐতিহাসিকরা স্বভাবতই তাদের এই কীর্তিকলাপের তারিফ করেছেন! জীবন জিজ্ঞাসায় অপারগ শোষিত জনসাধারণও এই জমকের ফাঁকি ধরতে না পেরে আমীর ওমরাহদের সঙ্গে এই সব আড়ম্বরেরই তারিফ করেছে—স্তুতিকারকদের সুরে সুর মিলিয়ে এরা এদের নিজেদের জীবনকেই ব্যঙ্গ করেছে আর সুরেলা জীবনের শীর্ষদেশ থেকে খেয়ালী বাদশাহরা জনগণের মধ্যে কৃপা বারি সিঞ্চন

করেছেন, যে বারির মালিক ছিলো এরাই। ফ্রান্সের লুই দি সিকস্‌-টিন্‌থ এর সিংহাসন যে দিন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেলো সেদিন মানুষের চোখের ওপর থেকে একটা পর্দা সরে গেছে (আর একটা পর্দা সরে যাবার প্রতীক্ষায় আছে)। মানুষের মোহ তার আজন্ম সংস্কার দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা বিশ্বাস সেদিন একটা প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অনুকম্পায় আমাদের দেশের রাজা মহারাজাদের আসন আজও খানিকটা অটুট আছে—তবে তাতেও বিস্ফোরণের কম্পন লেগেছে—আগামী কালের বুকে সে সিংহাসন হয়ে উঠবে বিস্মৃবিন্যাসের পক্ষেই। ওই শ্বেত পাথরের বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিলো, ময়ূর সিংহাসন শুধু শাহাজানেরই ছিলো না। ফ্রান্সের লুই, রাশিয়ার জার, জার্মানীর কাইজারদেরও এরকম ময়ূর সিংহাসন ছিলো। ওই রিক্ত বেদীর শূন্যতা আজ তাদের সিংহাসনের স্থান অধিকার করেছে। ময়ূর সিংহাসনের ময়ূর উড়ে গেছে—শূন্য সিংহাসন কোন্‌ লোনা-ধরা দেওয়ালের পদপ্রান্তে প'ড়ে আছে হয়তো আজ—নয়তো কাল থাকবে।

দিল্লীর মাটিতে লু-এর অগ্নিস্পর্শ লেগেছে। আকাশে তারই ছোঁয়া যেন অগ্নিতে নেবুলার আবরণে আকাশ ঝাপসা হ'য়ে আছে, দেখতে ভয়াল। পাঞ্জাব থেকে আসতে এই লু এরই ভয় করেছি। বাংলা থেকে রওনা দেবার সময়ও বন্ধুরা এই লু-এর আতঙ্ক দেখিয়েছেন। বাস্তবিক লু যে কি মারাত্মক তা আজকের দুপুরেই কিছুটা বুঝেছি। লোহা গলালে প্রচণ্ড গরম হয় শুনেছি কিন্তু এর চেয়েও কি গরম? এই গরম হাওয়ায় ময়ূর সিংহাসন কখন্‌ মন থেকে উড়ে গেছে ঠিকও পাইনি। এই অসহ্য তাপকে উপেক্ষা করেই দেখি দলে দলে লোক বাদশাহ্‌দের কীর্তি দেখবার জন্যে আসছে। রঙীন জামা কাপড় পড়ে তারা দিব্বি নির্বিকার ভাবে হাসি গল্প করতে ক'রতে চলেছে।

আমরা ততক্ষণে নির্বাক হ'য়ে উঠেছি। তবু দেখতে হবে কেননা, সুযোগ নাকি জীবনে অল্পই আসে। দেখার নেশায় স্বেন হেডিন্ মৃত্যু হিম তিব্বত পাড়ি দিয়েছেন; তার চেয়ে বহুলাংশে নগণ্য হ'লেও দেখার নেশায় এই লোহা গলানো দিল্লীর উত্তাপকে ডিঙিয়ে যেতে হবে।
এবার ওয়ার মিউজিয়ম দেখার পালা। ফোর্ট এর এক প্রান্তে একখানা দালানে বিভিন্ন যুগের যুদ্ধাস্ত্র সাজিয়ে রাখা হয়েচে। পুরনো যুগের ধনুর্বান থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক যুগের ব্রেণ গান পর্যন্ত সবই আছে। তাতে বোঝার চেয়ে না বোঝার অস্ত্রই বেশি। তারও আবার অনেক কিছুই এই লেখার সময় মনে পড়ছে না। আর, অসহ্য গরম আর ঘোরাফেরার ক্লান্তিতে যা দেখেছিলাম তা শুধু চোখ দিয়েই দেখেছিলাম মস্তিষ্ক দিয়ে দেখি নি আর শিল্পীর দেখায় চোখের চেয়ে ব্রেন এর দায়িত্বই বেশি। মাইকেল এঞ্জেলো বলেছিলেন One paints with the head, not with the hand কথাটা অদ্ভুত মনে হ'লেও সত্যি। ব্রেন বিপর্যস্ত Brawn বিপদগ্রস্ত কাঁহাতক দিল্লীর রোমান্টিসিজম আর টিকে থাকে। কমলালেবুর কোয়া চুষতে চুষতে নেমে এলাম পথে। বাইরে বেরিয়ে একটা ছায়ামত জায়গায় ক্লান্ত দেহখানাকে এলিয়ে দিলাম। বাতাস আসছিলো কিন্তু, এ বাংলার বাতাস নয়। তাতে জলের চেয়ে আগুনের অংশই বেশি জলের অংশ না-ই ব'ললেই চলে।
ব'সে ব'সে গল্প করছিলাম। সামনে তাকিয়ে দেখি বাংলার সেই সব ডেলিগেট বন্ধুরা চলেছেন। পৃথক জায়গায় থাকলেও লক্ষ্য আমাদের এখনও একই। তাঁরাও রেড ফোর্ট দেখতে এসেছেন। কাল তাঁরা বাংলা মুখে রওনা দেবেন। বাংলার অবস্থা ক্রমেই যে রকম চরমে উঠছে তাতে তাঁদের অবিলম্বে পৌঁছানো দরকার।
বিশ্রাম শেষ হ'লে যমুনা ব্রীজের দিকে চ'লতে লাগলাম। পাশেই

রেড ফোর্টের প্রাচীর—যেমনতর এর আগে লাহোরে রঞ্জিৎ সিং এর ফোর্টে দেখেছিলাম। এর রংটা শুধু লাল তাই, নাম হয়তো রেড ফোর্ট। ফোর্ট ছাড়িয়ে কিছুদূর গেলে যমুনার ব্রীজ। সামনেই যমুনা—জলের চেয়ে বালুর পরিমাণই বেশি। ওপারে রুক্ষ রুক্ষ বাবলা গাছের সারি অস্ত সূর্যের শেষ আভায় রঙীন হ'য়ে উঠেছে। সেই আলোয় মিশে বালুর চর হয়ে উঠেছে গৈরিক। দুই একটা বালুর কণা সূর্যের আলোয় চিক্ চিক্ ক'রে জ্বলছে। যমুনা ব্রীজের উপর দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে। ব্রীজের নিচে মানুষজন মোটর চলাচলের পথ (অবশ্য স্মৃতি যদি আমাকে ফাঁকি না দিয়ে থাকে)। ব্রীজের মাঝখান পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। উপর দিয়ে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলে যাচ্ছে—এঞ্জিনের Pistonএ যেন আওয়াজ উঠছে :

"This piston's infinite recurrence is
Night morning night and morning night and
Death and birth and death and birth and this
Crank climbs (blind Sisyphus) and see

steel teeth greet
bow deliberate
delicately lace
in lethal kiss—"

Piston যেন বলতে চায়—"U.S.S.R."

men are at a par
No race, no bar
U.S.S.R.

মানুষের মুক্তির জয়গান করতে করতে ইঞ্জিন ছুটেছে—অভাবের হাত থেকে মুক্তি, সময়ের দাসত্ব থেকে মুক্তি, অজ্ঞতার দাসত্ব থেকে

মুক্তি, মর্মপন্থীতার শেকল থেকে মুক্তি। আকাশের গায়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘুরছে, সেই কুণ্ডলীর মাঝ থেকে সূর্য হঠাৎ খসে পড়লো। আর সূর্য নেই কাল সকালের আগে আর তাকে কেউ দেখতে পাবে না—কোটী টাকার বিনিময়েও না। এও একধরনের বিস্ময়।

দিল্লীর প্রান্তরে উটের সারি জেগে উঠেছে। বাংলার প্রান্তরের মত দিল্লীর প্রান্তরের কোন সুনীল সীমান্তরেখা নাই। যেন কেমন অস্পষ্ট—কুয়াসা আঁকা দিগন্তরে এই প্রান্তর গিয়ে মিশেছে—কোথাও তার সুস্পষ্ট কোন হদিস্ নেই। কবি বাবর তাঁর প্রিয় স্বদেশ ফরগনার জন্য পাগল হয়ে হয়তো এখানে বসেই লিখেছিলেন—"The violets are lovely in Feraghna. It is a mass of tulips and roses."

বড়ই ক্লান্ত লাগছিলো। কারাগার থেকে ইনহেরিট করা ব্যাধি আর আধির তাড়নায় আমার জীবনের আকাশ যেন ওই দিল্লীর প্রান্তরের মতই ক্লান্ত এবং উদাসী হ'য়ে উঠেছে। "One paints with the head not with the hand"—মাথাদিয়েই আমি পশ্চিম আকাশে চিত্র আঁকছি—কিন্তু সে অবসাদ আর শ্রান্তির চিত্র। শরীরে আর মনে এতই শ্রান্তি জমেছে আজ যে বাংলার ওই মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষও আমাকে আর টানতে পারছে না। কিন্তু, দিল্লীর প্রান্তর ছেয়ে আবার তরুণ সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়বে—সে আলো যে আমার জীবনেও আবার দোলা দিয়ে যাবে সেটা ভুলি কি ক'রে। মেরুদেশে দীর্ঘ শীতের রাতকে পাড়ি দিয়েও তো সূর্য আসে। বরফে ছাওয়া রুষ প্রান্তরেও তো দক্ষিণের বাতাস জীবনের উত্তাপ দিয়ে যায়। সংগ্রামেই জীবন, জীবনভোরই সংগ্রাম—বিশেষ ক'রে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ধাপে। এ শতাব্দীতে বিশ্রাম নেই, কোন শতাব্দীতে অবশ্য ছিলো না, তবু ছিলো—"It is clear that the 20th century is the most disturbed century within the memory of humanity. Any con-

'temporary of ours who wants peace and comfort before anything else has chosen a bad time to be born." বিশ্রাম নেই, বিশুদ্ধ বিশ্রামের অবসর এ শতাব্দীতে নেই। তাই, "I will not rest." দিল্লীর প্রান্তরে জোনাকীর ঝিকিমিকি আলোয়, নক্ষত্রের রূপালী আভায়, প্রভাতী সূর্যের গোলাপী দ্যুতিতে তো এই অপরাজেয় জীবনেরই বাণী আঁকা হ'য়ে যায়। এই-ই তো জীবন শিল্প।...

সামনেই দিল্লীর শ্মশান। মাঝে মাঝেই সীমানা দেওয়া মরার অধিকার বিস্তৃত হয়ে আছে। কল, কারখানা, জমিতে অধিকাংশ মানুষের অধিকার নেই—কিন্তু, এই সাড়ে চার হাত মাটির অধিকার তাদের আজও কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। মনে পড়লো সেই টলষ্টয়ের গল্প, "মাত্র সাড়ে চার হাত জমি।" বেঁচে থাকার সময় যারা এক হাত জমিকেও নিজের ভাবতে পারেনি; মরে তারা অন্ততঃ সাড়ে চার হাত জমির মালিক হতে পেরেছে। কিন্তু, তবু একচেটিয়া অধিকার নয়। পালা করে অনেক হতভাগাই ওই একই সাড়ে চার হাত জমির মালিক হয়েছে। অবশ্য একচেটিয়া অধিকার নিয়ে জীবনের শেষেও কেউ কেউ এখানে আছেন—এঁরাও তারাই—জীবনের বহু ক্ষেত্রে যাঁদের একচেটিয়া অধিকার ছিলো সেই সৌভাগ্যবানের দল। অর্থাৎ এখানে দেখলাম, স্থানে স্থানে খানিকটা জায়গা ঘিরে এক একটা গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম, অবস্থাপন্ন মৃতদের আত্মীয় স্বজন মৃতদের জন্যে ওই জায়গাটুকুর স্বত্ব কিনে তাদের স্মৃতিকে অক্ষয় করবার জন্যে এক একটা গাছ পুতেছে। ব্যক্তিগত মালিকানার ভূত এখানেও গাছে গাছে চেপে আছে—যেন মনে হয়, সমুদ্রের অতলে গিয়েও এদের সম্পত্তির মোহ থামবে না। Fie upon the octopus of private property! যুদ্ধের আগুন আর ছাই-এ যে এর পরিণতি, এই গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে এর উত্তর পাওয়া যায় না।

শ্মশানক্ষেত্রটি বেশ চমৎকার। চারদিকে ফাঁকা। সামনেই যমুনা। এক সময় এই জায়গাটাও হয়তো যমুনার গর্ভে ছিলো। এই যমুনার পারেই তো প্রেমিকবাঞ্ছিত তাজমহল। তাজমহল আর শ্মশান—যমুনার ছুটি ক্ষেত্রেই স্মৃতির অক্ষয় অবলুপ্তির বেপরোয়া প্রচেষ্টা। শ্মশানে এলে সত্যিই কেমন একটা উদাস ভাব মনে আসে—এর জন্যে কতটা দায়ী এর পারিপার্শ্বিক নির্জনতা এবং কতটা মানুষের করুণ পরিণতির অনুভূতি তা বলা শক্ত। সাময়িক উদাসীনতায় চন্দ্রশেখর তাঁর উদ্ভ্রান্ত প্রেমে এই শ্মশানভূমিকেই একদিন সাম্যবাদের পীঠস্থান বলে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু, দিল্লীর শ্মশানক্ষেত্রে এলে ওই গাছগুলোর দিকে চেয়ে তিনি নিঃসংশয়েই বুঝতে পারতেন, শ্মশানক্ষেত্রেও অধিকারভেদ আছে।...

অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে বাসার দিকে ফেরা গেলো। চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে—তারই ফাঁকে ফাঁকে বিজলীর আলো চিক্ চিক্ করছে। দিল্লীর মাথায় সেই খণ্ড আলোর এক অখণ্ড উজ্জ্বল আবরণ—যেন দিল্লীশ্বরের রাজমুকুট আজও দিল্লীর মাথায় অটুট হয়ে আছে। আছেও তো! অবশ্য ইংলণ্ডেশ্বরই আজ দিল্লীশ্বর। ওই মুকুট টেনে নামানই তো আমাদের সংগ্রামের মর্মকথা। সারা পথ প্রায় ঝিমোতে ঝিমোতে বাসায় ফেরা গেলো। আবার সেই জৈন হোটেল, তারপর বাসায় এসে সে রাত্রের মত বিশ্রাম। রেবতী নিচে শুয়েছে বলে মনটা খুঁৎ খুঁৎ করছিলো—অবশ্য শুয়েছে সে নিজের ইচ্ছায়ই—আর ছোট চৌকিতে আমাদের দুজনের অবস্থা তার চেয়ে আরও শোচনীয়। তবু মনটা খুঁৎ খুঁৎ করছিলো।

আজ থেকে চুণীবাবুর মেসে খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কাল শ্মশান থেকে ফেরার পথে তাঁর মেস্ একবার দেখে এসেছিলাম। আজ হোটেলে যাবার পথে তারক আমাদের সেখানে পৌঁছে দিয়ে গেলো। রেলওয়ে

ওভার ব্রীজ পার হয়ে যখন চুণীবাবুর মেসে পৌঁছলাম, তখনও চুণীবাবু ফেরেন নি। তাঁর রুমে (রুম মানে কাঠের পার্টিশান দেওয়া ছোট্ট একটা জায়গা) গিয়ে বসা গেলো। রাশিকৃত কাপড়-জামা, স্যুট, গেঞ্জী নানা দিকে ছড়িয়ে রয়েছে—(অবশ্য আজকের দিন হলে একার অতগুলো জামা-কাপড় থাকাটা ভারতরক্ষা অর্ডিনান্সে পড়তো সম্ভবতঃ)। এইবার হিজলী জেলের সেই চুণীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেলো—পরিমার্জিত চেহারাওয়ালা চুণীবাবুর মধ্যে যাঁকে আমি খুঁজে পাই নি। বসে থাকতে থাকতে চুণীবাবু এলেন। এলেন অবশ্য ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে—অন্ততঃ তাঁর হাবভাবে তাই বোঝা যাচ্ছিলো। এইবার শুরু হলো জলের স্রোতের মত অবিরাম তাঁর বাক্যস্রোত। কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন —মাসে একশো টাকা ভাড়া দিতে রাজী হয়েও বাড়ি ভাড়া পাচ্ছেন না, অফিসও একটা চাই—আপাততঃ তারকবাবুদের অফিসেই একটা অংশ ভাড়া নিতে হয়েছে, তাতে কত অসুবিধা—আজ ভাল দিনে খেতে এসেছেন—করাচীর ইলিশ মাছ কেনা হয়েছে আজ ইত্যাদি ইত্যাদি সবই আছে তার মধ্যে। তাঁর কথাও থামতে চায় না—আমাদের ক্ষিদেও তেমনি মুখর হয়ে উঠেছে। শেষে অনেক কষ্টে তিনি তো গামছা কাঁধে নিয়ে উঠলেন, বললেন, বসুন আসছি এক্ষুনি (অবশ্য মাদারীপুরী ভাষায়)। পাশের ঘরে মেসের দু'জন সভ্যও অফুরন্ত গল্প করে চলেছে। চারিদিকেই সীমাহীন গল্প-স্রোত—মাঝখানে আমরা শুধু মূক দ্বীপের মত বসে আছি। স্রোতের ধাক্কায় পাড় ভেঙে পড়ার উপক্রম (এক্ষেত্রে পেট জ্বলে যাবার উপক্রম) তবু মুখ খুলবার ক্ষমতা নেই।

অবশেষে চুণীবাবুর সঙ্গে খেতে বসা গেল। খেতে বসেও সেই এক ধরনেরই গল্পের ঝরণার উচ্ছ্বাস। এরই ফাঁকে ফাঁকে খোঁজ নিয়ে জানলাম, মেসের মেম্বর দশ বারো জন—সবাই বাঙালী এবং বাঙাল।

রান্নার পদ্ধতি দেখে তা বেশ বোঝা গেল। অনেকদিন পর দেশের মত রান্না—এখানে বাংলার বিখ্যাত চচ্চরিরও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। শুনলাম, মেসের মেম্বরদের ডাইরেক্‌শনেই এমন রান্না সম্ভব হয়। বহুদিন পর মাছের ঝোলের দর্শনলাভ—তারপর ইলিশ মাছ—তারপরও আবার করাচীর। সুদূর সমুদ্রের আস্বাদ যেন এখানে বসেই উপলব্ধি করছি। পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে উঠা গেল—ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি পান হাতে ঠাকুর দাঁড়িয়ে—নাঃ! ষোলকলা পূর্ণ একেবারে। দেরি করার উপায় ছিল না—আজই কুতবমিনার প্রভৃতি দিল্লীর অবশিষ্ট দর্শনযোগ্য জায়গাগুলো দেখতে হবে। যাওয়ার সময় চুনীবাবু বললেন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যেতাম কিন্তু একটা মোটা কেস্ পাবার সম্ভাবনা আছে—কি একজন বিখ্যাত লোকের নাম বললেন।...

বহু দাম দস্তর করে পাঁচ টাকায় একখানা টাঙা ঠিক করা হলো কুতুবমিনার যাবে এবং আসবে। কুতবমিনার যাওয়ার পথে এবং ফেরবার পথেও দিল্লীর বাকী যাকিছু দেখবার দেখা যাবে। Calcutta Natioanal Bank এর সামনেই আমরা তিনজনে টাঙায় উঠলাম। টাঙা ছুটলো। পথে যেতে যেতে দু'ধার দিয়ে পুরনো অনেক শহরের ভাঙা ইঁট প্রভৃতি চোখে পড়তে লাগলো। শোনা যায় দিল্লীর মধ্যে সাতটা দিল্লী একের পর এক গড়ে উঠেছে এবং লোপ পেয়েছে। অসহ্য তাপ—আকাশে সেই রক্তময় নেবুলা বিভীষিকা। ছাড়াছাড়া ছন্নছাড়া গাছপালা। পুরনো অনেক ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়তে লাগলো। সবগুলো ধৈর্য ধরে দেখার মত আবহাওয়া ছিল না। সময়ও ছিল না। একটা দুর্গবাড়ীর মত দূর থেকে দেখা গেল—তারক বললো ওই দেখুন ইন্দ্রপ্রস্থ···

পথে হুমায়ুনের সমাধি পড়লো। এই হুমায়ুনকে দুরন্ত রোগ থেকে বাঁচানো সম্বন্ধে তাঁর বাবা বাবরের নামে একটা গল্প চলিত আছে।

হুমায়ুনের রোগ হলে বাবর নাকি তার রোগশয্যার চারপাশ ঘুরে খোদা-তাল্লার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁর জীবনের বিনিময়ে যেন হুমায়ুনের জীবন ফিরে পাওয়া যায়। ক্রমে হুমায়ুন সেরে ওঠেন, বাবর নাকি মারা যান। গল্পের সত্যের চেয়ে কাহিনী বেশি বলে মনে হয়। এ রকম উদ্ভট কাহিনী, এর চেয়েও উদ্ভটতর কাহিনী—রাজা বাদসাহ এবং বিখ্যাত লোকদের সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। এ গল্প নিয়ে আমাদের মাথা ব্যাথা করার প্রয়োজন দেখি না। শিল্প হিসাবে হুমায়ুন টুম্ব এর খ্যাতি আছে দূর থেকে দেখে আকৃষ্টও হয়েছিলাম। হুমায়ুনের টুম্ব আকবরের তৈরি। ভেতরে গেলাম। সেই একই ধরনের বিরাট গম্বুজওয়ালা সমাধি ঘর—মোগল শিল্পের বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মোগল শিল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নাকি তার Arch অথবা খিলান (যেমন হিন্দু Architecture এর বৈশিষ্ট্য গোপুরম-রামেশ্বরম্, মাদুরা প্রভৃতি মন্দিরে যা দেখা যায়। হিন্দুরা নাকি এই Arch তৈরি করতে জানতেন না—মালদহের গৌর পাণ্ডুয়ায় যার নিদর্শন পাওয়া যায়)। আকবরের যুগ মোগল স্থাপত্যের আদি যুগ তাই তখনও মিশ্র শিল্পের উদয় হয় নি—যা পরে তাজমহলের মধ্যে রূপায়িত হয়েছিলো।

হুমায়ুন টুম্ব ঘুরে ফিরে দেখলাম। শিল্পীর মস্তিষ্ক থাকলে হয়তো আরও অনেক বেশি দেখতে পারতাম—দার্শনিকের হৃদয় থাকলে হয়তো আরও বেশি উপলব্ধি করতে পারতাম। কিন্তু, কোনটাই ছিল না বলে এবং কিছুক্ষণ দেখার পর একঘেয়ে লাগলো বলে চলে এলাম। অভিভূত হয়েছিলাম শুধু এর বিরাটত্বে।

টাঙার দুই পাশ দিয়ে পুরনো শহর তেমনি ছড়ানো। ভাঙাচোড়া ইটের তলে যেন কত জীবনের কত বিচিত্র ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। ইটের চেয়ে যেন তারই ছবি মানস চোখে পড়ছে বেশি করে। কত বীরের জীবনেতিহাস আজ এই ধূসর মাটির পরমাণুতে মিশে আছে—

থার্মোপলির সেই বীর শহীদদের স্মৃতির স্তম্ভের মত এরাও যেন ঘোষণা করছে—"Go tell to Sparta, thou that passest by

That here obedient to her words we lie."

ডান ধারে নতুন দিল্লীর রাস্তা চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর Willingdon Aerodrome এলো। একখানা প্লেন মাথার উপর বোঁ বোঁ করে ঘুরছে—নেমে পড়বে হয়তো। Aerodrome-এর এলাকাটা চমৎকার একটা সবুজ মাঠ। সারি সারি প্লেন রয়েছে। এদের মত অস্থির জীব পৃথিবীতে দুটো আছে কিনা সন্দেহ। এই আছে তো এই নেই। নেই শুধু নয়, সারা দেশের মধ্যে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ডিনারের সময় সে হয়তো বার্মায় নাপ্পি খাচ্ছে—অথবা বার্মার জঙ্গলে শ্বেত-হাঁতিকে ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে। আর আমরা চলেছি গড়াতে গড়াতে মান্ধাতার আমলের গাড়িতে—দিল্লীতে থেকেও দিল্লীতে ডিনার খেয়ে উঠতে পারবো কিনা সন্দেহ—ঘোড়াটা একবার মুখ থুবড়ে পড়লে হয়! তারক বললে এইবার ভাল করে চেয়ে থাকুন ময়ূর দেখা যাবে। ময়ূর! সত্যিই ময়ূর হয়তো দেখা যাবে—তবু কেমন আশ্চর্য লাগছিলো। ছোটবেলা গোঁসাইয়ের বাড়িতে ময়ূর দেখতে গিয়েছি—গোঁসাইজী দয়া করে ঘরে আটকানো ময়ূর দেখিয়েছেন তো জীবনকে ধন্য মনে হয়েছে। আর এখানে আকাশে-ওড়া ময়ূর—দলে দলে ওড়ে আর আমাদের মত বাঙালী লোকের মন হরণ করে। ছোটবেলায় দিদিমার কাছে এই ময়ূরের দেশের গল্প শুনে আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি কবে সেদেশ দেখবো। আর আজ সেই দেশের মাটির ওপর দিয়েই টাঙা হাঁকিয়ে চলেছি—যে-টাঙা অন্ততঃ আজকের কয়েকটা ঘণ্টার জন্য আমাদের হুকুমের দাস। একে নিয়ে আমরা যেদিকে খুশি ছুটতে পারি। ময়ূর শেষ পর্যন্ত সত্যিই দেখা গেলো—তবে নিতান্তই নিঃসঙ্গ—তাও নিম গাছের ডালে অস্পষ্ট-ভাবে। মেঘও নাই, দোসরও নাই—তাই, ময়ূর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ

মুহূর্তকে উপভোগ করতে পারলাম না। ময়ুর নাচলো না। বহুদূর পর্যন্ত তাকিয়ে তাকিয়ে ময়ুরই দেখলাম। এই ময়ুর তো কত পরিচিত—কিন্তু দিল্লীর ধূসর প্রান্তরে গাছের মাথায় একে যেন আর এক দৃষ্টিতে দেখলাম। পালামৌর সেই লাইনটা মনে পড়লো—"বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।"

ক্রমেই কুতুবমিনার এগিয়ে আসছে আর স্ফূর্তিতে মন ভরে উঠছে। মাঝে মাঝে খাঁটি দিল্লীওয়ালারা লাঠি বগলে হেঁটে যাচ্ছে। আসেপাশে তাদের জীর্ণ কুটীর। কে জানে হয়তো বাদশাহী আমল থেকে পুরুষপরম্পরায় এরা এখানেই বাস করে আসছে। এদের পূর্বপুরুষই হয়তো বাদশাহ্ দরবারে সিপাহী সান্ত্রীর কাজ করেছে। দেশে দেশে মৃত্যুর অন্ধকার ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে।

কুতবমিনারের প্রায় কাছাকাছি একখানা (সম্ভবতঃ দু'খানা) নতুন বড়বাড়ি দেখা গেলো। একজন Retired বাঙালী কর্মচারী নাকি এখানে শেষের দিনগুলো কাটাচ্ছেন। এইবার কুতবমিনার এসে গেছে। টাঙা থেকে নেমে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বসতে বসতে মাজা ধরে গেছে। কাছেই ছোট ছোট কয়েকখানা দোকান আছে। শোডা লেমনেড্ সরবৎ পাওয়া যায়। কয়েকটা কমলা কিনে আমরা মিনারের দিকে এগিয়ে চললাম। মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে ছোট বেলার একটা কথা মনে পড়লো। কুতবউদ্দিন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর শিল্পকীর্তিটির কথা কিছুতেই মনে পড়ছিলো না। মাষ্টারের ধমক খেলাম। আহা, সেদিন যদি মিনারটি এমনি করে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো! এইসব শিল্পকীর্তি যে কত বালক বালিকার অভিসম্পাত অর্জন করে থাকে ছোট বেলায়! ছাত্র বেলায় এক এক সময় বিরক্তির সঙ্গে মনে হতো, কেনই বা এ লোকগুলো এসব উৎপাৎ বানায় আর কেনই বা আমাদের বিপদে ফেলে—যেন ছাত্রদের ঘোরতর

বিপদে ফেলার জন্যেই এই সব লোক ষড়যন্ত্র এঁটেছে বসে। কুতবমিনারে আসতে পারলে কিন্তু ওরা সেকথা ভাবতে পারত না বরং সামনের এই পাটকেলি রং-এর নক্সাকাটা ১২০ ফিট উঁচু গম্বুজটার দিকে সে হর্ষ, আশঙ্কা ও বিস্ময়ে বড় বড় চোখে চেয়ে থাকতো—ভাবতো, বানাক্, বানাক্ যত পারে ওরা, এসব বানাক আর আমি ঘুরে ফিরে এসব দেখে বেড়াই। আমার এই আজকের অভিজ্ঞতাটা শিক্ষাজীবনের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। বইএর জীবন আর বাস্তব জীবনে এতই প্রভেদ। তাইতো ইতিহাস আমাদের কাছে এত নীরস।

কুতবমিনারটা দেখতে অনেকটা গৌড়ের ফিরোজ মিনারের মত গোল উঁচু গম্বুজ আকাশের বুকে মাথা ঠেকিয়েছে যেন। অবশ্য, কুতবমিনার অনেক বেশি উঁচু। মাঝে মাঝে নক্সা কাটা বেল্ট লাগানো গোলাকার চক্র। নিচু থেকে উঁচু পর্যন্ত এধরনের পাঁচটা চক্র মিনারের সৌন্দর্য বাড়িয়া তুলেছে। নিচু থেকেই মিনারের একেবারে শীর্ষে ছোট ছোট কয়েকটা লোক দেখা যাচ্ছিলো। ক্রমে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠতে লাগলাম। মাঝে মাঝে থেমে দম নিতে হচ্ছিলো। কম তো নয় ১২০ ফিট উঠতে হচ্ছে। এইবার একেবারে শেষ ধাপে উঠে পড়েছি। উপরে কি হাওয়া যেন উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়! চারদিকে ধূসর ধোঁয়ার মত অস্পষ্টতার আবরণ। বহুদূরে দিল্লীর সাদা সাদা দালান-কোঠা অস্পষ্ট-ভাবে দেখা যাচ্ছে। ওই যে দিল্লী যাওয়ার পথটা সাপের মত এঁকে বেঁকে চলে গেছে। ওটা কি আমাদের টাঙা—ছোট্ট বিন্দুর মত মাটির উপর ফুটে আছে। নিচের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝিম ঝিম করে—পা স্থুর স্থুর করে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেন উদ্দামভাবে টানছে। প্রতি স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অনুভূতি, কিন্তু মানুষের শক্তির কাছে সেও পরাভূত। নইলে এত উঁচুতে

উঠেও দাঁড়িয়ে আছি কি করে। হু হু করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে উত্তপ্ত শরীরে পরম তৃপ্তির সঙ্গে তাকে আলিঙ্গন করছি। দিল্লীর আকাশ যেন এখান থেকে আরও ধূসর বলে মনে হচ্ছে। নীল শূন্যের দেশে বিজয়ী মানুষের কলগুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এ গুঞ্জন মিশরের পিরামিডে, পিসার হেলান বুরুজে, নিউইয়র্কের স্কাই স্ক্রাপারেও শোনা যায়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সর্বত্রই পরাজিত। ভালো করে দেখে নিচ্ছিলাম চারদিক যাতে জায়গাটার এক গোটা চিত্র মনের মধ্যে গেঁথে রাখা যায়। কিন্তু রাখা যায় না। জাহাঙ্গীরের টুম্বের স্মৃতি এরই মধ্যে তো ফিকে হয়ে যাচ্ছে। ভয় হচ্ছে আগামী দিনে কুতুবমিনারের আসেপাশের এই অস্পষ্ট পরিবেশও মন থেকে ফিকে হয়ে যাবে, মনের আকাশে স্মৃতির নেবুলা শুধু ঘোলাটে জোছনায় ঝুলে থাকবে—সেদিন হয়তো এই মিনারের আকর্ষণ আবার নিবিড়ভাবে অনুভব করবো। পোলো খেলতে গিয়ে লাহোরে কুতবউদ্দিন মরে ছিলেন। আর দিল্লীর উপখণ্ডে তিনি বেঁচে থাকবার দুর্জয় চেষ্টা করেছেন কিন্তু বেঁচে তিনি আছেন কী? বোবা মিনার তো তারই উত্তর হয়ে আছে।…পাশে দাঁড়িয়ে এক ধনী শেঠ তাঁর অনুচরদের সঙ্গে হাঁসি ঠাট্টা করছিলেন। অনুচরেরা তাঁর টাকার ভারে কাৎ হয়ে বঙ্কিম হাঁসিতে তাঁর কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছিলো। দূরের ওই ভাঙা চোরা ফোর্টটা নাকি পৃথ্বীরাজের। সংযুক্তাকে নিয়ে পৃথ্বীরাজ এবার একেবারেই উধাও হয়েছেন শূন্য জীর্ণ দুর্গ তাঁর শোকে মুহ্যমান হয়ে আছে। পৃথ্বীরাজ আর ফিরে আসবেন না। ভারতীয় জনগণের মধ্যে কিন্তু তাঁর বীরত্ব আর তেজ আজও ভ্রূণদশায় রয়ে গেছে। অস্ত আকাশে তাকে কেড়ে নিতে পারে নি। শেঠ-এর দল নেমে গেছে। অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে আমরাও নামলাম। ফেরার পথে নতুন দিল্লীর দর্শনীয় স্থান দেখে যেতে হবে।

নিচে নামার পর তারক বললো, চলুন এবার অশোক পিলার দেখতে হবে। অশোক পিলার এখানে আছে শুনে কৌতুহল বেড়ে গেলো! কুতুব-মিনারের পাশেই অশোক পিলার। দূর থেকে সেই শেঠের দলকে সেখানে দেখলাম। চারদিকে ভাঙা জানালার ভিড় মাঝখানে একটা লোহার থাম পোঁতা। বাইশশো বছরের লোহায় কোন রকম মরিচা ধরে নি—অশোক স্তম্ভের এই বৈশিষ্ট্যের কথা শুনেছি কিন্তু চাক্ষুষ দেখলাম এই প্রথম। প্রাচীন ভারতের এই বৈজ্ঞানিক বিস্ময় অনেকেই স্তম্ভিত করে। কিন্তু আশী হাজার বৌদ্ধস্তূপের প্রতিষ্ঠাতা অশোকের পক্ষে এটা হয়তো বিস্ময়কর ছিল না। তাই, মহাকালের আপ্রাণ প্রয়াসও এই স্তম্ভের গায়ে একটা মরিচার কণাও বসাতে পারে নি। অবাক হয়ে তার পালিশ দেহে হাত বুলালাম। মৃত্যুর মত ঠাণ্ডা গা-টা। কিন্তু জীবনের মত উত্তপ্ত তার বৈজ্ঞানিক বিস্ময়। বাস্তবিক, অতি প্রাচীন কালেও ভারতে কত উন্নততর বিজ্ঞান চর্চা ছিলো এটা তার নিদর্শন! সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ভারতে ব্রিটিশ সভ্যতার জয়গান গাইবার সময় সে কথা ভুলে যায়। অবশ্য আধুনিক ভারতের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি আমাদের বিস্মিত করে না। বরং দুনিয়ার পুব আর পশ্চিম প্রান্তে চেয়ে আমাদের জীর্ণ কুঁড়ে ঘর মান্ধাতার আমলের লাঙ্গল, জরাসিন্ধুর আমলের কামারের হাপরের গান শুনে আমরা হতাশাতে কুণ্ঠিত হয়ে উঠি। বৈজ্ঞানিক ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে আমরা বজায় রাখতে পারি নি। তাই, না পাওয়ার অভিমানে আমরা বিফল শৃগালের মত "আঙুর ফল টক" এ বিলাসী হয়ে উঠেছি। কিন্তু, মনের গভীরে প্রশ্ন করতে পারলে আমরা বুঝতাম, আমরা ওই টক্ আঙুর ফলই চাই। নইলে, অশোক স্তম্ভের দিকে চেয়ে আমরা আফশোসে ক্লিষ্ট হয়ে উঠি কেন।

তারক বললো, এইবার চলুন একটা মজার জিনিস দেখাবো। কি

এমন মজার জিনিস ভাবতে ভাবতে চলেছি চারদিকেই ভাঙা ইঁটের ঘর বাড়ির বিক্ষিপ্ত স্মৃতি মৃত অতীতের হা হুতাশ' শীর্ণ জীবনের গলিত গন্ধ—তারক বললো পৃথ্বীরাজের মেয়ে ভল্ট দিতো, জানেন?
—পৃথ্বীরাজের মেয়েই ছিলো কিনা জানি না তার উপর আবার ভল্ট।
হাসতে হাসতেই তারক বলে মেয়েও ছিলো আর ভল্টও দিতো দেখবেন চলুন। আর চান তো, ভল্ট দেখিয়ে পরখ করতে পারি।
তারকের রহস্য ঠিক ধরে উঠতে পারিলাম না। চলতে চলতে ভাঙা দালান ছড়ানো একটা জায়গায় এলাম। সামনেই সান বাঁধানো একটা গভীর ইঁদারা। তারক গলা বাড়িয়ে তার জলের দিকে চেয়ে বললো, ওই দেখুন—এই ইঁদারাতেই পৃথ্বীরাজের মেয়ে ভল্ট দিতো। জলের দিকে তাকিয়ে বিশেষ করে ভল্ট দেবার কথা শুনে (বর্ষার নদীর খুব উঁচু পাড়ি থেকে লাফ দেওয়া অভ্যাস থাকলেও) পা সুর সুর করতে লাগলো।
ভল্ট দেওয়া দেখবেন? তারক চারদিকে চেয়ে নিরাশ হয়ে বললো নাঃ, তাদের তো দেখছি নে।
ব'ললাম পৃথ্বীরাজের মেয়েরা নাকি?
হো হো করে হেসে উঠে সে বললে, না না, ওরা না!—এখানে একদল লোক আছে—পয়সা দিলেই তারা ভল্ট দিয়ে দেখিয়ে দেয় পৃথ্বীরাজের মেয়ে কি ভাবে ভল্ট দিতো! আপনার ইচ্ছা না থাকলেও তারা এমন ক'রবে যাতে আপনি না বলে পারবেন না। একেবারে ডিগবাজী খাবার ভঙ্গি করেই তারা চুক্তি করে। দেখে হাসিও আসে, দুঃখও হয়। হাসি আসে তাদের ভঙ্গি দেখে আর দুঃখ আসে তাদের জীবিকার জন্যে এমন বিপজ্জনক পন্থার আশ্রয় নিতে দেখে।
বললাম, ভারতের লোক কতরকম ভাবে জীবিকা অর্জন করে

Hindusthan Year Bookএ তার একটা List দেখেছিলাম। তাতে ঝাড়-ফুক থেকে আরম্ভ করে হাত গণনা, পাখী দিয়ে ভাগ্য নির্ণয়, কানের খোল বের করা, শনির হাত থেকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা দেওয়া, গল্প বলে পয়সা রোজগার করা, মেয়ের বিয়ে, ছেলের পৈতে ঘরে আগুন লাগা, রাজবন্দীর সাহায্য (কয়েকটা Hindusthan Year Book এর বাইরের আমার নিজস্ব হিসেবেও আছে) প্রভৃতি বহু-রকম উপার্জনের ব্যবস্থাই আছে। Hindusthan Year Book এর সংগ্রাহক সম্ভবতঃ দিল্লীর এই ভণ্টওয়ালাদের খবর রাখেন না।

ভণ্ট দেখা অসমাপ্ত রেখেই ফিরলাম। ভণ্টওয়ালারা আমাদের সর্বহারা পোশাকে হয়তো কাছে আসতে ভরসা পায় নি! ওদেরও শ্রেণী চেতনা জন্মেছে তাহলে! ধীরে ধীরে ক্লান্তভাবে টাঙার দিকে ফিরলাম। রাস্তায় পড়তেই একখানা নীল রংএর মোটর গায়ে প্রচুর পরিমাণে ধুলো ছিটিয়ে গেলো—মোটরের মধ্যে সেই শেঠের গোলাপী পাগড়ী নড়ছে—চকিতে চোখে পড়লো। ধুলোর আক্ষেপ নিয়ে চোখ মুখ বন্ধ করে দোকানের দিকে এগিয়ে চললাম। আক্ষেপ আর কী অধিকাংশ লোকের গায়ে এমনি ধুলো ছিটোনোর অধিকারই তো এরা খাটিয়ে আসছে বহুযুগ থেকে। এই বিক্ষিপ্ত ধুলোর হোলিখেলায় যে ইতিহাস গড়ে উঠছে এই শেঠদের সাধ্য কি তাকে অধিকার করে। তিন গ্লাস সরবতের অর্ডার করে দাঁড়িয়ে আছি। সামনেই কুতবমিনার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে প্রাচীন আর নবীনের মহামিলনের সংযোগ সূত্রের কাজ করছে। ক্ষিদে পেয়েছে প্রচুর। তারক আগেই বিস্কুটের অর্ডার করে বসেছিলো। এ বিষয়ে তার আর ত্রুটি নেই। এমনি স্নেহশীল কর্তব্য-পরায়ণ বন্ধু সত্যিই বিরল।

টাঙা আবার দিল্লীর পথ ধরলো। পথে এবার দুটো ময়ূর পড়েছে! সমুখের আকাশে এরোপ্লেন চক্রাকারে ঘুরছে। এরোপ্লেনের পাথার

হয়তো আমেরিকার Red Wood এর গন্ধ!—আরোহী হয়তো নিশীথ সূর্যের দেশের কোন অচীন অধিবাসী—যন্ত্রের শব্দে যেন বিজয়ী মানুষের গলার রব। দেশান্তরী বকের মতোই এরোপ্লেনখানা উড়ে যাচ্ছে পশ্চিমের সীমান্তের উদ্দেশ্যে হয়তো তার পাখায় পাখায় দিল্লীর ধূসর মাটির গন্ধও জড়িয়ে গেছে। চীন সমুদ্রে টাইফুনের আঘাতে তার প্রপেলার যখন আর্তনাদ করতে থাকবে তখনও বাদশাহী দিল্লীর পুরনো মাটির গন্ধ তার পাখায় ভর করে থাকবে হয়তো—এ গন্ধ একটু বেশি গাঢ় কিনা!

ডান ধারের পথ ছেড়ে টাঙা এবার নতুন দিল্লীর পথ ধরেছে। নতুন দিল্লী—একেবারে অভিনব নতুন ধরনের নগরী ভারতের কোথাও এর নজীর নেই। একেবারে গোড়া থেকে নতুন করে তৈরি। এই শহরটা তৈরি করতে এগারো কোটি টাকা খরচ পড়েছিলো। এখানে বোম্বের শ্রমিক অধ্যুষিত Chowl নেই, কলকাতায় নোংরা কুলি বস্তী নেই, ব্যারাক জীবন নেই, ধোঁয়া নেই, ধূলা নেই একেবারে কালো চকচকে ঝকঝকে পীচের রাস্তা ডাইনে বাঁয়ে সম্মুখে পেছনে চলে গেছে। তবু নয়াদিল্লীর রাস্তায় আমি যত ময়লা আবর্জনা রক্তের দাগ দেখতে পেলাম (অবশ্য মানস চোখে) এমন আর কোথাও দেখি নি। সারা ভারতের দুর্নীতির জঞ্জাল যেন এই কালো ঝক্‌ঝকে পীচের পথে স্তূপাকার হ'য়ে আছে। সারাদেশের ঝরা রক্ত যেন এই কালো পথ সিক্ত করেছে। সেই রক্তের ধারায় যেন আমারও রক্ত কনিকা দেখতে পেলাম। আমারই রক্তের উপর দিয়ে আমি টাঙা ছুটিয়ে চলেছি! মন্দ না। গ্রামগুলোকে শূন্য রেখে এমন সুসজ্জিত নগরী তো আমরা চাইনি। কুঁড়ে ঘর আর বস্তির ভাঙা পাঁজরে এই ধার করা যৌবন তো সাজে না। যেদিন ভাঙা পাঁজরে যৌবনের রক্ত উচ্ছ্বাস বইবে, সেদিন এমন নগরী আমরা চাইবো বই কি মানুষের এই শিল্প উৎকর্ষতাকে

অগ্রাহ্য করবো এমন হটেনটট আমি নই। তবু, আজ এই শিল্প গৌরবও যেন মানুষের দুর্দশার সামনে এক প্রকৃষ্ট ব্যঙ্গ বলেই মনে হচ্ছে। এমন একখানা দালান চোখে পড়েছে না যা লতা-পাতা ফুল শোভিত নয়, এমন একটা রাস্তা চোখে পড়ছে না যা কুচকুচে কালো নয়, এমন একটা বাড়ি চোখে পড়ছে না যার গায়ে নোংরা দাগ। তবু কিন্তু বাড়িগুলো দাগে ভরা, রাস্তাগুলো ধূসর, লতা-পাতা-ফুল যেন চৈত্রের ঝরাপাতার মত পিঙ্গল। ভারতের এই হেঁয়ালি ভরা, শ্বেত রূপ যেন এই নয়াদিল্লীর মধ্যে প্রতিমূর্ত হতে দেখছি।

যেখানে সেখানে টাঙা থামাবার উপায় নাই আবার দেবতাদের শৃঙ্খলা-সুখের ব্যাঘাত ঘটবে। অবশ্য শৃঙ্খলার অভিযোগ নেই অভিযোগটা দেবদূত এবং দেবতাদের পক্ষপাতদৃষ্ট সুখের বিরুদ্ধে। ইচ্ছা সত্বেও নামতে পারছিলাম না। শেষে একটা জায়গায় এসে টাঙা থেকে নামা গেলো। সেখানে নাকি বাধা নেই, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। সামনে পেছনে লক্ষ্মীর বরপুত্র কোন্ পথে ব্যারনদের বাড়ি, লাল লাল ফুল লতা পাতায় দোল খাচ্ছে। মানুষের সৌন্দর্য সুষমা যারা বাড়াতে পারতো, তারা যেন সাম্যহীন লজ্জায় অধোমুখ হয়ে আছে। একটু দূরেই ছবির মত কাউন্সিল হাউস দেখা যাচ্ছে। বহু কোঠা সুশোভিত বিরাট বাড়িখানা দূর থেকে অর্ধচন্দ্রাকৃতির মত মনে যাচ্ছে। কাউন্সিল হাউসের ফটো অনেকবার দেখেছি-কিন্তু, বাস্তবে সে যে এত অপূর্ব তা বুঝি না। অতীতের শিল্প-গৌরবকে যারা অর্থহীন আত্মম্ভরিতায় ওদর হিসেবে ব্যবহার করে তারা এসে নতুন 'যুগের এই স্থাপত্য শিল্পীর শিল্প-সুষমা' দেখুক। তবু তো এই শিল্প এবং শিল্পীর হাতে পায়ে সোনার শিকল পড়ানো। আজকের শিল্পীর তুলি সরবরাহ করে Thyssen Kruppএর দল, রং সরবরাহ করে রথ্ স্চাইল্ডের বংশধর, কাগজ দেয়

Hundred Families আর পারিশ্রমিক দেয় ফোর্ড কারখানা—তাই শিল্প আর শিল্পী সেই কারখানায় বন্দী। কিন্তু, আগামী-অনিবার্য মুক্তির দিনে Quest of life যেদিন শিল্পীর একমাত্র প্রেরণা হবে—সেদিন Rembrandt আর De Vinci, Michael Angelo আর Raphael এর যুগ অস্ত আকাশের মতই ম্লান হয়ে উঠবে। সেদিনও কি জীর্ণ কুঁড়ে ঘরের গোধূলির বন্দনা-বিলাপ শুনবো? কাউন্সিল হাউস তো তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।..ভাইসরয়-হাউসটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিলো। এবার আমাদের উঠতে হবে—কেননা, এখনও বিখ্যাত মন্দির দেখা বাকী।

বিড়লা মন্দিরের গেটে এসে টাঙা থামলো। মন্দিরে ঢুকে অবাক হ'য়ে গেলাম। প্রথম দৃষ্টিতেই চমৎকার মনে হ'লো। সূর্যহারা আকাশে তখন পাণ্ডুরতা ঘনিয়ে উঠেছে। বিদ্যুতের আলোগুলো ফিক্ ফিক্ ক'রে হেসে উঠলো চারদিকে। ভারতের প্রাচীন এবং নবীন বীরদের (সবাই হিন্দু) সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্তি গড়া চারদিকে। তার মধ্যে শিবাজী, রাণা প্রতাপ যেমন আছেন গান্ধীজিও তেমনি আছেন। শুনলাম, গান্ধীজি নাকি এই মন্দিরের উদ্বোধন করেছেন। জাতীয়তাবাদী বিড়লার মন্দিরে মুসলমান-দেশপ্রেমিক বীরদের মূর্তি নেই কেন বুঝলাম না। দেশনেতা গান্ধীজি নির্জলা হিন্দুত্বে তৃপ্ত হোলেন কেমন ক'রে তাও হেঁয়ালী ব'লে মনে হ'লো। সামনেই কৃত্রিম পাহাড়—লাফিয়ে পড়লাম তার উপর। চারদিকে জন্তু-জানোয়ারের চমৎকার চমৎকার মূর্তি, মাটির না শ্বেত পাথরের মূর্তি সাহস ক'রে কোন সিদ্ধান্তই ক'রতে পারছিলাম না। একটা প্রকাণ্ড সাপের ফণা থেকে জল ঝরে ঝরে পড়ছে। তারই ওপরের দিকে উঁচু মত জমিতে ব্যায়ামাগার—ছেলেরা ব্যায়াম করছে। অর্থাৎ, আধুনিক এবং পৌরাণিক সবাইকে আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা রয়েছে। হঠাৎ এম্প্রিফ্যায়ারে গান্ধীজির

কণ্ঠে প্রার্থনা প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। চমৎকার নেশা ধরানো সুর। সন্ধ্যার আকাশে শ্রান্তি আর অবসাদ ঘনিয়ে উঠছে। সব মিলে সাঁওতালের মাদলের ধ্বনির মত কেমন একটা মাদক উপলব্ধি মনের কোণে ছড়িয়ে পড়লো। এই করুণ গম্ভীর উদাস পরিবেশ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মায়াফাঁদ কিনা তাই ভাবছিলাম। মন্দিরের মধ্যে ঢুকলাম। লক্ষ্মী-নারায়ণের ঢুল্ ঢুলে চোখের তারায় জীবনের প্রকাশ হয়েছে। বাস্তবিক এমন সজীব মনে হচ্ছিলো মূর্তি দুটোকে যে গৌরাঙ্গ-দেবের শিষ্যেরা কেউ উপস্থিত থাকলে হয়তো কেঁদে সারা হ'তেন। মন্দিরের ভেতরটা ঝলমল করছে—আলোকে আভায়, রংএ, রূপে।··· বিড়লাজী তাহ'লে শুধু কাপড়ের কলেই টাকা খাটান না, মন্দিরেও টাকা লাগান। শুধু ইহলোকের কারবারী তিনি নন পরলোকেরও ব্যাপারী। তাঁর অঙ্গুলি চালনায় ইহলোক আর পরলোক একত্রিত হয়, ভূত এবং ভবিষ্যৎ এক হ'য়ে যায়। তাঁর মন্দিরে শুধু জাতীয়তা-বাদীদেরই স্থান নয়—সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেরও পীঠস্থান। ভক্তদেরই তিনি খুশি করেন। মানবাত্মার উৎকর্ষ-সাধনকারী শিল্পীরাও তাঁর অনুগ্রহ লাভ ক'রে—নিগ্রহ কী শুধু মুসলমান বিধর্মীদের ওপর? অন্ততঃ তাঁর সাপের মুখের ঝরণা দেখবার জন্যেও কি তিনি মুসলমানদের এক ঘণ্টার পাশ-পোর্টও দিতে পারতেন না? তাঁর স্বর্গলাভ না হয় দু'এক ঘণ্টা পিছিয়ে যেতো! তাঁর স্বাধীনতার গৈরিক স্বপ্ন না হয় একটু স্থগিত থাকতো! ধন্য বিড়লাজী, লাঠির মাহাত্ম্যের মত, সারা ভারত তোমার মহত্ত্বে আকুল হয়ে উঠেছে—নয়া দিল্লী লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির কি তাদের সবারই তীর্থ!

বিড়লা-মাহাত্ম্য কীর্তন করছি হঠাৎ দেখি এক ভাকনা ফেরৎ মুসলমান বন্ধু চারদিকে দেখতে দেখতে চলেছে—কেবল তার নাম ধরে ডাকতে যাবো হঠাৎ সে দেখি মুখে আঙুল উঠিয়েছে। তার

ইঙ্গিতটা ধরতে পারলাম। মুসলমানদের এখানে ঢোকা নিষেধ তো! কিন্তু, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরের শিল্প খ্যাতি তো জাতীয় বাঁধকে স্বীকার করতে পারে নি। সারা ভারতের এই শিল্পে যে মুসলমানদেরও উত্তরাধিকার রয়েছে—গ্রীক প্রভৃতি জাতির মত-বিড়লাজীর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তো তাকে খাটো করতে পারে না! তাই, মুসলমান বন্ধু তার স্বাভাবিক অধিকারের বলে এখানে ঢুকেছে। হিন্দুরা কিছুটা অসাম্প্রদায়িক বলে মনের এক কোণে একটু স্থান ছিলো কিন্তু, বিড়লাজীর মন্দির সেদিক দিয়ে আমাকে নিরাশ করলো। গান্ধীজি যার উদ্বোধন করেছেন জানি না তিনি সত্যি করেছেন কিনা, সেখানেও কি মুসলমানরা অস্পৃশ্য! পাকিস্থান দাবী কী এরই প্রতিক্রিয়া ?
মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে দেখি আকাশ কখন হঠাৎ মেঘে ভরে গেছে। টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিলো। ক্রমে আরও জোরে বৃষ্টি পড়তে লাগলো। মন্দির দেখা শেষ হ'য়ে গিয়েছিলো। বৃষ্টির জন্যে বাইরের দিকের রিডিং রুমে গিয়ে বসলাম। ওই টুকু দৌড়ে আসতে স্যাওলা আমসত্ব হ'য়ে উঠেছে। মন্দিরের অনবদ্য শিল্প দেখে যে আনন্দটুকু পেয়েছিলাম সেটুকু বুঝি মাঠে মারা যায়। মনটা সেঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে। বৃষ্টি আর ছাড়ে না। বহুক্ষণ দেখে দেখে শেষে রাত বেশি হ'য়ে যাচ্ছে বুঝে বৃষ্টি মাথায় ক'রেই দৌড়তে দৌড়তে টাঙায় গিয়ে উঠলাম। ইস্, কাপড়-জামা প্রায় ভিজে গেছে। দিল্লী-দেখা মনে যেন ঝিল্লীর আর্তনাদ স্পর্শ ক'রে গেলো। ঘরে চলো, এবার ঘরে চলো !

মেজাজ খারাপই ছিল। কী নিয়ে যেন রেবতীর সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেল। ভ্রমণের ফলটা যেন আরও তিতে হয়ে উঠলো। অথর্ব অন্ধকারের মতই নিঃশব্দে আমাদের বাঁকী পথ কেটে গেলো। টাঙা থেকে নেমে রেবতীকে একটা দোকান দেখিয়ে দিয়ে (রাত্রে আজ চুনীবাবুর ওখানে যাবার সময় ছিলো না—হোটেলেও দুজনের খাবার কথা ছিলো) আমরা

সেই জৈন হোটেলে গিয়ে উঠলাম। কালো বিড়ালটা ঠিক জায়গায় বসে আছে। ডালের রংএর একটুও বদল হয় নি—যান্ত্রিক যুগে সবই যন্ত্রের মত। হেড ঠাকুর যে কথাবার্তা বলছে তা হুবহু প্রাত্যহিক ভঙ্গিতে। অন্যান্য পাঁচজন খাদ্যরত হোটেল সভ্যের মত সেও হৃদয় দিয়ে কথা বলে না—বলে নীরস জিভ্ দিয়ে। যান্ত্রিক মানুষ যদি কথাবার্তা বলতে পারত তাহলে তাদের জীবনধারাও ঠিক এমনি হতে পারত। বৃষ্টির দিন বলে আজ অনেকেই সকাল সকাল খেয়ে ফিরে গেছে। তাই হোটেলে আজ ভিড় তেমন নেই। আজকের দিনটিতে দেশ ও বাড়ির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। খিচুড়ী আর বেগুন ভাজায় বৃষ্টির দিনগুলি বাংলার ঘরে ঘরে কি অপূর্বই না হয়ে ওঠে। আর যেখানেই হোক দিল্লীর মাথায় এভাবে অসময়ের বর্ষা আশা করি নি। এই বৃষ্টির রাতে দিল্লীর নির্জন প্রান্তরগুলো আরও খাঁ খাঁ করছে। কুতবমিনারের বুকে এতক্ষণ সঙ্গীহীন বর্ষারাত্রির ব্যথা ঘনিয়ে উঠেছে। কোন নিঃসঙ্গ ময়ূর হয়তো তার দয়িতার খোঁজে সেই নিঃসঙ্গ প্রান্তর করুণ কেকাধ্বনীতে মুখর করে তুলেছে।

ভিজতে ভিজতে মেসে এসে উঠলাম। রেবতীর সঙ্গে ঝগড়া করে মনটা ভালো ছিলো না। সম্পর্কটাকে সহজ করবার জন্যে কিছু জিলাপী তার জন্যে কিনে নিয়ে গেলাম। রেবতী তখনও ফেরেনি। ফিরলে তাকে বর্ষারাত্রির উপহার সেই জিলাপী দিলাম। সম্পর্কটা হাসি-ঠাট্টায় আবার সহজ হয়ে উঠলো।—বর্ষার রাতে ঘুমটা ভালোই হয়েছিলো।

দিল্লীর কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে। আজই ইন্দোর যাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। স্টেশান থেকে ইন্দোরের পথের এবং ভাড়ার খবর নিয়ে এসেছি। দিল্লী এবং আগ্রা :দুই জায়গা হয়েই ইন্দোর যাওয়া যায়। দিল্লী হয়েই যাবো ভেবেছিলাম নানা কারণে। কিন্তু সে কারণটাকে

চাপা দিতে হলো রেবতী আগ্রহাতিশয্যে। তার খুব ইচ্ছা তাজমহলটা আমরা দুজনেই একসঙ্গে দেখি। একা একা তাজমহল দেখার মত দুঃখ নেই। নানাকারণে রেবতীর সিদ্ধান্তেই সায় দিতে হলো।

আজ শরীরটা বড্ড খারাপ মনে হচ্ছে! আগ্রা যাওয়া তাই একদিন মুলতুবী রাখতে হলো। ঠিক হলো শরীর ভালো মনে হলে আজ পায় হেঁটে নয়াদিল্লী ভালো করে দেখতে যাবো। আজকে খেয়েই দিনটা কাটালাম। শরীরটা বিকেলের দিকে হালকাই হলো। তারক অফিস থেকে এলে তিনজনে মিলে রওনা দিলাম। আজ কেন যেন মনে হলো যে, জুতো জোড়াকে লাহোর পর্যন্ত টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছি, তার মনোব্যথা আর বাড়াই কেন! বেচারা যেন বড়ই মনোদুঃখে আছে। আজ তার সদ্ব্যবহার করা যাক! কিন্তু, বেচারার মনোব্যথা কমাতে গিয়ে যে ব্যথা নিজে সেদিন ভোগ করেছি তা আর কি লিখবো! জুতো পায়ে দিয়ে চললাম তিনজনে মিলে। তারকের আবার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে আজ। মাথাধরার ব্যারাম ওদের পরিবারগত। কিছুদূর চলার পরই পায়ের গোড়ালিতে চিন্ চিন্ করতে লাগলো। ব্যথা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের পরিধি ক্রমেই কমতে লাগলো। ব্যথার চোটে শেষে এমন হলো যে আমি আর আমার ব্যথা ছাড়া আসে-পাশের পৃথিবী একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবু জুতো খোলার উপায় নাই। ডাইনে-বাঁয়ে দিল্লীর রুগ্ন সহস্র চক্ষু হা করে চেয়ে আছে। মনে হচ্ছে তারা আর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমার জুতোর দিকে মনোনিবেশ করেছে। সভ্যতার অগ্রগতির পথে যে মুহূর্তটিতে জুতো আবিষ্কার হয়েছিলো, আজ এই মুহূর্তে অন্ততঃ, সেই মুহূর্তটিকে চীৎকার করে অভিসম্পাত করতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু, অভিসম্পাতে কি আর জুতোর ব্যথা কমে, হয়তো আরও বাড়েই। এইবার সহজ ভাবে পা ফেলার ক্ষমতা হারিয়েছি। জুতো পরে খোঁড়ানোকে

একদিন বাঙালামি বলে পরিহাস করেছি, ঘটনাচক্রে সেই পরিহাস আজ মাথায় ভেঙে পড়লো। অগত্যা তারককে বললাম, আর পারি না হে—তোমার মাথায় ব্যথা আমার পায়ে ব্যথা। চলো ফেরা যাক, নয়াদিল্লী পড়ে থাক। তারক বললো, শুধু শুধু জুতো পায়ে দিলেন কেন? আমিও প্রশ্ন করতে পারতাম শুধু শুধু তোমার মাথা ধরে কেন? তা আর পারলাম না। মরিবাঁচি করে, ফোস্কার চাপ এড়াবার জন্যে পায়ের নানাবিধ হাস্যকর ভঙ্গি করতে করতে কোনরকমে নায়াদিল্লীর (নাম ভুল হয়ে গেছে) পার্কে এসে পৌঁছনো গেল। পার্কে চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে কত লোকজন। কিন্তু আমার দুর্দশার সঙ্গে তাদের কোনও তুলনা হয় না। হাঁপ ছেড়ে একটা সবুজ মত জায়গা বেছে নিয়ে আমরা তিন জন বসে পড়লাম। বাবাঃ সন্ধ্যা নাহলে আর এ জায়গা থেকে উঠছি নে! কোন্ কুক্ষণেই হতভাগা জুতো পায়ে বেরিয়েছিলাম—দিনের আনন্দটা একেবারে মাঠে মারা গেলো! এই চানাচুর ইধার, ইধার!

চানাচুর এলে কয়েক পয়সার কিনে চিবোতে লাগলাম। ক্রমেই লোক বাড়ছে। চমৎকার জায়গাটা—রেডিয়োতে এম্‌প্লিফায়ার ফিট করে গান হচ্ছে। সারা মাঠ যেন গম্‌গম্ করছে। বেশ লাগছিলো—ব্যথার লেশ মাত্র আর নেই—তবে তার সৃষ্টির যন্ত্রনা কাছেই রয়েছে—সেদিকে তাকাতেও ভয় হচ্ছিলো।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। চারদিকে আলো জ্বলে উঠছে। অনেকের মধ্যে ফেরার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে তবে তারা প্রাইভেট টিউটার নয় নিশ্চয়ই—ওসব 'বাংলাই' আপদ এখানে নেই। প্রাইভেট সেক্রেটারী হতে পারেন এঁরা কেন না, এখানে যেমন রাজা-মহারাজা-আমলাদের ভিড়!

মাঝে মাঝে আধুনিক বাদশাহ-কন্যাদের গা থেকে সুগন্ধ ভেসে আসছে।

অবশ্য দুর্গন্ধবাহী সর্বহারার এখানে অভাব নেই। পেরামবুলেটার ঠেলেই তাদের জীবন কাটছে। সাহেবী কায়দা-কানুনে কিন্তু তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। হয়তো কে বড়ো সাহেবের খাসকামরায় প্রহরী আর কে ছোট সাহেবের বৈঠকখানায় তদারককারী এই নিয়ে এদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি, রক্তারক্তি চলে। এখানেও হয়তো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ছোটখাট সংস্করণের অভিনয় চলে। একেবারে নিচুতে প'ড়েও ওরা স্বর্গাভিমুখী দৃষ্টিকে ভোলে নি। সাহেবদের মত এরাও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে চাল-চলন আদব-কায়দা বুলির প্রতিযোগিতা চালায়। ধনতন্ত্র এমনিভাবেই তার শিকড় গেড়েছে! কিন্তু, শিকড়টা বড়ো আল্‌গা—একেবারে বালুবেলাভূমে।

সন্ধ্যার আড়ালে জুতোজোড়া নিঃশব্দে রুমালের ভেতর স্থান লাভ করলো। এবার পথ চ'লতে যেন মুক্তির আনন্দ উপভোগ করছি—সামান্য জুতোর অত্যাচার থেকেই এই মুক্তি না জানি 'পর-শাসনের' হাত থেকে মুক্তি আরও কত আরামদায়ক। ধূসর আকাশে নিরালা নক্ষত্রের প্রাণেও সেই মুক্তির উপলব্ধি গিয়ে পৌঁছেছে হয়তো। কেরাণী পাড়ার মধ্য দিয়ে চলেছি মনে হচ্ছে। সেই ধরনের ছোট ছোট বাড়ি। অনেকগুলো বাঙালী ছেলেমেয়ে হৈ চৈ করছে। একটা হলুদ রংএর কুকুর আকাশের দিকে চেয়ে করুণ চীৎকার করছে। কেরাণী পাড়ায় পর্যাপ্ত খাবার খাওয়া যায় না বলে সে হয়তো অভিযোগ করছে। অভিযোগ ক'রছে আকাশের কাছে! বিস্তর চেষ্টা ক'রেও একটা টাঙা পাওয়া গেল না। যেটা পাওয়া গেল সেটা না পেলেও চলতো। এতই ভাড়া হেঁকে বসলো যে, দিল্লীর প্রাইভেট সেক্রেটারীদের পক্ষেই তা সম্ভব। টাঙা-ওয়ালা হয়তো ভেবেছে এখানে যারা গাড়ি চাপে, তারা সবাই ওই ধরনের কেউ কেটা হবে নিশ্চয়ই—পায়ে জুতো না থাকলেও, অথবা ন'আনা সিটের জামা গায়ে দিলেও।

হাঁটতে হাঁটতে পুরনো দিল্লীতে পড়লাম। Paradise lost হ'লো—Regained কোনদিন হবে কিনা বলা দুঃসাধ্য। কালই হয়তো চ'লে যাবো। তারক বললো, কালই যখন যাচ্ছেন তখন একটা দেখার মত জিনিস দেখে যান—যেটা আজও আপনারা দেখলেন না! আমারও খেয়াল ছিলো না।

আবার কি দেখা বাকী আছে বুঝতে না পেরে ওর দিকে প্রশ্নসূচক ভাবে চাইলাম। সিপাহী বিদ্রোহের চিহ্ন দেখেছেন? চলুন দেখবেন।

—সিপাহী বিদ্রোহের চিহ্ন! কানপুর, বারাকপুর, মীরাট, দিল্লী—ভারতের স্বাধীনতা আবেগের প্রথম অভিব্যক্তি যেসব জায়গায় ঘটেছিলো দিল্লী তো তার মধ্যে একটা। জাতীয়তাবাদী ভারতের সেই মহান্ তীর্থক্ষেত্রে এসে সেই স্মৃতিচিহ্ন দেখে না গেলে দিল্লী আসাই সার্থক হ'তো কিনা সন্দেহ। দুঃখের বিষয়, যেটা প্রথম দেখা উচিত ছিলো সেটা আমরা যাবার শেষে দেখছি—তাও হঠাৎ। ক্লান্ত হ'লেও দ্বিগুণ উৎসাহে সেইদিকে চললাম। পৌঁছতে বেশ কিছুটা সময় লাগলো।

তারক ব'ললো, ওই দেখুন কাশ্মীর গেট্। এই গেট্ ব্রিটিশ সেনাপতি নিকলসন্ উড়িয়ে দেয়। ওই যে প্রাচীর দেখতে পাচ্ছেন, চেয়ে দেখুন ওর গা আজও ক্ষত বিক্ষত। দেখলাম, প্রাচীরটার বহু জায়গাই ভাঙা চোরা। সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে। লাহোরের রাবি নদীর তীরে যে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা নেওয়া হ'য়ে ছিলো, দিল্লীর এই কাশ্মীর গেটেই তার প্রথম আয়োজন। অত্যাচারী সামন্ত রাজা মহারাজাদের নেতৃত্বে এই সংগ্রামের ব্যর্থতার জন্যে অনেকাংশে দায়ী হ'লেও বাঙালী পল্টনের (অবশ্য এ পল্টনে বাঙালী কেউ ছিলো না—ছিলো প্রধানতঃ ইউ, পির লোক) সে বীরত্ব স্মৃতি আজও লোকের মনে অক্ষয় হ'য়েই আছে। আগামী কালের মানুষ ভালো করেই বুঝবে, এই লড়াই মুষ্টিমেয় সৈনিকের বিশৃঙ্খল বিদ্রোহ

মাত্র ছিলো না উৎপীড়িত ভারতবাসীর প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তি-আলোড়ন। ওই প্রাচীরের ভাঙা ইঁটের আড়ালে যেন সেই সব বীর শহীদের আবেগ-কম্পিত হাতের স্পর্শ স্পষ্ট অনুভব ক'রতে পারছি। সামনের জমিটায় গিয়ে তিনজনে মিলে ব'সে সেই অদৃশ্য ঘটনার স্মৃতির দিকে চেয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ বসে সে-সব দেখলাম। তারপর রাত হ'য়ে যাচ্ছে দেখে উঠে পড়লাম।

চুনীবাবুর মেসে গিয়ে যখন পৌছলাম তখনও চুনীবাবু ফেরেন নি। তাঁর জামা-কাপড়গুলো ঠিক তেমনিভাবেই ছড়িয়ে রয়েছে—কোন জায়গায় গরমিল নেই। অনেকক্ষণ পরে চুনীবাবু এলেন ঠিক তেমনিভাবে ক্লান্ত হ'য়ে। বুঝলাম এইবার ঝড় উঠবে। ঝড় উঠলো কিন্তু কালবৈশাখীর মত ক্ষণিকের মত্ততায় মেতে রইলো শুধু। বাঁচা গেছে। চুনীবাবুর খিদে পেয়েছে নাকি প্রচুর। সেই চচ্চরি, শুক্তো, মাছ। কাল তো ইন্দোর মুখো রওনা দিচ্ছি চুনীবাবু, আবার কবে এই চচ্চরির সাক্ষাৎ পাবো জানি না, তবু দিন কয়েক বেশ মুখ বদলান গেলো।

চুনীবাবু খুশি হ'য়ে ব'ললেন, সবাই মিলে কি আর কম খেটে শেখানো হয়েছে ঠাকুরকে! মশাই, আমরা বাঙাল্ মানুষ—ওসব পোনা মাছের ঝোলে কি আমাদের পোষায়! তা, এত শীগগির চললেন কেন—ভারতের রাজধানীতে এসেছেন—এত শীগগির কি আর যায় কেউ!

—ব'ললাম, আমরা রাজধানীতেও আসি নি—আর আমরা তারাও নই।

চুনীবাবুর মেস-বন্ধুরাও খেতে বসেছিলেন সবাই আমাদের কথাবার্তা উপভোগ করছিলেন। নিজেরাও হাসি গল্প লাগিয়ে দিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিলো কলকাতার কোন মেসে আছি।

খেয়ে দেয়ে উঠে বহুক্ষণ ধরে চুনীবাবুর সঙ্গে সেই হিজলী জেলের পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করা গেলো। কে কে স্বদেশী ছেড়ে সন্ন্যাসী

হয়েছে। কে কে আজও স্বদেশী করছে। চুনীবাবুকে বললাম, সেই জেলারের কি হয়েছে জানেন ?

উৎসুকভাবে চুনীবাবু বললেন, কী ?

বললাম, তার ছেলেমেয়ে সব মারা গেছে। লোকটা এখন পাগলের মত।

—খুব হয়েছে, খুব হয়েছে—হতভাগা আমাদের জলের বদলে সিপাহীদের দিয়ে লাঠি চালাতে হুকুম দিয়েছিলো—ওর ছেলেমেয়ে মরবে না! উচ্ছ্বসিতভাবে চুনীবাবু বললেন।

চুনীবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। পুরনো দিল্লী তখন নতুনভাবে জীবন শুরু করবার জন্যে বিশ্রাম নিচ্ছে। রাস্তার মানুষের সাড়া খুব কম। ইলেকট্রিক লাইটগুলো আকাশের গ্রহের মতই অচঞ্চল ভাবে জ্বলছে। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে দু একটা আকস্মিক মোটর হু হু করে ছুটে যাচ্ছে। তারক জেগেই ছিলো। রেবতী এসেই ঘুমিয়ে পড়লো। আমরা দুই বন্ধুতে মিলে বাইরের খোলা ছাদে বসে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলাম। কাল চলে যাবো আর হয়তো শীগগির দেখা হবে না। তাই গল্পের মধ্যে আবেগটা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিলো। কোথায় সেই ছায়াশীতল বাংলার গ্রাম আর কোথায় এই দিল্লী নগরী যার ছায়া অবধি খর মধ্যাহ্নের উগ্রতা মাখানো। কে জান্‌তো দূরদেশের এই রুগ্ন ছায়ায় আবার আমাদের ছোটবেলার স্মৃতি আনাগোনা করবে। প্রভাতী তারার চূর্ণ আলোকে যখন বাংলার শ্যামল মাটি সিক্ত হ'য়ে উঠবে তখন বাংলার একখানা ছোট্টগ্রামের ছবির মত মাঠে যদি আবার দু'জনে মিলতে পারতাম। উত্তর আকাশে ক্যাসিওপিয়া জেগে রয়েছে। এইবার ঘুম পাচ্ছে। হাই তুল্‌তে তুল্‌তে তন্দ্রাচ্ছন্ন দিল্লীর শেষ রাত্রির (একেবারে শেষ রাত্রি কিনা বলা শক্ত) কাছে বিদায় নিয়ে শুয়ে পড়লাম। গাঢ় ঘুমে রেবতীর নাক ডাকছে।

সকালে উঠেই যাত্রার ব্যস্ততা। অবশ্য, ব্যস্ততার বিশেষ কিছুই ছিলো না। জিনিসপত্র সামান্য। তবে স্টেশানে যেতে সবে অন্ততঃ এক ঘণ্টা আগে। সকাল সকাল স্নান সেরে নিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে সবাই মিলে রওনা দেওয়া গেলো। তারকের কাছ থেকে কয়েক টাকার Change নিতে ভুলি নি। সে সময় দারুণ Change সঙ্কট শুরু হয়েছে। এক পাঞ্জাবী দোকানে গিয়ে ঢোকা গেলো। অত সকালেও তার রান্না হ'য়ে গেছে। চাপাটি ভাত, ডালের সেই পাঞ্জাবী খানা খেয়ে স্টেশান মুখো রওনা হওয়া গেল। কাছেই স্টেশান। কি একটা লাইব্রেরীর পাশ কাটিয়ে স্টেশানে গিয়ে উঠলাম। তারকের সেই military বন্ধু আগে থেকেই গাড়িতে গিয়ে একটা seat (অবশ্য, তাঁর চেহারায় আমাদের দুটো seat cover করতে পারে) দখল করে বসেছিলেন। Ticket কেটে আমরা গেটে পেরিয়ে প্লাটফর্মে ঢুকলাম। তারকের অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছিলো সে হাত নেড়ে চলে গেলো। তারকের বন্ধু জানালার ধারে বসেছিলেন। আমাদের দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন। ভদ্রলোক বড়ই অমায়িক এবং অত্যন্ত সরল। তাঁর সারল্য আমাদের মুগ্ধ করেছিলো।

প্রেমের সমাধি তীরে

অনেকক্ষণ পর গাড়ি ছাড়লো। ভদ্রলোক এতক্ষণ আমাদের জন্যে কষ্ট করে বসেছিলেন। এত সরলতা এবং আন্তরিকতা নিয়ে দিল্লীর রাজা বাদশাহদের প্রাইভেট সেক্রেটারী হওয়া যায় না! ঢং ঢং করে ঘন্টা পড়লো। ভদ্রলোকও হাতে একটা চাপ দিয়ে অন্তর্হিত হ'লেন। এবার আমরা দু'জন। প্লাটফর্ম আর লাইনের জঙ্গল পেরিয়ে গাড়ি খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো। খোলা বাতাস খোলা চুলে খেলা করে যেতে লাগলো। ছোটবেলায় শিয়ালদহ, হাওড়া স্টেশানে গাড়িতে বসে থাকতে থাকতে মনে হতো এত গাড়ি, লাইন—স্টেশান মাষ্টার আমাদের গাড়ির কথা যদি ভুলে যায়। গাড়ি ছাড়লে মনে হ'তো, স্টেশান মাষ্টার আমাদের গাড়ির কথা মনে করলো কি করে। বড় বড় স্টেশানে গাড়ি থেমে থাকলে আজও সেরকম চিন্তা যে একটুও মনে উদয় হয় না জোর করে তা বলতে পারিনে।

গাড়িটা বেশ ফাঁকা ফাঁকাই ছিলো। এদেশী চাষা মাঝ স্টেশান থেকে কতক উঠছিলো কতক নামছিলো। তাদের দেহাতী ভাষা দুর্বোধ্য। সব দেশের চাষীর মতই তারা অনর্গল বকে—যেখানে সেখানে বেহিসেবী পিচ পিচ করে থুতু ফেলে। কথায় কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠে। ঠিক যেন আদিম মানবের প্রতিচ্ছবি কিন্তু, নবীন মানব যে এদের কাছেই সবচেয়ে বেশি ঋণী। সারা ভারত যে এদেরই রসে সঞ্জীবিত হচ্ছে। এ পথে বৈচিত্র বেশি কিছু চোখে পড়ছে না। মাঝের দু-একটা স্টেশানে বিস্কুট কমলা খেয়ে পথ চলার একঘেয়েমী ভুলতে

চেষ্টা করছি। আলীগড় স্টেশানের আগে থেকেই তৈরি ছিলাম। ডান দিকে সজাগ দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছি হঠাৎ কে একজন বলে উঠলেন আলীগড় ইউনিভার্সিটি! বাঁয়ে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, লম্বা প্রাচীর দেওয়া দালানের সারি, সামান্য দূর দিয়ে লাইনের সমান্তরালভাবে চলেছে। দেখেই বুঝলাম, মুসলীম জাতীয়তাবাদীর পীঠস্থান স্যার সৈয়দ আহম্মদ-এর সুমহান কীর্তি আলীগড বিশ্ববিদ্যালয়ই এটা। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড উঁচু থেকে দৈর্ঘ্যই উল্লেখযোগ্য। প্রায় স্টেশান পর্যন্ত সেই কম্পাউণ্ড আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এলো। ব্রিটিশ শাসনের আদিযুগে মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থেকে জাতি হিসেবে যে পশ্চাৎপদতার ঘূর্ণীপাকে ঘুরে মরেছেন, আজ সেই পশ্চাৎপদতার কালিমা মুছে ফেলার প্রতিযোগিতা চলেছে এখানে। মুসলমান যুবকদের মধ্যে জাতীয় চেতনার স্ফুরন হচ্ছে। আসে পাশে আলীগড় শহরের পুরনো দালান কোঠা চোখে পড়ছে। আলীগড় বহু পুরনো শহর তো! বাদশাহী স্মৃতি এখানেও থাকা সম্ভব। পুরনো আলীগড়ের বুকেই নতুন আলীগড় মাথা তুলেছে।

টুণ্ডলা পর্যন্ত ই, আই, আর-এর এই পথ বৈচিত্রহীন। কিন্তু, ট্রেণ খানা ফাঁকা বলে বেশ ভালই লেগেছে। দুপুরের অসহ্য উত্তাপ অবশ্য-বেশি ভালো লাগতে দেয় নি। তবু লাহোরের মতো ভিড় তো নেই।

টুণ্ডলায় এসে নামলাম। এখানে আগ্রার গাড়ি ধরতে হয়। আগ্রার গাড়িতে উঠে বসলাম। আরও ফাঁকা এই গাড়ি। ক্ষিদে লেগেছিলো প্রচুর। লোভনীয় সন্দেশ নিয়ে খাবারওয়ালারা ঘোরাঘুরি করছে। রুটি সন্দেশ নিয়ে আরাম করে খাওয়া গেলো। সূর্য পশ্চিম আকাশে অনেকটা নেমে গেছে—তাই, উত্তাপটা আর তত বেশি লাগছিলো না। জানালার ধারে তাজমহলের প্রতীক্ষায় বসে রইলাম।

সামনেই আগ্রার একজন কৃষক বসেছিলো তাকে এদিককার ফসলের খবর জিজ্ঞেস করলাম। ফসল নাকি এদিকে ভালো হয়েছে। বাংলার খবর শুনে সেও হায় হায় করতে লাগলো। সূর্য ক্রমেই যেভাবে নেমে যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছিলো আগ্রা পৌঁছতে পৌঁছতে সূর্য আর আকাশের গায়ে থকেবে না। এ লাইনের স্টেশানগুলো ছোট ছোট। বিখ্যাত আগ্রার পাশে যে এত ছোট ছোট স্টেশান থাকতে পারে ভাবতেই পারছিলাম না। অনেক ওপরে থাকতেই সূর্য অস্ত যাবার মুখে, তার আলো আর আসছে না—আসছে আভা। গেরুয়া রং-এর প্রান্তরে গোলাপী সূর্যের আভা—বৈচিত্র হয়ে উঠেছে পৃথিবী, বিচিত্র হয়েছে আকাশ। ঝির ঝির করে বাতাস বইছে—এইতো আগ্রার প্রান্তর! এখানে একদিন ঘোড়া ছুটেছে, হাতী ছুটেছে। সময় সময় সৈন্যের পায়ের চাপে মাটি থর থর করে কেঁপেছে। তলোয়ারের ঝনাৎকারে সাম্রাজ্যের ভাগ্য পরীক্ষা হয়ে গেছে। আজ সেই প্রান্তর অথর্ব অসাড় হয়ে পড়ে গোধুলির জয়গান গাইছে।

যমুনাব্রীজ স্টেশানে গাড়ি থামলো। একজন এই দেশী লোক ব'লে উঠলো, তাজমহল দেখিয়ে বাবু! তাজমহল? এখান থেকে? তাকিয়ে দেখি জানালা দিয়ে সত্যিই তাজমহল দেখা যাচ্ছে। এর অপরূপ বর্ণনা পড়েছি বলেই অপরূপ মনে হ'লো। দুর থেকে খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কিন্তু দূরও যে খুব বেশি তা মনে হলো না! ভাবতে অবাকই লাগছিলো, যে তাজমহল সম্বন্ধে এত স্তুতি এত কামনা বাসনা, দেশ দেশান্তর থেকে যাকে দেখবার জন্যে নামজাদা দর্শক আসে, সামনে বড় জোর দু মাইল দূরে হেঁটে গেলেই সেই তাজমহল! বিদায়ী সুর্যের আলো তাজমহলের মাথার পরে পড়েছে, তার নিচে মৃত্যুর আঁধার রাজ্যে বন্দী মমতাজ শব্দহীন শান্তির পরপারে নিঝুম হয়ে আছে। গাড়িখানা ঝিমাতে ঝিমাতে যমুনার

দীর্ঘ ব্রীজ পাড়ি দিলো। বাঁয়ে ধীরে ধীরে আগ্রা ফোর্ট মাথা তুলে দাঁড়ালো। শব্দহীন সন্ধ্যার গম্ভীর স্তব্ধতা যেন বহু যুগ আগেকার শাজাহানের এই প্রাসাদ দুর্গে গিয়ে মিশেছে। আবছা অন্ধকারে আগ্রা ফোর্ট যেন রহস্যময় হয়ে উঠলো। গাড়ি ধীরে ধীরে আগ্রা ফোর্ট স্টেশানে ঢুকলো।

জিনিসপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। সামনেই একজন হিন্দুস্থানী এগিয়ে এসে বললো, হোটেল বাবু, হোটেল? খুব সস্তায় হোটেল পাবেন। ঘর ভাড়া বারো আনা, এক টাকা, দেড় টাকা।

এত সস্তা ঘর ভাড়া শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। কেন আর অনর্থক ধর্মশালার জন্যে হয়রানি হওয়া! তার পিছু পিছু চললাম। কালো, লম্বা, সাদা লম্বা সার্ট আর কাপড় পরা লোকটা হন্‌হনিয়ে স্টেশানের এক পাশ দিয়ে চলতে লাগলো। ক্লান্তভাবে তার অনুসরণ করলাম।

ভগবান দাসের হোটেল—সাইনবোর্ড টাঙানো। ছোট্ট ছোট্ট ঘর। একেবারে ওপরে বারো আনার ঘরটা আমি দখল করলাম। দু'খানা খাট। তারের জাল আর কাঠ দিয়ে একপাশ ঘেরা। বেশ অনেক গুলো জানালা; আলো-বাতাস খেলে ভালো। সামনেই ছাদ। দেখে শুনে খুশি হয়ে উঠলাম। বাড়ির মতই থাকা যাবে, অন্ততঃ একটা দিনের মালিক আমরা। জামা খুলে সটান্ খাটের ওপর একটু শুয়ে পড়লাম। লোকটা বলতে বলতে গেলো, যা কিছু দরকার সব খবর দিলেই মিলবে স্নানের জল, চা, খাবার যা চাই। আরও খুশি হলাম। ট্রেণ ভ্রমণের ক্লান্তির পর এমন গৃহসুলভ আরাম আমাদের মত সর্বহারার পক্ষে অন্ততঃ দুর্লভ।

রেবতী চায়ের অর্ডার দিয়ে স্নান সারতে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি সব শেষ করতে বলে দিয়েছি। জ্যোছনা রাতের তাজ miss করা চ'লবে

না! প্রকৃতিকে ধন্যবাদ যে, আজকের রাতটার জন্যে অন্ততঃ চাঁদের আলোর বরাদ্দ করেছে। অন্ধকার রাত হলে তাকে প্রাণভরে অভিসম্পাতই দিতাম। কারণ, জ্যোছনা রাতে তাজমহল না দেখলে তাজমহল দেখা আর না দেখা একই কথা। দার্‌জিলিং Tiger Hill-এ যেমন সূর্যালোকের প্রতীক্ষা—এখানে তেমনি জ্যোছনালোকের অপেক্ষা। সেই জ্যোছনালোকের অপূর্ব সুযোগ পেয়ে প্রকৃতির কাছে অশেষ ঋণ স্বীকার করতে হলো।

স্নান করে স্নিগ্ধ দেহ মন নিয়ে খাবার ঘরে ঢুকলাম। গরম গরম রুটি তৈরি হচ্ছে! তার সঙ্গে চত্‌ল্‌ও (অর্থাৎ ভাত) আছে। এসব দেশের ভাত খুবই চমৎকার। স্বাদে—গন্ধে অতুলনীয়। কিন্তু, ডাল আর ভাজির বেলায় বাঙালীর পক্ষে সর্বত্রই বিপদ। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে রাস্তায় বেরলাম। সামনেই টাঙার আড্ডা। তাজমহলে যাবার টাঙা একটাও নেই। প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উঠলাম। কিছুক্ষণ পর একখানা টাঙা তাজমহল যেতে রাজী হ'লো রিজার্ভ-এ। রিজার্ভ-এর আরাম পেলে তো খুশিই হতাম—কিন্তু' সিটের জামায় কি রিজার্ভ পোষায়! তাকে বুঝিয়ে দিলাম, আমরা শেয়ারের গাড়ি খুঁজছি। অবশেষে শেয়ারের গাড়িও পাওয়া গেলো। আগ্রা-ফোর্টের পাশ দিয়ে টাঙা ছুটছে। ঘোড়ার খুরের খট্ খট শব্দ। টাঙাওয়ালা মাঝে মাঝে তার হাতের লাঠি চলতি চাকার মধ্যে দিয়ে একরকম শব্দ করছে পথিকদের সাবধান করবার জন্যে। অবশ্য, পথ প্রায় জনশূন্য—কিন্তু, পথের অভ্যাস ট্যাঙাওয়ালার যায় নি। আবছা জ্যোছনায় আগ্রাফোর্ট কেমন রহস্য-ঘন হ'য়ে উঠেছে। এবার একেবারে নির্জন রাস্তায় এসে পড়লাম কচিৎ কখনও ফিরতি টাঙার সাক্ষাৎ পাচ্ছিলাম। নিথর আকাশের বুকে পঞ্চমীর কিশোর চাঁদ উঁকি মারছে কিন্তু লুকোতে পারছে না। সারাটা পথ কেমন চমৎকার একটা

ফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ ভেসে আসছে—তাজমহলের সঙ্গে তার যেন বেশ একটা সঙ্গতি আছে। তাজমহল দেখবার জন্যে মনকে যেন আগে থেকেই তৈরি ক'রে দেয়। পথের দুধারে সারি বাঁধা গাছ জ্যোছনা লোকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ-বাতাসের দোলায় মাঝে মাঝে তাদের পাতা ঝির ঝির ক'রে কেঁপে উঠছে। চারদিকেই বুনো গাছের ঝোপ। এদিকটা একটু গাছপালা আছে দেখা যাচ্ছে।

তাজমহল দেখতে যাচ্ছি ভাবতেও কেমন রোমাঞ্চ লাগছিলো। ছোট-বেলা থেকেই যার জন্যে এত আকর্ষণ বোধ করেছি আজ চন্দ্রালোকে ও এক নিঃশব্দ রাত্রি ছায়াতলে সেই শৈশব স্বপ্ন সার্থক হ'তে চলেছে ভাবতেও কী তৃপ্তি। কী একটা পাখী হঠাৎ ডেকে উঠলো। যে-পথে শাজাহানের সাজানো ঘোড়া একদিন বিরহী সাজাহানকে নিয়ে নিশীথ অভিসারে গিয়েছে আজ সেই পথ হ'য়ে উঠেছে পীচের পথ—জ্যোছনাসিক্ত, কালো এবং ঝকঝকে।

তাজমহলের গেটে এসে টাঙা থামলো। আরও কয়েকখানা টাঙা দেখি আসে-পাশে রয়েছে। গেট দিয়ে ঢুকতেই দেখি দু'জন মারোয়াড়ী গলায় বেল ফুলের মালা প'ড়ে তাজমহল দেখে বেরিয়ে আসছে। কেমন মিষ্টি গন্ধ তাদের শরীর থেকে বেরুচ্ছে। মারোয়াড়ী বণিকও এমন ছবির মত রাতে কবি হয়ে উঠেছে দেখছি। হায় রে তাজমহল, তুমি টাকা দিয়ে গাঁথা গলায়ও বেল ফুলের মালা পরাতে পেরেছো!

তাজমহলে ঢুকেছি এমন একটা মন নিয়ে যার অনুতে অনুতে তাজমহল সম্বন্ধে একটা বর্ণনাতীত সুষমামণ্ডিত ধারণা ছড়িয়েছিলো। তাই পূর্ব ধারণার বলে প্রথম দৃষ্টিতেই একটা প্রশংসার অনুভূতি দেখা গেলো মনের মধ্যে। বাইরে মৃদু জ্যোছনালোক-কিন্তু, ভেতরে কেমন অস্পষ্ট আবছায়া। ভালো ক'রে দেখা যাচ্ছিলো না কিছু—শুধু এক

অনির্বচনীয় বিরাটত্বে মনের মধ্যে একটা ভাবগম্ভীর আবেষ্টনী গড়ে উঠছিলো। কিন্তু, শোনা ইতিহাসের খবরদারী যতই বাধা দিক, মনের মধ্যে একটা ধারণা স্পষ্টই বোধ করছিলাম—কই, তেমন কই! কিন্তু, নিজের শিল্পানুভূতি খাটো হ'য়ে যাবার আশঙ্কায় মনের মধ্যে সেটা স্বীকার করতেও বাঁধছিলো। কিন্তু, তবু না স্বীকার ক'রে উপায় নেই—কেননা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন :

"প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।
হে সম্রাট কবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে…

* * * *

তোমার সৌন্দর্য-দূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

এই কি সৌন্দর্য দূত! এই কি—জ্যোছনালোকের অমরাপুরী তাজমহল ভাবতে ভাবতে আপন মনে সামনের দিকে চলেছি, হঠাৎ দূর থেকে হিমালয়ের হিম আলয় কাঞ্চনজঙ্ঘার মত শরতের পূর্ণিমা রাত্রির রৌপ্য ধবল মেঘের মত কি একটা পদার্থ মাথা তুলে দাঁড়ালো যেন। এতক্ষণে রহস্য পরিষ্কার হ'লো। যেটাকে তাজমহল ব'লে এতক্ষণ স্তুতির প্রস্তুতি খুঁজেছি সেটা তাজমহলের ছায়া মাত্র। এতক্ষণে আসল তাজমহলের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। নিজের বোকামিতে

খানিকটা লজ্জিত হ'লাম—হাসি পেলো খুব। তাজমহল যে 'শুভ্র মেঘের দল, তা তো জানতাম তবে কেন লালচে মত একটা সৌধকে এতক্ষণ তাজমহল ব'লে ঠাউরেছিলাম !···ক্রমে সিঁড়ি বেয়ে তাজমহলের চারপাশের মর্মর রচিত প্রাঙ্গণে উঠলাম। হ্যাঁ, এইবার সত্যিই মনের মণিকোঠার সযত্ন রক্ষিত চিত্রের সঙ্গে তাজমহলের সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম। জ্যোছনাসিক্ত সামনের সেই ক্ষুদ্র সমাধি মন্দিরের শিল্পানুভূতির গায়ে যেন নিজ শিল্প বিস্ময়ের খোরাক খুঁজে পাচ্ছি। শুভ্রত্বে মর্মর মন্দির জ্যোছনার রূপালী ধারাকেও ছাড়িয়ে গেছে। পরস্পরের মধ্যে শুভ্রত্বের যেন একটা প্রতিযোগিতা চ'লছে। সাদা মন্দির, সাদা জ্যোছনা, সাদা আকাশ—চারদিকে যেন সৌন্দর্যের স্বপ্ন কামনারা রাত্রির অভিসারে বেরিয়েছে। সৌন্দর্য ছাড়া কিছু ভাবা যায় না, প্রেম ছাড়া কিছু কল্পনায় আসে না—যদিও দুনিয়ার সব সেরা কদর্যতা, সব সেরা অবিচার এই শুভ্র পাষাণ ফলকে গাঁথা রয়েছে তবু আজকের এই লাবণ্যময়ী রাত্রির ছায়াতলে ক্ষণিকের জন্যও সেটা চাপা পড়ে থাক। মসৃণ মর্মরের অতলস্পর্শী ক্ষুধার আর্তনাদ আজকের অপূর্ব রাতটির মত অপরাজিত হোক। কাল দিনের স্পষ্ট আলোয়, নিখুঁত বাস্তবের কোলে বসে তার অতৃপ্ত আবেদন শুনবো। আজকের মত তারা নিঝুম রাত্রির কোলে ঘুমিয়ে থাক।

ঘুরতে ঘুরতে যমুনার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। পাশেই বসবার বেঞ্চ। সম্ভবতঃ শ্বেত পাথরের—এখানে সবই যখন শ্বেতপাথরের। একেবারে যমুনার ওপরই গেঁথে তোলা হ'য়েছে তাজমহল। যমুনা! শ্যামের বাঁশীতে যে যমুনা উজান্ বয়েছে নাকি একদিন, আজ তার ভাঁটিতেও বইবার সাধ্য নাই প্রায়। নির্জীব হয়ে পড়ে আছে যমুনা। এই যমুনার ধারেই দিল্লীর শ্মশানে সেদিন ঘুরে বেড়িয়েছি আজ তারই প্রায়

বুকের ওপর দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সৌন্দর্য উপভোগ করছি। যমুনার কিন্তু সৌন্দর্যানুভূতি লোপ পেয়েছে, মানুষের মর্মর কারায় বন্দী সে এখানে। দিল্লীতেও লোহার কারায় সে বন্দী হয়ে আছে। অথচ, এই যমুনাই বৈষ্ণবদের কাছে শুধু নদী মাত্র নয় একটা বিরাট ভাববিগ্রহের রূপে সে রূপায়িত।

আজ তাজমহলের পাথর আর রংএর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আর ভালো লাগছিলো না। এর কারুকার্যের বিচার করার মতও মনের অবস্থা ছিলো না একে পথের ক্লান্তি তার উপর এমন রাত্রি। কাল দিনের আলোয় সে সব ভালো করে দেখা যাবে।

নিজের সুরজ্ঞান সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক থাকলেও প্রেমের সমাধি তীরে দুই এক ছত্র জিভের ডগায় গুন্‌গুনিয়ে গেলো। গানের অধিকার না থাকলেও শেকস্‌পীয়ারের সেই হত্যাকারীর অভিযোগ মাথা পেতে নিতে রাজি নই। মানুষের মহান্ জীবনের সুন্দরতম অভিব্যক্তি যে সুর আজ সেই সুরের জন্যে প্রবলতম আকিঞ্চন বোধ করছিলাম। যে জীবনে গানের সমাধি হয়েছে সে জীবন যে কতটা বিকৃত পঙ্গু এবং হতভাগ্য আজ জ্যোছনারাতে তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে সেটা স্পষ্ট অনুভব করলাম। আজ এমনরাতে তাজমহলকে উপহার দেবার যদি কিছু থাকে সে হচ্ছে সুর, মানুষের জীবনের মর্ম থেকে যা স্বতোৎসারিত হবে। কিন্তু জীবনের এই সুরহীনতার জন্যে দায়ী কে? বলতে পারতাম দায়ী সমাজ, দায়ী রাষ্ট্র, দায়ী পরিবার— কিন্তু আজকের এই স্বপ্নমদির রাতে আবার সমস্যা নিয়ে টানা হেঁচড়া করলে অনেক শিল্পী হয়তো ক্ষুণ্ণ হবেন সেকথাও চাপা থাক।

উদাসভাবে চারদিকে অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে সে রাত্রের মত তাজমহলের কাছে বিদায় নিলাম। এই আগ্রা যানেওয়ালে—টাঙা ওয়ালার

চীৎকার শুনে টাঙায় লাফিয়ে উঠলাম দু'জনে। আবার সেই ফুলের গন্ধ, ঘোড়ার খুরের শব্দ, তন্দ্রামগ্ন গাছের সারি, তমসা ঘন আগ্রার ফোর্ট, রেলস্টেশান এইবার বাজার। বাজারে এসে নেমে পড়লাম। আগ্রার রাতের বাজার নাকি দেখবার জিনিস। সত্যিই দেখবার জিনিস। বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করছে বাসন কোষন। রাস্তার মালিনীরা? ফুল নিয়ে বসে আছে—মোগল বাদশাহদের রাজত্বে যেমন করে বসে থাকতো। আজ এরা আছে কিন্তু, সেই শাহজাদীরা কই?

নানারকম জিনিসপত্রে আগ্রার বাজার জম্ জম্ করছে। শূন্য পকেটে এই অমূল্য বাজারের সত্যিইকার মূল্য বোঝা কঠিন। তাই, নেহাৎ দেখার চোখেই সে-সব দেখলাম। দেখতে দেখতে বহুদূর চলে গিয়েছিলাম। এবার সারাদিনের ক্লান্তি যেন দলবদ্ধভাবে হানা দিতে লাগলো। তাছাড়া ভোরে উঠেই তাজমহলে যাওয়া ঠিক হয়েছে। রেবতী বললে, ফেরা যাক। বললাম ফেরা তো যাক—কিন্তু, পথ ঠিক আছে তো?

রেবতী হাতে একটা চাপ দিয়ে বললো, চলুন তো—না হয় আগ্রার ফোর্টে গিয়েই আজকের মত বন্দী হওয়া যাবে।

হোটেলটা স্টেশানের কাছে ছিলো বলেই রক্ষে। পথ ভুল করতে করতে তবু পাওয়া গেলো। ক্লান্ত অবসন্ন ভাবে হোটেলে ঢুকলাম। বের হবার সময় দরজা জানালা ভালো করে পরীক্ষা করে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হলাম। জামাটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সটান বিছানার উপর লম্বা হয়ে পড়লাম। উঃ, কি আরাম না রেবতীবাবু মনে হচ্ছে বাড়িতেই আছি বা! রেবতীবাবু ভাবুক মানুষ উ বলে পাশ ফিরে শুলেন। ফুর ফুর করে হাওয়া আসছে। হাওয়াতেই যেন তাজমহলের গন্ধ। কাল খুব সকাল সকাল কিন্তু

উঠতে হবে বুঝলেন তো। সূর্য বেশ কিছুটা ওপরে উঠে না ডাকলে আপনি তো উঠেন না আবার! রেবতীর ওদিকে নাক ডাকতে শুরু হয়েছে এরই মধ্যে।

উঠতে বেশ বেলা হয়ে গেলো। উঠেই দেখি একজন লোক একটা বিরাট বোচকা ঘাড়ে নিয়ে ঢুকলো। মেঝের ওপর নিশ্চিন্ত ভাবে বসে সে একে একে মাটির শ্বেতপাথরের নানারকম লোভনীয় জিনিস-পত্র সাজিয়ে রাখতে লাগলো। লীজিয়ে বাবু যো আপকো মর্জি। এই তাজমহল মেরা চিজ হ্যায় বাবু আপকে লিয়ে এতনা মেহানৎ করকে লে আয়া!

যে আসে তাকেই বোধ হয় সে ওকথা বলে খুশি করবার চেষ্টা করে। ওর জিনিসপত্র দেখে শেষ পর্যন্ত সকালের আলস্য ভেঙে উঠতেই হলো। আগ্রা এসে ফিরছি কিছু জিনিসপত্র না নিলে অনেকেরই অভিযোগ শুনতে হবে হয়তো। বেছে বেছে কয়েকটা দোয়াতদানি, ধূপদানি পাখি ইত্যাদি কয়েকটা জিনিসের দাম দস্তুর করলাম। সবই নাকি শ্বেতপাথরের শেষে শুনেছি শ্বেতপাথরের বলে ও বেমালুম মাটির জিনিস চালিয়ে গেছে। মাটির জিনিসগুলো দু একবার দর হাঁকাহাঁকিতেই দিয়েছে। এক ধরনের জিনিসের দরে ও সহজেই রাজী হয়েছে আর এক ধরনের (সেগুলো শ্বেতপাথরের) জিনিস ও কিছুতেই রাজী হলো না আমাদের কাছে। শেষে এর রহস্য বুঝেছি।

ও যেতে না যেতেই আর একজন এসে হাজির। সে একেবারে নাছোড় বান্দা। আমাদের যে এখনই বের হতে হবে সে কথা গ্রাহ্য করে কে! ওর মত ও সাজিয়ে চলেছে ঠিক তেমনিভাবে। এ সেই তাজমহল দোয়াতদানি ধূমদানি সবই সেট। ওদিকে রোদ বেশ চাঙা হয়ে উঠেছে। আমরা এর মধ্যেই একে একে তৈরি হচ্ছে

নিয়েছি। উপরেই পায়খানা জলের বন্দোবস্ত সব আছে। কিন্তু এইবার এই দ্বিতীয় লোকটাকে নিয়ে হলো মুস্কিল। সে যে আমাদের ঘরে জিনিস নামিয়েছে অন্ততঃ সে জন্যও তার মান রাখতে হবে। শেষে অগত্যা বললাম, আমরা ফিরে আসলে যেন আসে তখন দেখা যাবে। আমাদেরও নাছোড়বান্দা অবস্থা দেখে সে অগত্যা জিনিস গুটাতে লাগলো। ওদিকে আর এক বিপদ। যে লোকটা স্টেশান থেকে আমাদের এনেছিলো সে সকালে উঠেই একবার ঘুরে গেছে বাবু কোথায় কোথায় যাবেন—ইৎমিউদ্দৌলা আগ্রাফোর্ট তাজমহল সব ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো আমার গাড়ি আছে কত দেবেন বলুন। জিজ্ঞেস করলাম, কত পড়বে সব শুদ্ধ খরচ। সে এমন একটা দর হাঁকলো যে অন্য সময় শুনলে নেহাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধই হয়ে যেতো—ভাগ্যিস এটা স্নিগ্ধ সকাল বেলা, আর মূল দ্রষ্টব্য পদার্থ তাজমহল আমরা দেখে এসেছি। শেষে সে দর করতে বললো। আমরা বললাম, ও ইৎমিউদ্দৌলা আমাদের দেখার দরকার নেই। তাজমহল আগ্রাফোর্ট দেখবো। ও শেয়ারে গেলেই চলবে। এ লোকটাও নেহাৎ মনোক্ষুন্ন হয়ে পড়লো। বললো আমি গাইড, কিছু পাবার আশা করেই আমরা যাত্রী আনি। তার করুণ মুখ দেখে দুঃখই হ'লো! কিন্তু, টাকা পয়সার ব্যাপার না হলে এ দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করতাম। কি আর করা যায়, গাইড এর বোঝা বইবার ক্ষমতা যে নাই! গাইড রাখা দরকার তো বুঝি! দু'জন মনোক্ষুন্ন হয়ে নেমে গেলো। দরজার তালা লাগাতে লাগাতে রেবতী বললো, সকালে উঠেই ভালো ল্যাঠা দেখি। সিঁড়ি দিয়ে নামছি হঠাৎ দেখি আর একজন ফেরিওয়ালা ঠিক তেমনি সাজেই সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। আমাদের দেখেই বললো, কী বললেন বাবু? একবার তাজমহল দেখবেন না, খাসা জিনিস ত নেই সে বোঁচকার গিঁটে হাত দেবার উপক্রম করলো। তার হাত

ধরে নিরস্ত করে বললাম রক্ষে করো ভাই—আমরা ফিরে আসি, তারপর দেখা যাবে। বলেই সটান পৃষ্ঠভঙ্গ দিলাম, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেও শুনছিলাম বিড় বিড় করে কী বলছে সে শুধু বাঙালী বাবু বাঙালীবাবু দুটো কথা বলে গেলো। এমন কুলাঙ্গার বাঙালীবাবু হয়তো তারা দেখে নি। হোটেলের বাইরে বেরিয়ে দেখি আর একজন শুধু ঢুকবার উপক্রম করছে। আমাদের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসুভাবে তাকালো। আমরা তখন প্রায় চোঁছা দৌড়। বাবারে বাবা আগ্রার এই পঙ্গপালের উপদ্রব থেকে তো বাঁচা যায় না! ফিরে এলে অদৃষ্টে কি আছে কে জানে, রেবতী হতাশভাবে বললো।

বললাম, আপনার জন্যেই তো শুধু এই দুরবস্থা! কোথায় ভোরে উঠাব কথা—কোথায় প্রায় আটটা বাজে।

টাঙা প্রায় তৈরিই ছিলো। রাতের সেই পথ দিয়ে আবার ছুটলো। রাতের জ্যোছনার আলোয় পথটাকে যেন রহস্যময় মনে হয়েছিলো। আগ্রাফোর্টকে যেমন ভাবগম্ভীর বলে মনে হয়েছিলো এখন কিন্তু তেমন কিছু মনে হলো না। এখন যেন বড় বেশি স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে। যে ফুলের গন্ধ কাল সারাপথ পেয়েছিলাম আজ দুই ধারে সেই গাছের সারি চোখে পড়লো। গাছগুলো খাটো খাটো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাজমহলের দর্শকদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। ইউরোপ আমেরিকা এমনকি সমস্ত পৃথিবীর কত বিশিষ্ট লোককে সে এমনিভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে।

যেটাকে কাল তাজমহল বলে ভুল করেছিলাম আজ তাকে দেখে দু'জনেই হেসে উঠলাম। লালচে ধরনের একটা মসজিদ সেটা তাজমহলের পাশে বলেই তার দাম কেউ দেয় না নইলে তারও দাম ছিলো।

আবার সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দিগন্তে ভেসে উঠেছে—কিন্তু, সে মাধুর্য

আর তার দেখতে পাচ্ছি না। চন্দ্রালোকের অস্পষ্ট আভায় সে এক অনির্বচনীয় রহস্যময় আভাস আমাদের চোখে তুলে ধরেছিলো। আজ সে বড় বেশি ব্যস্ত বড় সুস্পষ্ট। আজ তাকে দেখা যায় কিন্তু অনুভব করা যায় না। প্রতিভাশীল মানুষের চারপাশে রহস্য এবং অস্পষ্টতার আবরণ থাকে বলেই তাকে দেখে গাম্ভীর্যভরা শ্রদ্ধা মনের মধ্যে জাগে, তাজমহলের বেলাও অনেকটা তাই মনে হচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। জাহাঙ্গীর টুম্বের মত তাজমহলের চারপাশেও চারটে মিনার আছে। একটাতে গিয়ে উঠলাম। ওপর থেকে তাজ-মহলকে বেশ স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু, তাজমহলের সমস্ত সৌন্দর্য মাটি করেছে তার গম্বুজকে ঘিরে যে কাঠের জালের আবরণ রয়েছে সেটা। শুনলাম, তাজমহলের গম্বুজ নাকি মেরামত করা হচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়লো, ভারতীয় বিজ্ঞানের জুবিলী উৎসবে এসে যে হতভাগ্য ইংরেজ বৈজ্ঞানিক তাজমহলের গম্বুজ থেকে পড়ে মারা গিয়েছিলেন তাঁর কথা! দুর্ভাগা বৈজ্ঞানিক মমতাজের সমাধির মধ্যেই যে তাঁর আপন সমাধির রচিত হয়েছিলো তা তিনি ঠিক পান নি! হতভাগ্য বৈজ্ঞানিক অনুতত্বসন্ধানী সুক্ষ্ম মনেও তিনি তাজমহলের মৃত্যুক্ষুধার সন্ধান পান নি।

তাজমহল দেখে একই সঙ্গে কত কী মনে হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো :

> "Not goods nor gold nor glory of gods
> Not house nor hall nor lordly Pomp
> Not quiteful bargains treacherous bonds
> Nor feigning custom's hard decrees,
> Blessing in weal or woe Love alone can bring."

কখনও মনে হচ্ছিলো, নয়াদিল্লীর পীচের পথে যেরূপ চিহ্ন দেখেছি তাজমহলের গায়েও তারই প্রতিচ্ছবি। প্রেমের এই মহিমময় প্রতিকৃতির

পায়ে কত জীবন দেউলে হয়ে গেছে। কত লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষুধার আহার ছিনিয়ে নিয়ে এসে ব্যক্তিগত প্রেমের (শিল্প-খেয়াল) মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাজমহলের মর্মর-শুভ্রত্বে যেন তাদেরই কঙ্কালের আভাস পাচ্ছি। কঙ্কালের কান্নায় কান্নায় নিঃশব্দ সমাধি দেউল যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। যে কুড়িহাজার দাসের অমানুষিক পরিশ্রমে এই মন্দির সৌধ গড়ে উঠেছে একমাত্র চাবুক ছাড়া তাদের অতিশ্রমকাতর মুহূর্তে অন্য কোন প্রেরণা ছিলো না, আজ আকাশ-ছাওয়া সোনালী রোদ যেন তাদের অদৃশ্য আকিঞ্চনকে তাজমহলের রঙীন অলঙ্কারের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছে।

কখনও মনে হচ্ছিলো, তাজমহল Indo-Persian Architecture-এর শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ইতালিয়ান শিল্পীও নাকি এই কাজে নিযুক্ত হয়েছিলো। আন্তর্জাতিক শিল্প-সমন্বয়ের এমন প্রতীক আর কোথাও আছে কিনা জানি না। যে ওস্তাদ ঈসা এই শিল্পের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁর ওস্তাদীর পরিচয় তো সর্বত্রই পাচ্ছি। শিল্পের আঙ্গিক সম্বন্ধে জ্ঞান খুব সামান্যই এর ইতিহাসটুকুই শুনেছি। এর কাব্য-বর্ণনা পড়েছি। গল্প শুনেছিলাম, তাজমহলের গায়ে আঙুরের লতা আছে। এবং তাতে এমন ভাবে আঙুর চিত্রিত করা আছে যে পাখীরা ভুল করে এসে তাতে ঠোকরাতো। আজ দেখলাম, সেটা অধিকাংশ কাহিনীর মতই আজগুবি। তাজমহলের গায়ে লতা আছে বটে তবে তাতে আঙুরও নেই অথবা লতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যদি আঙুর আঁকা হতো তবে পাখীকুলের মধ্যেও এমন কেউ মূঢ় নেই (সম্ভবত) যে আঙুর মনে করে পাথরের গায়ে মাথা ঠুকরে মরতো। তাজ-মহলের গায়ের লতা পতাগুলো অবশ্য দামী পাথরের—অন্ততঃ এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে তাই দেখলাম আর লতাগুলো দেখেও তা মনে হলো—কিন্তু, মণি, চুনি পান্নার যে অপর্যাপ্ত সমারোহ ছিলো যা নাকি

অন্ধকার রাতে ঝিকমিক করে জলতো আলোর প্রয়োজন হতো না তার কোন নিদর্শন পেলাম না।

তাজমহল মোগল যুগের শিল্প। শিল্প-সমালোচকরা বলেন, এ যুগে Artists were mere sycophants of kings and Badshahs. Architecture gave way to ostentation-Vulgar marble and sandstones used, not austere granite. Painting degenarated into mere Portraiture representing the endless stiffness of the courts, not the careless gaiety of the folk. অতশত বুঝি না বুঝি তাজমহল দেখে এইটুকু অন্ততঃ বোঝা গেলো জনগণ থেকে শিল্প বহু উঁচুতে জটিল এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যের জগতে উঠে গেছে। এ যুগে শিল্পীরা রাজা-বাদশাহের চাটুকার হোক বা না হোক জনসাধারণের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ (অন্ততঃ শিল্পবিষয়ে) ছিলো কিনা সন্দেহ। তাজমহল যেন একটা গম্ভীর ভাববাহকে সৃষ্টি বুদ্ধির বাঁকা জটিল এবং কুটিল পথে এর গতি জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোচ্ছাস (যা বৌদ্ধযুগের শিল্পের বৈশিষ্ট) এর কোন প্রকাশ নাই এতে। জনগণের ওপর শাসনের সদর্প ভঙ্গিতে যেন এ দাঁড়িয়ে আছে।

এই গেলো তাজমহলের আর এক দিক কাল জ্যোছনা রাতে তাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। একাধারে শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতির সমন্বয় তাজমহলের মধ্যে ঘটেছে। নিজস্ব দৃষ্টি অনুযায়ী যে যেভাবে একে দেখে থাকে আবার সবরকম দৃষ্টি কোন একই লোকের মধ্যেও থাকতে পারে। এবং এই দৃষ্টি কোনই পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি কোন বস্তুর বিচারের পরিপূর্ণ মাপকাঠি।

এইবার আসল যেটা যাকে উপলক্ষ্য করে এই সমাধি মন্দিরের সৃষ্টি সেই মমতাজের সমাধি দেখবার জন্যে ভেতরে ঢুকলাম। সিঁড়ি বেয়ে

ভূগর্ভে খানিকটা নেমে যেতে হয়। অন্ধকার অন্ধকার ভাব। রেবতীকে কি একটা কথা বলতে গিয়ে দেখি চারদিক থেকে গুম্ গুম্ করে গম্ভীর আওয়াজ উঠলো। কেমন একটা ভাব গম্ভীর ভাব মনের মধ্যেই এসে গেলো। কেমন ফুলের স্নিগ্ধ গন্ধে বাতাস বিভোর। মাঝখানে দুটো শ্বেত পাথরের সমাধি স্তূপ—শুনলাম একটা মমতাজের আর পাশেরটা শাজাহানের। দর্শকরা অনেকে সুগন্ধি ফুল সেই স্তূপের ওপর রাখছেন। ফিসফাস শব্দগুলো গুম্ গুম্ করে উঠছে। এখানে জোরে কথা বলতে গিয়ে কেন যেন আপনিই স্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। চারদিকের আবহাওয়ায় যেন একটা থমথমে স্তব্ধতা জড়ানো তাই ভাষা আপনিই থমকে যায়। ওইখানে মমতাজ শুয়ে আছেন বাদশাহী হারেমে ধূপশিখার মতই যিনি একদিন রহস্যাচ্ছন্ন ছিলেন, আজ পৃথিবীর অনাবৃত দৃষ্টির সামনে তিনি তেমনি রহস্যাচ্ছন্ন হয়ে আছেন। যাঁর কণ্ঠের সুরে একদিন প্রেমিক শাজাহান বৃহত্তর উপলব্ধির মধ্যে তন্ময় হয়ে যেতেন আজ সেই কণ্ঠের সুর নিথর হয়ে গেছে। চিরস্তব্ধতার সীমান্ত থেকে মমতাজের সুর আর ভেসে আসতে পারবে না কোনদিন। শাজাহানও আজ সেই সীমান্তেরই অধিবাসী। চিরশান্তির তুহিন স্তব্ধতা যে জীবনে আজ ঘিরে রয়েছে সে জীবনে জীবন নেই, যৌবন নেই, তাজমহল নেই—চঞ্চল জোনাকীর আলোর পাখায় জীবন সেখানে মদির হয়ে উঠে না। মমতাজের সমাধি তীরে দাঁড়িয়ে যেন সে জীবনেরই আভাস পাচ্ছি। ঝর ঝর করে গোলাপের পাঁপড়িগুলো ঝরে পড়লো। ধিক্ ধিক্ করে প্রদীপের শিখা জলছে। কেমন এটা অদ্ভুত মনোভাব নিয়ে উপরে উঠে এলাম।

তাজমহলের কম্পাউণ্ডটা কী বিরাট! কতরকম গাছপালা দিয়ে চারদিক সাজানো দেখে অবাক হচ্ছিলাম। বন্য যমুনা নদী একদিন

নিরাভরনা আদিমতায় বালুচরের গান শুনতে শুনতে বয়ে গেছে। মানুষের স্নেহস্পর্শে আজ তার গায়ে অনবদ্য আভরণ উঠেছে। নিরা-ভরনা যমুনার আজ রিক্ত বিলাপ নেই পূর্ণতার আনন্দে আজ সে উচ্ছ্বসিত। লতা পাতায় ফুলে ফলে যেন সে উচ্ছাস অভিব্যক্তি পাচ্ছে।

ঐতিহাসিক বিবরণ জানতে পারলে তাজমহল আরও উপভোগ্য হতে পারত কিন্তু, সে বিবরণ দেবার মত শিল্পীর সেদিন সৃষ্টি হয় নি—হয়েছে কিনা তা অবশ্য জানিনা তার পরিচয়ও পাই নি। তাই, ফাঁকা মন নিয়েই চারদিকে ঘুরলাম। তাজমহলে যে আছি এই অনুভূতিটাই যেন সবচেয়ে বড় হয়ে উঠলো। পরিবেষ্টনী সহ তাজ-মহলের একটা অখণ্ড ছবি মনের মধ্যে পুরে রাখার চেষ্টা করেছিলাম অনেকক্ষণ থেকে। যদিও জানি সে স্মৃতি একদিন অস্পষ্ট হয়ে যাবে।

এবার তাজমহলের কাছে বিদায় নেবার পালা। তাজমহলকে এমন মুখোমুখি দেখার সুযোগ আর কোনদিন পাবো কিনা জানিনা কিন্তু জানি কোন এক উতলা বাসন্তিক রাতে কালকের সেই জোছনা রাত্রির স্মৃতিটুকু, আজকের এই সোনালী সকালের শ্বেত সবুজ ছবি তারায় ছাওয়া আকাশের গায়ে ফুটে উঠবে। যেদিন ফাগুনের পলাশ আগুন ঢেলে দেবে শূন্যের গায়ে গায়ে সেদিন যমুনার এই শ্বেত আভরণ হয়তো মনের কোন্‌কে নতুন করে রঙীন করে দেবে—সেদিনও তাজমহল এমনই শ্বেত নীরবতায় যমুনার পারে দাঁড়িয়ে থাকবে। আবার এমন দিনও আসবে যেদিন আমি থাকবো না কিন্তু যমুনার তীরের এই নিঃশব্দ সমাধি মন্দির শিল্পী প্রেমিকের অনির্বান প্রেরণা হয়ে এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেদিন হয়তো আজকের অধিকারহীন মজুর চাষীর দল যারা মানুষের এই মহামূল্য অবদান থেকে আজ বিচ্ছিন্ন—এই শিল্প পীঠে আনাগোনা করবে। তাজমহলের

সত্যিকার সার্থকতা সেই দিনই। যাওয়ার সময় এই কথাটাই বেশি করে মনে হচ্ছিলো যেন, তাজমহলের চারধারে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, অধিকাংশ মানুষের সেই কাঁটা তার ডিঙোবার অধিকার নেই। আগামীকালের ঝড় এই জীর্ণ কাঁটাতারের বেড়াকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যাবে। ঝড়ের গোঙানি উঠেছে পূবে, পশ্চিমে, মধ্যে, প্রাচ্যের এই অংশেও তার প্রতিধ্বনি শোনা যাবে তার আভাসও তো আজ পাচ্ছি।

সমাধিস্থ আগ্রা ফোর্ট

তাজমহল থেকে বেরলাম। এবার অন্য একটা পথে। শেষে মনে হয়েছিল, ভাগ্যি এই পথে বেরিয়েছিলাম নইলে আগ্রার একটা শ্রেষ্ঠ জিনিস দেখা অসমাপ্ত থেকে যেত। দেখলাম সারি সারি ঘর। তার মধ্যে আমাদের হোটেলে যে সব জিনিস নিয়ে ফিরিওয়ালারা হানা দিয়েছিলো সেই সব জিনিসে একেবারে ভর্তি। শুনলাম, ওসব জিনিস এখানেই তৈরি হয় এখান থেকেই দিগ্বিদিকে ছড়ায়। এক তাজমহলেরই কত সংস্করণ—একেবারে ছোট্ট থেকে আরম্ভ করে বড় বড় তাজমহল সাজানো রয়েছে। আরও কত কি সুন্দর সুন্দর জিনিস। এত লোভ হচ্ছিলো দেখে শুনে। এত ছোটর মধ্যে তাজমহলের সুস্পষ্ট অনুকৃতি এই সব হস্তশিল্পীদের কম দক্ষতার চিহ্ন নয়। এখানে এটা নাম করা কুটীর শিল্প। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে চোখ সার্থক করলাম। অনেক খরিদ্দার এসে দাম দস্তুর করছে। তাদের পোশাক দেখে স্বতন্ত্র জগতের লোক বলে মনে হয়। দাম করার ধরন দেখেও সেই স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী বলেই মনে হয়। ...থাক্ কিনি আর না কিনি দেখে চোখটা তো সার্থক করা গেলো। আর বেশি দেরী করার উপায় ছিলো না আগ্রার ফোর্ট দেখা এখনও বাকী। এবার আর টাঙায় নয় হেঁটেই যাবো ঠিক করেছি। দোকান থেকে বেড়িয়ে চলতে গিয়ে দেখলাম তাজমহলের লাগালাগি বেশ বড় একটা বস্তি একরকম অদৃশ্যভাবেই রয়ে গেছে। প্রধান দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে এর অস্তিত্ব ঠিকও তো পেতাম না। বস্তীর

লোকজন চলাফেরা করছে। চেহারা আদব কায়দা দেখে যেন বাদশাহী বংশধর বলে মনে হয়। একজন লোক একটা ময়নাকে আদর করছে। বাঙালী ময়না এখানে দেখি দিব্বি আগ্রাওয়ালা হয়ে উঠেছে, পাঞ্জাবে হয়তো সে পাঞ্জাবী হয়ে উঠবে। পথ জিজ্ঞেস করতে করতে বস্তীর জাঙ্গাল থেকে মুক্তি পেলাম।

সেই পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি—দু'ধারে সেই গন্ধওয়ালা ফুলের গাছের সারি। তখনও সকালবেলাকার স্নিগ্ধতা একেবারে ফুরিয়ে যায় নি—তাই পথ চলতে ভালই লাগছিলো—অভদ্র স্যাণ্ডেল জোড়া মাঝে মাঝে বিরক্ত করছিলো শুধু। এই এই—বলতে বলতে টাঙাওয়ালা টাঙা হাঁকিয়ে চলেছে। চলতে চলতে অনেক্ষণ পরে বাঁ ধারে দেখি লেখা রয়েছে Victoria Garden. যাক, পায়েরই জিৎ হলো—টাঙায় গেলে আর এটার অস্তিত্ব টেরও পেতাম না। ঢুকলাম, Victoria Gardenএ। দেখবার বিশেষ কিছু ছিল না। রাণী ভিক্টোরিয়ার একটা মর্ম্মর মূর্তি রয়েছে। গাছ পালা উল্লেখ যোগ্য কিছু নয় অন্ততঃ লাহোরের লরেন্স-গার্ডেন দেখা চোখে সেটা একেবারে বিশেষত্বহীন বলেই মনে হলো। তবু দেখার জন্যে দেখা। বিদ্রোহের হাত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বাঁচাবার জন্যে ভিক্টোরিয়ার ভারতবর্ষের জন্যে কিছু কিছু অধিকার ঘোষণা করেছিলেন বটে এবং রাণী ভিক্টোরিয়ার উদারতা সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন মহলে একটা শ্রদ্ধা এবং প্রীতি মিশ্রিত ভাব আছে তাও সত্যি কিন্তু, আমার চোখে রাণী ভিক্টোরিয়া সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই মনে হলো না। তাই Lawrenceএর নামে লাহোরের ভারতবাসীর বুকে যে লজ্জা গেঁথে দেওয়া আছে, আগ্রার এই ভিক্টোরিয়ার মর্ম্মর মূর্তিও বুকের মধ্যেকার তার এক লজ্জাকর ব্যথার সাক্ষী বলেই মনে হলো। তাজমহল দেখা সাধ তৃপ্তি যেন ঘা খেয়ে মুসরে পড়লো।

এইবার আগ্রার ফোর্ট। আকবরের রাজধানী, শাজাহানের দুর্গ-প্রাসাদ, সেলিমের অভিষেক আওরঙ্গজেবের বিজয় কীর্তি—সব যেন একসঙ্গে মনে করিয়ে দিলো সামনের এই উন্নত লাল প্রাচীরের সারি। এবার একজন Guide-এর সাহায্য না নিয়ে আর পারা গেলো না। আট আনায় বন্দোবস্ত হলো। দিল্লীর রেডফোর্ট থেকেও নাকি আগ্রা ফোর্টে দেখবার বেশি কিছু আছে। আমার কৌতূহল ছিলো সবচেয়ে বেশি দেওয়ালে গাথা ছোট কাঁচের ওপর যেখানে বসে জাহানারা সেই কাঁচের ভেতর দিয়ে তাঁর বন্দী বাপকে তাজমহল দেখাতেন। Guide ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের সব দেখাতে লাগলো। তার মুখ দিয়ে খই ছুটছে। সেও ইতিহাস শিখেছে। ছোটবেলায় আমরা ইতিহাস শিখেছি প্রাণের দায়ে—আর এ-ও ইতিহাস মুখস্থ করেছে পেটের দায়ে। তোতাপাখীর রাম নামের মত এর মুখে ইতিহাস শোনাচ্ছিলো। হয়তো ইতিহাসের শেখেই নি কিছু শুধু আগ্রা ফোর্টের দর্শনীয় জিনিসগুলোর একটা বিবরণ গলাধঃকরণ করে রেখেছে। দর্শকের কাছে সেগুলো উগরাতে উগরাতে আজ আর একটুও বাধে না। অনর্গল বলে যায়। সে বলাগুলো যেন প্রাণহীন—কেননা জ্ঞানের জন্যে তো সেসব শেখা হয় নি। শুনেছি অন্যান্য দেশে ভালো ভালো শিক্ষিত লোক Guide-এর কাজ করে থাকেন। খুবই ভালো সেটা—আমাদের দেশেও সেটা করা যায় না কী? বোধ হয় যায় না—তাহলে পুলিশ পোষার অর্থ আসবে কোত্থেকে।

ঘুরতে ঘুরতে মনে হলো শিবাজী তো এই আগ্রায়ই বন্দী হয়েছিলেন। সন্দেশের ঝুড়ির মধ্যে থেকে তিনি আওরঙ্গজেবকে এখান থেকেই তো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে পালিয়েছিলেন। শৈশবের এ গল্পটা কিন্তু আজও বেশ মনে আছে—অথচ ইতিহাসের অধিকাংশই আজ ভুল হয়ে গেছে। ইতিহাসের সঙ্গে কাহিনীর এইখানেই তো পার্থক্য। মনে আছে

মাষ্টার মশাই একবার "On the death of Kutabuddin" ধরিয়ে দিতে পারলেই কি ভাবে শেষ পর্যন্ত অনর্গল বলে যেতে পারতাম। শুধু ধরিয়ে দেবার অপেক্ষা। আজ কিন্তু, সেসব একেবারে ভুলে মেরেছি—কেবল, যেটা কোনদিন মুখস্থ করিনি আজ সেটাই সবচেয়ে মুখস্থর মত মনে হচ্ছে। শিবাজীকে বন্দী হিসেবে যে জায়গাটার কথা কল্পনা করতাম, মিলিয়ে দেখলাম, সে জায়গাটার সঙ্গে আগ্রার ফোর্টের কোন মিল আছে কিনা।

এখানেও সেই দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস রয়েছে। একটা জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলাম, Guide দেওয়ালের দিকে নির্দেশ করে দেখালো ওই যে কাঁচ দেখছেন বাবুজী...ব্যস আর বলতে হলো না। এই কাঁচের কথাই তো এতক্ষণ ভাবছিলাম। লাফিয়েই প্রায় কাছে গেলাম। একটুকরো ছোট্ট গোল কুঁচি দেওয়ালে গাঁথা। তার মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম' ছবির মত তাজমহল তার মধ্যে ফুটে উঠেছে। এমনিভাবেই বসে বসে বন্দী শাজাহান তাঁর প্রাণপ্রতিমা দয়িতার মর্মর স্মৃতি একদিন দেখতেন।* হতভাগী জাহানারা, একজন রক্তপিপাসু সম্রাটের (হোক্ না সে বাপ) সেবার জন্যে আজীবন কুমারী জীবন যাপন করে গেছেন। শাজাহান বন্দী হয়ে এই এলাকাটায় বাস করতেন—আর জাহানারা তাঁর শেষ দুঃখপূর্ণ জীবনের কাণ্ডারী হয়ে ছায়ার মত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছেন। এই পাষাণ ফলকে একটা ঝরা যৌবনের নিষ্প্রভ পাঁপড়ির দাগ যেন দেখতে পেলাম।

* অবশ্য কাঁচের মধ্য দিয়ে তাজমহল দেখবার কোন প্রয়োজন ছিলো না—কন না, খালি চোখেই তাজমহল বেশ দেখা যাচ্ছে—অবারিত শূন্যে ছবির মত তাজমহল মাথা উঁচু করে রয়েছে।

Guide একটা জায়গা দেখিয়ে বললে, এইখানে বন্দী শাজাহান বসে বসে দর্শনপ্রার্থী প্রজাদের দর্শন দিতেন। একেই আগ্রাফোর্ট এক কারাগার—তার ওপর তারই মধ্যে আর এক ছোট্ট কারাগার সৃষ্টি করা হয়েছিলো। মোগল যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্প রসিক সম্রাটকে এমনি অসুন্দর—নিরানন্দময় জীবন সন্ধ্যা অতিবাহিত করতে হয়েছে এখানে। জীবনের এই জোয়ার ভাটাই তো স্বাভাবিক নিয়ম। ক্ষমতালোভীরা সেকথা ভুলে যায় বলেইতো তাদের দুঃখ এত নিবিড় হয়ে ওঠে।

শাজাহানের মতি মসজিদ কাছেই ছিলো—বন্দীর এলাকার মধ্যেই। মতি মসজিদ ছোট্ট হলেও ছবির মত সুন্দর। ধবধবে মার্বেল পাথরে আগাগোড়া মোড়া। এখানে সাজাহান নামাজ পড়তেন। মতি মসজিদ যেন একেবারে আনকোরা নতুন ব'লে মনে হচ্ছে—বিধ্বংসী মহাকাল তার কোন ক্ষতিই ক'রতে পারে নি। শাজাহানের বন্দী জীবনের আট বছর এইভাবেই এই মতি মসজিদ আর ওই কাঁচের কেয়ারীতেই কেটেছে। একদিন যাকে কুনিশ করতে পারলে যারা নিজেকে সৌভাগ্যবান ব'লে মনে করতো আর একদিন তাদেরই ওপর হয়তো বৃদ্ধ অন্তরীণ সম্রাটের খবরদারীর ভার প'ড়ছে। ইতিহাস বেশ রসিক!

আগ্রা ফোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে পরে শুনেছিলাম—আগ্রা থেকে দিল্লী পর্যন্ত নাকি মাটির তল দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ আছে—Guide কে কিছু বাড়তি পয়সা দিলে সেই সুড়ঙ্গের ভেতর নিয়ে যায়। এমন একটা জিনিস miss করেছিলাম ব'লে সেদিন আফশোষ হ'য়েছিলো। আর একটা জিনিস দেখেছিলাম সেটা আগ্রা ফোর্টে না লাহোর ফোর্টে ঠিক মনে ক'রতে পারছি না। বেগমদের পায়খানা। বেগমরা রাতে পায়খানা গেলে বাইরে আলো রাখলেই পায়খানার ভেতরে প্রতিবিম্বিত হ'তো—পায়খানার দরজার মাথায় এক ধরনের স্বচ্ছ পাথর (?) বসানো। এটা দেখার জন্যে ফোর্টের রক্ষীদের কিছু দিতে হয়েছিলো।

আগ্রা ফোর্টের মধ্যেই একটা স্থানীয় হস্তশিল্পের প্রদর্শনী আছে সেখানেও সেই সব তাজমহল প্রভৃতি আগ্রার বিশিষ্ট কতকগুলো জিনিস আছে। ইচ্ছে ক'রলে কেনাও যায়—কিন্তু, ইচ্ছে করবার মত উপায় আমাদের ছিলো না। উপায় থাকলে তো রোল্স্ রয়েসেই আগ্রার গ্যেটে এসে পৌঁছতাম ধুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে এখানে এমন ক'রে আসতে হ'তো না।

আগ্রা ফোর্ট যখন দেখা শেষ হ'লো তখন বেলা অনেক হয়ে গেছে। বাদশাহী মেজাজের মত সূর্যের মেজাজ এখানে বড়ই কড়া। সামনে বেরতে ভয় হয়। সেই লু এর আতঙ্ক। রোদ্দুর মাথায় করেই ফিরলাম। কাছেই হোটেল।

বিশ্রাম ক'রে স্নান ক'রে খেতে যাওয়া গেলো। খাবার ঘরে দেখি কয়েকজন বাঙালী ব'সে খাচ্ছেন। আমাদের কথাবার্তা শুনে ভরসা পেয়ে আলাপ ক'রলেন। একজন বললেন, মশাই, আর ব'লবেন না-চন্দৌসী থেকে আসছি। রুটি খেতে খেতে প্রাণ বেরিয়ে গেলো আজ কত দিন পরে ভাত পেয়ে প্রাণটা ঠণ্ডা হ'লো!

ব'ললাম, আসছেন চন্দৌসী থেকে তবে রুটি ছাড়া আর কি পাবেন সেখানে! নিউক্যাস্‌ল্ থেকে এসে যদি বলেন, কয়লার গুঁড়োয় প্রাণ অস্থির—তবে চ'লবে কেন। চন্দৌসী আটার বিজ্ঞাপন তো খবরের কাগজওয়ালাদের কৃপায় অভাব বোধ করেন নি নিশ্চয়ই!

কালো মত ভদ্রলোকটি চুলের টেরীটা ঠিক ক'রতে ক'রতে ব'ললেন আরে দাদা, বিজ্ঞাপন দেখা এক কথা আর সেখানে সেই আটার দেশে গিয়ে থাকা আর এক কথা।

ব'ললাম সে কথা ঠিক, তবে আমাদের কাছে কিন্তু এদেশে এসে ভাতের চেয়ে রুটিই ভালো লাগছে বেশি! ভদ্রলোক ব'ললেন, অল্প দিন কিনা—

পাশের ঘরে রুটি তৈরি হচ্ছে, গরম গরম রুটি হ'চ্ছে ; সেই রুটি আমাদের পাতে পরতে তিনটে স্তর অতিক্রম করছে। ১নং লোক রুটির লেচী বানাচ্ছে, ২নং লোক বিদ্যুৎগতিতে সেটা তৈরি করছে আব তৃতীয়জন আনবিক গতিতে সেটা দিয়ে যাচ্ছে। সত্যিই এখানকার রুটি খুব চমৎকার।

খেয়ে দেয়ে খানিকক্ষণ গড়াগড়ি দিয়ে নেওয়া গেলো। আগ্রা দেখা শেষ হ'য়েছে—অবশ্য, শেষ হ'য়েছে ঠিক নয় তবে আমাদের পক্ষে শেষ হ'য়েছে। ইতমদ্দোলা ফতেহ্পুর সিক্রী (আকবরের নিজস্ব তৈরি শহর) না দেখেই ফিরছি। ফতেহ্পুব সিক্রী! যে শহর একদিন লণ্ডনের চেয়েও বড় ছিলো (বিদেশী পর্যটকের মতানুযায়ী) তাকে না দেখে ফিরে যাওয়া সত্যিই ক্ষোভের। কিন্তু, সর্বহারা হওয়াটা তো তার চেয়ে ক্ষোভের! টাঙায় চড়ে তাজমহল আর আগ্রা ফোর্টে যে ক্ষোভের আংশিক নিবৃত্তি ক'রতে পেরেছি—কজন সর্বহারার ভাগ্যেই বা তা ঘটে! এই টুকু তৃপ্তি নিয়েই এবার আগ্রা থেকে ফিরে যাবো। আগ্রার ক্ষুধা একেবারে মেটানো সঙ্গত নয়—ইতমদ্দোলা আর তাজমহল সে ক্ষুধাকে জাগিয়ে রাখুক।

বিকেল পাঁচটায় রেবতীব ট্রেন—সে বাংলা মুখো ফিরবে। আর, বিকেল ছটায় আমার ট্রেন—আমি ইন্দোর মুখো পাড়ি দেবো। লাহোব থেকে যে বিচ্ছেদ শুরু হ'য়েছে এবার তার চূড়ান্ত পরিণতি। বেবতীর রওনা দেবার আগে আবার দুজনে আগ্রার বাজারে ঘুরে এলাম। ভালো কথা, সেই ফিরিওয়ালার দল কিন্তু আমাদের ছাড়েনি—তারা জোঁকের মত আমাদের পেছনে লেগেই আছে। আরও কত নতুন নতুন ফিরিওয়ালা এসে এসে ঘুরে গেছে—আমাদের এক গুঁয়েমির কাছে তাদের একগুঁয়েমি পরাজিত হ'য়েছে। তবু তাদের আসার বিরাম নেই।

এইবার রেবতীকে ট্রেনে উঠিয়ে দেবার জন্যে স্টেশনে রওনা দেওয়া গেলো। গাড়ি এখান থেকেই ছাড়ে। ই, আই, আর-এর সবুজ ট্রেন খানা প্লাটফর্ম জুড়ে রয়েছে। বেশ ফাঁকা গাড়ি। আগ্রা থেকে টুণ্ডলা লাইন তাজমহলের মতই আনন্দদায়ক।

গাড়ি ছাড়ার দেরি ছিলো। ফিরিওয়ালাদের উৎপাতে সকাল সকালই আসতে হ'য়েছে। এদের কথা মনে ক'রে দুজনেই হাসছিলাম খুব। রেবতী হাসতে হাসতে ব'ললো, বাবা, শুনেছিলাম গয়ার পাণ্ডার কথা আর দেখলাম এই ষণ্ডামার্কা আগ্রার ফিরিওয়ালার কাণ্ড। জোঁক আর কতটা একগুঁয়ে-হুঃ!

হাসতে হাসতেই বললাম, বারো আনা ঘরের সুখের তেরো আনা সুখই ওরা আদায় করে নিয়েছে।

রেবতী বললো, তবু বারো আনার ঘর—সত্যি এত সস্তায় ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে ভাবতেই পারিনি—তাও আবার স্টেশানের কাছে।

সত্যি!

এঞ্জিনের ধাক্কায় গাড়ির মধ্যেকার লোকজন টলমল করে উঠলো। তাকিয়ে দেখলাম প্লাটফর্মের ঘড়ির কাঁটাও গাড়ি ছাড়ার মুহূর্তের কাছাকাছি প্রায় হাজির হয়েছে। ছুটবার আগে এঞ্জিন দম নিচ্ছে। যে প্লাটফর্ম এতক্ষণ নির্জীব, নিশ্চেতন হয়ে পড়ছিলো সেই প্লাটফর্মে কর্মচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে সবার চোখের মনিতে ব্যস্ততার আভাস। ফিরিওয়ালারা চালকুমরোর মোরব্বা বোঝাই খাবারের বাক্স নিয়ে ছুটোছুটি করছে। Kinetic energy এবার Potential energy হয়ে উঠেছে। বাইরে এসে রেবতীর জানালার কাছে দাঁড়ালাম। হুইসেল-এর সঙ্গে সঙ্গে গার্ডের হাতে সবুজ নিশান উড়ছে। এইমুহূর্তটি বড় সাংঘাতিক। বন্ধুজনকে বিদায় দিতে যারা আসে তাদের কাছে বিশেষতঃ। ওই যে সামনে যে লোকটি বসে এখনও বিদায়ের হাসি হাসছে আর

এক মিনিট পরে হাজার মাথা কুটলেও তাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। মৃত্যু এসে যখন জীবনকে নিয়ে যায় তখনও কতকটা এমনিই মনে হয়। গাড়ি motion দিলে একটু বিষাদের সুরে বললাম—একসঙ্গে অনেক কটা দিন সুখে দুঃখে পাড়ি দেওয়া গেছে দিল্লীর সেই অবাঞ্ছিত মুহূর্তটির কথা ভুলে যাবেন রেবতী বাবু! রেবতী বাবু তখন দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন—তবু তাঁর প্রসন্ন হাসির আড়ালে যেন আত্মার গভীর সান্নিধ্য অনুভব করলাম। রেবতী বাবুকে আর পাওয়া যাবে না ওই আঁকাবাঁকা ট্রেণ তাঁকে নিয়ে উধাও হয়েছে।

কতকটা আচ্ছন্নের মতই হোটেলে ফিরে এলাম। এবার সম্পূর্ণ একা নিঃসঙ্গ—বঙ্কিমবাবু সেই উৎসব মুখর ভিড়ের মধ্যে কি এর চেয়েও বেশি একা বোধ করেছিলেন। হোটেলে ফিরে দেখলাম, আমি সম্পূর্ণ একা নই আমার সেই ফিরিওয়ালারাই আছে এবং দিব্বি জাঁকিয়ে বসে আছে। ফিরতেই বিজ্ঞের মত হাসি হেসে বললো,—মেরে খেয়াল্ সে বাবুজী, আপকো জানেকো থোড়া দের হায়। দোস্ত তো আপকা চলা গিয়া! আপকো মেহেরবাণী বাবুজী, থোড়া খেয়াল করকে দেখনা বাবুজী, আপকা লিয়ে সির্ফ আপকো লিয়ে এহী আচ্ছা তাজমহল ঠো লে আয়া।

বুঝলাম এরা এর মধ্যে খবরও যোগাড় করেছে, আমার খাবার দেরি আছে। বাব্বাঃ সামুয়েল হোরও বোধ হয় রুষ দেশে গোয়েন্দাগিরী করে এমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি! মনে পড়লো সেই ইন্সিওরেন্সের Canvasser-এর কথা যিনি শেষ পর্যন্ত নিজের মাথা ফাটিয়ে ফৌজদারী ভয় দেখিয়ে একজন নাছোরবান্দা লোককে দিয়ে ইন্সিওর করিয়েছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ আমি ওকে দিলাম না কেননা, insurance এর Canvasser একজনই ছিলেন আর এখানে ফিরিওয়ালা দলে দলে।

একবার রক্তের স্বাদ পেলে রক্ত চোষা হাঙ্গরের মত দলে দলে হানা দেবে তাই, কোনদিকে না চেয়ে সোজা ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে শুয়ে পড়লাম। মনটা ভালো ছিলো না। রেবতী নাই বড়ই নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। জীবনের সেই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা আবার কিছুদিনের মত কাঁধে ভর করলো।

হোটেলওয়ালাকে বিল পাঠিয়ে দিতে বললাম। বিল শোধ করা হয়ে গেলো। একরাত্রির এই ঘরখানাতে আবার আমারই মত আর একজন ভবঘুরে হয়তো আর এক রাত্রির মত এই ঘরের মালিক হবে। আমার মত সবাই ভেবেছে, একরাত্রের ঘরের মালিক আমি! এমনই অসংখ্য ভবঘুরের খণ্ড অধিকারই এ ঘরের গায়ে লেখা রয়েছে যেন। ট্রেনের আর দেরি ছিল না। যাবার আগে সীরাম (স্টেশান থেকে যে লোকটা আমাদের নিয়ে এসেছিলো) একবার এসে ঘুরে গেলো বলে গেলো বাবু আমার কিছুই লাভ হলো না। আমি গাইড এর কাজ করি, হোটেলে লোক এনে তুলি, তাঁরা guide রাখবেন তা বলেই সে থেমে গেলো। ওর বিষাদ আঁকা মুখখানার দিকে চেয়ে বড়ই দুঃখ হলো। বললাম, গিয়াসীরাম, তোমার নাম আমি লিখে নিয়ে যাচ্ছি—আমার বন্ধু বান্ধব সবাইকে তোমার নাম বলবো যাতে তাঁরা কেউ এলে তোমাকে গাইড রাখে। ওর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললো আচ্ছা বাবু সাহেব সে আপনার মেহেরবাণী। ভালো করে লিখে নিবেন, ভগবান হোটেল, গিয়াসীরাম, আগ্রা ফোর্ট। বলেই সে চলে গেলো। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললো, বাবুজী আপনার গাড়ির টাইম হয়ে গিয়েছে। গিয়াসীরাম সত্যিই ভদ্র, কেমন নম্র কথাবার্তা।

ইন্দোর-মুখো

হোটেল থেকে নামবার সময় দেখলাম রুটি তৈরির department এর কাজ আবার পুরোদমে শুরু হয়েছে। নেতী তৈরিওয়ালা, রুটি সেঁকাওয়ালা, রুটি পরিবেষক কেউই কাউকে হারাতে পারছে না। —সালাম বাবু সাহেব আরে এতনা জলদী কাহেকো—গাড়ি ছোড়নেকো ...তাকিয়ে দেখি সেই ফিরিওয়ালা মুখে তেমনি বঙ্কিম হাঁসি। দেখি সে আবার ঝোলাঝুলি খুলবার উপক্রম করছে। ফিরে দাঁড়িয়ে স্নিগ্ধভাবেই বললাম—মাপ করন' ভাই—মেরেকো আভিঃ জানেকো জরুর হায়! বলেই সটান লম্বা। এবার ফিরিওয়ালার হাত থেকে হয়তো শেষ পরিত্রাণ পেলাম। দূর থেকে ফেরিওয়ালার কথা ভেসে এলো—বাবাঃ, ইঃ বাঙ্গালীবাবু বড়া কড়া বাবু হায়! সত্যি, বড় কড়া বাবুর পাল্লায়ই লোকটা পড়েছিলো। বাবুজী?—ফিরে দাঁড়িয়ে দেখি এক কুলি। বললো, সামান আপকো...বুঝলাম মাল নিতে চায়। সবাই বাঙ্গালী বাবুর কাছে কিছু আশা করে—চারদিকেই চরম আকিঞ্চন। এই অকিঞ্চনসমুদ্রে আমিই কি দ্বীপ? ছেঁড়া স্যাণ্ডেল জোড়াও কি আমার পরিচয় দিতে পারছে না! বুঝলাম, এরা কৃপার পাত্র!

ট্রেণে খুব ভিড় ছিলো না! আরামেই বসা গেল কিন্তু, নিশ্চিন্ত মনে নয়—আবার ট্রেণ বদলের পালা আছে বেয়ানা জংসনে। ঠিক এই ভাবেই যদি পাড়ি দিতে পারতাম তবে ভ্রমণটা বেশ ভালই হয়েছে বলতে পারতাম। আগ্রাফোর্ট পেছনে ফেলে গাড়ি সর্পিল

গতিতে এগিয়ে চললো। একটা দিনের ভিড়-করা স্মৃতি গাড়ির উদাসী ছন্দে মনের মধ্যে ওঠা পড়া করছে। রেবতী নেই। একা একা ট্রেনের শব্দে যেমন উদাসভাব মনের মধ্যে জাগে তেমনই জাগছিলো। এক অজানা দেশ থেকে আর এক অজানা দেশে চ'লেছি। বহুদূরে কতদূরে আমার সোনার বাংলা পড়ে রইলো যার সোনার ধানে কত বর্গী হানা দিয়েছে। বাংলার মাটি আজ মৃত্যুর রসে সিক্ত হ'য়ে উঠেছে। জেল, গুলি, ফাঁসি যাদের কিছু করতে পারেনি আজ নিশীথ ব্যাপারী আর তৃষিত আমলা তাদের সেই অমর প্রাণের ভাগ বাঁটোয়ারায় মত্ত। অপরাহ্নের ম্লান আকাশে ও কাদের ম্লান মুখের ছায়াই রুক্ষ উদাসী বাবলা গাছে কাদের রিক্ত নিঃশ্বাস মর্মরিত হ'য়ে উঠেছে? উদয় পথের আকাশে ও কারা অস্তের গান গাইছে? বহুদূরে থেকেও তাদেরই স্পর্শ যেন অনুভব করছি। টেলিগ্রাফের পোষ্টে একটা হলুদ পাখী ব'সে আছে। ট্রেন একটা স্টেশনে এসে দাঁড়ালো। চারদিকে ঝিঁঝিঁ ডেকে নির্জন প্রান্তরকে যেন আরও নির্জন ক'রে তুলেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ছোট্ট স্টেশন ঘর। ছোট্ট স্টেশন মাষ্টার—এদিকে ওদিকে ব্যস্তভাবে ছোটাছুটি ক'রছেন। ট্রেন হয়তো late হ'য়েছে। আসপাশের সঙ্গীরা কত বিচিত্র জাতির। বোঝার উপায়ও নেই। তবে পাগড়ী দেখে দুচারজনের জাতি বিভাগ করা সম্ভব হচ্ছিলো। ট্রেন আবার চ'লতে আরম্ভ করেছে। সুপ্ত ক্ষিদে এবার মাথা তুলেছে। পেট চন্ চন্ করছে। কয়েকটা ষ্টেশনে হানা দিয়েও কিছু পাওয়া গেল না। প্রায় ষ্টেশানই এদিকের বাজে— খাবার দাবার কিছুই মেলে না। শেষে একটা ষ্টেশনে দেখি তিলের খাজার মত এক ধরনের খাবার বিক্রী করছে। সাগ্রহে তাই কিনলাম বেশ কিছু। অতিরিক্ত মিষ্টি হ'লেও বেশ লাগছিলো। পাশের বন্ধু বান্ধবরা তাদের টোপলা বাঁধা 'রোটির' স্তূপ খুলে নিয়ে বসেছে।

গন্ধে মনটা বেশ একটু সেদিকে আকৃষ্ট হ'চ্ছিলো। কিন্তু, উপায় কি! বাইরে তারা-ভরা আকাশ যেন মালার মত ঘুরছে গভীর অন্ধকারে আর সবই অদৃশ্য হ'য়ে গেছে শুধু আকাশ ভরা নক্ষত্রের মুখোমুখি চেয়ে আছি-আর স্টেশানের পর স্টেশান অধীর ট্রেনখানা পাড়ি দিয়ে চ'লেছে। ওই নক্ষত্রগুলোকেও যেন আজ অপরিচিত ব'লে মনে হচ্ছে। রাত প্রায় এগারোটায় বেয়ানা জংসনে গাড়ি থামলো। বেয়ানা নাকি রাজপুতনায়। তাহলে সেই রাজপুতনায় এসে গেছি! তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। প্রথমেই খাবারের সন্ধানে ছুটলাম। কিন্তু, একি! ভেবেছিলাম, বেয়ানা জংসনে কত রকম খাবার খাওয়া যাবে—কিন্তু, চারদিকে চেয়ে নিরাশ হ'য়ে দেখি একটামাত্র খাবারওয়ালা রাশিকৃত ভিড়ের মধ্যে আসর জমিয়ে রেখেছে। অতগুলো লোকের ফরমাইজে বেচারী ব্যতিব্যস্ত। তার মেজাজ যে কত ডিগ্রীতে উঠেছে তা আঁন্দাজ করা শক্ত। আগ্রার ফিরিওয়ালাদের মত জবরদস্তিতেও যে পয়সা বেরতে চায় নি—সে পয়সা এখন দেখি বেরবার জন্যে অধীর—কিন্তু, পথ পাচ্ছে না। পয়সা মুঠোর মধ্যে পুরে ভয়ে ভয়ে আরজী পেশ করলাম—কিন্তু, খাবারওয়ালার ঝাঁঝাল সুরে সে কোথায় উড়ে গেলো। বুঝলাম ভদ্রতা এখানে বাঁচাতে গেলে রাত্রিরটা একাদশী হয়ে উঠবে। কোমর বেঁধে লেগে গেলাম—কিন্তু, কোমর বাঁধাই সার হলো—পুরি ফুরিয়ে গেছে। খাবারওয়ালা বললো, পুরি আনতে গেছে। ওর খাবারের ডালায় দেখি সন্দেশ জাতীয় কি পদার্থ রয়েছে। দামের জন্যই হোক আর যেজন্যেই হোক্ সেদিকে বিশেষ কেউ ঘেঁসছে না। এত হিসেবী পয়সা—এবার পয়সার হিসাব চুলোয় গেল—কিনে ফেললাম, কিছুটা সন্দেশ। দামও কিন্তু বেশি চাইলো না। খেয়ে দেখি কেমন বিদঘুটে গন্ধ। বড় বড় মিশ্রির দানা (অথবা, চিনির দানাও হতে পারে) গুলো ভালই লাগছিলো—কিন্তু ওই যে গন্ধ! গন্ধের

কথা যত মনে না করি গন্ধ ততই মনে করিয়ে ছাড়ে। তা'হলে কি উঁটের দুধের সন্দেশ—রাজপুতনার মরুভূমিতে তো প্রচুর উঁঠ! বিচিত্র কিছু নয়! একেবারে কবির সেই রোমাঞ্চক দেশে এসে উপস্থিত হয়েছি—বেদুইনদের তাঁবু—উঁটের দুধ—চারিদিকে ধু ধু মরুভূমি। সন্দেশের গন্ধ ছাড়িয়ে যেন দূর জীবনের এক ধরনের রোমাঞ্চিত গন্ধ আমার ইন্দ্রিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো। এই ভালো লাগা না-লাগার মাঝে একসময় গরম গরম পুরি এসে হাজির হয়েছে। ভিড়টা একটু কমেছে—তাই, নিশ্চিন্তমনে কয়েকখানা পুরি কেনা গেলো। সন্দেশের গন্ধে এবার কিন্তু বমি আসছিলো—তাই, শেষ পর্যন্ত ফেলে দিতে হ'লো কিছুটা। খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে পান কিনলাম দু' পয়সার—পান খেয়ে মুখ বদলাতে হবে। লোকে সন্দেশ খেয়ে মুখ বদলায়—আর আমাকে সন্দেশ-খাওয়া মুখই বদল করতে হয়! এই জন্যেই হয়তো সন্দেশগুলো অমনভাবে অবহেলিত হয়ে পড়েছিলো। আমিই হয়তো তার অবহেলার পর্দা প্রথম তুললাম।

রাত বারোটায় বোম্বে এক্সপ্রেস। ভিড়ের গল্প যা শুনলাম তাতে একটা কুলি করাটা সঙ্গত মনে করেছি। কুলি ব'লে গেছে ঠিক সময়ে এসে তুলে দেবে ভাবতে হবে না ইত্যাদি। ভাবনাটা তাতে বন্ধ হয় নি অবিশ্যি বরং ভাবনার কারণটা তাতে বেড়েই গেছে। ভাবনার কারণ না থাকলে লোকে ভাবনা করতে জোরের সঙ্গে বারন করে না। চারদিক অন্ধকার রাত। মাঝে মাঝে রাজপুত জোনাকীর দল সেই আঁধার শূন্যে চমকাচ্ছে। ভাগ্য ভালো, রাজপুত জোনাকীর মাথায় পাগড়ী নেই। একটা ফিরিওয়ালা থেকে থেকে চীৎকার করে চারিদিকের স্তব্ধতা গভীর করে তুলছে। জংসনের এ জং-ধরা জীবনধারায় অবাক হচ্ছিলাম। এমন নিরাভরনা জংসন তো বড় চোখে পড়ে না! দূরে দূরে দু'একটা কেরোসিনের আলো

মিট মিট করে জ্বলছে। তাতে অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠছে। একরাশ অন্ধকার মাথায় করে দরিদ্র ষ্টেশানটা ধুঁকছে—সামনের ওই ধু ধু করা রাত প্রান্তরের মতই সে রিক্ত। প্লাটফর্মের স্থানে স্থানে যাত্রীর জটলা চলছে! ঘুরে ফিরে সেই জটলার কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু, বৃথাই। ভাষাবিদ' সুনীতিবাবু ছাড়া এ ভাষার ভিড়ে পথকরা মুস্কিল। পথে না বেরলে ভারতের বৈচিত্র্য সত্যিই চোখে পড়ে না। আবার যেরকম সময় এই বৈচিত্র্য চোখে পড়ে তখন কেন যেন সে বৈচিত্র্য ভাল লাগে না—তবে অভিজ্ঞতা? অভিজ্ঞতাকে ফাঁকি দেয় কে?

যার প্রতীক্ষায় প্লাটফর্মের সবাই অধীর হঠাৎ দিগন্তে তারই আভাস দেখা গেলো। অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে বোম্বে এক্সপ্রেসের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। যে অপূর্ব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার কথা সে সৌন্দর্য যেন হৃৎপিণ্ডটা পর্যন্ত নাড়িয়ে দিলো। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হলে হৃৎপিণ্ডটা এত ভীরু হতো না নিশ্চয়ই! কেন না, সোনার হৃৎপিণ্ডে মানবীয় বৈশিষ্ট্যের সাড়া পাওয়া যায় না। পেছনে তাকিয়ে দেখি কখন নিঃশব্দে কুলিটা মাল তুলে নিয়েছে।···গাড়ি যত কাছে এগিয়ে আসছিলো হৃৎপিণ্ডের কাজ ততই বাড়ছিলো। শেষে কল্পিত দৈত্যের ফঁসফসানির সঙ্গে রক্তচক্ষু বোম্বে এক্সপ্রেসের এঞ্জিন প্লাটফর্মে ঢুকলো। কুলিকে পেছনের দিকে যেতে বললাম। যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই! গাড়ি লোকে লোকারণ্য। সর্বত্রই No Vacancy. তবু বেপরোয়া বেকারের মত No Vacancy অগ্রাহ্য করেই একটাতে উঠে পড়লাম। গাড়ির মধ্যে কত রকম যে লোক। একজন বুড়িকে দেখে মনে হলো আজারবাইজান গণতন্ত্রের ছায়াচিত্রে বোধ হয় এ ধরনের লোক দেখা যায়। জায়গার সন্ধানে ঘোরাঘুরি করতে করতে একটা জায়গায় দেখলাম, একটা লোক হাঁটু তুলে বসে আছে সেদিকে

এগোতেই লোকটা হঠাৎ হাঁটুটা নামিয়ে নিলো—দেখি বেশ একটু জায়গা হয়েছে। ভয়ে ভয়ে বসলাম। লোকটা কোনরকম বাধা দিলো না দেখে একটু অবাকই হলাম। লোকটাও অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো—যেন এ ধরনের লোক সে কাছাকাছি কোথাও দেখে নি। কিন্তু, আমি তো এদের চিনি! এরাই তো আমার বিমূর্ত ভারত—মাঠে, কারখানায়, খনিতে, জঙ্গলে যাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—যাদের গায়ে পিলসুজের তেল নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ে অথচ অন্ধকারের অভিযোগ জানায় না।—আবার অভিযোগ যখন জানাতে আরম্ভ করে তখন আলোর আলোয় অভিযোগে দিগন্ত আলোড়িত হয়ে ওঠে—সেই অভিযোগী অন্ধকার, সেই বিমূর্ত ভারতকেই আমার পাশে উপবিষ্ট দেখলাম। শুনলাম এরা রাজপুত চাষী। মাথায় লাল পাগড়ি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়ানো।

বসতে পেরেছি ভেবে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। এক দুর্ভাবনা গিয়েছে আর এক দুর্ভাবনা তার স্থান দখল করেছে—এই অসহ্য গুমোট রাত কাটাব কি করে! ট্রেণের বাইরেই যে অবস্থা—ভেতরে এই গরম সীমা ছাড়িয়ে গেছে। গাড়ির অধিকাংশই চাষী শ্রেণীর মনে হচ্ছিলো—চাষীর মতই সরল মুখগুলো, মাটি চষার মেহনৎ যেন রেখায়িত তাদের মুখে। তেমনি পিট্ পিট্ করে থুতু ফেলছে। 'ফণ্টামারাতে' পড়েছিলাম, পৃথিবীর প্রত্যেক চাষীর মধ্যে বেশ একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় পরস্পরকে তারা যেমন চেনে নিজের দেশের ভদ্রলোকদেরও তারা তেমন চেনে না (তার ভাবার্থ)। সত্যই তাই। এখানে বসেও আমি যেন বাংলাদেশের সান্ধ্য আসরের চাষীর সাক্ষাৎ পাচ্ছি—যারা আগুনের মালসা সামনে করে বসে হুঁকো টানে আর পিক্ পিক্ করে থুতু ফেলে। এদের হাতেও হুঁকো রয়েছে! এই ট্রেণের মধ্যে এরা কত নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে।

অথচ ওদের স্নায়ুতে কত বন্যা, মহামারী, অনশন, অর্দ্ধাসন, উৎপীড়নের ঝড় বাসা বেঁধে আছে। কে জানে ওই হুঁকো-হাতে চাষীর হাতেই জমি রক্ষার মরণ প্রয়াস গর্জে উঠেছে কিনা একদিন। আজকের এই শান্ত রাত্রির আলোছায়ায় মানুষদের দেখে কে বলবে ওরা যেমন সরল—তেমন গরলের মত বিষাক্ত শত্রুদের কুটিল ষড়যন্ত্রও ওরা ব্যর্থ করতে পারে! ওরা যে মোগলদেরই বংশধর। ওদের তো আমি চিনি! গাড়ির ক্ষীণ আলোকে পতঙ্গের উৎসব চলেছে। বাইরের পৃথিবী নিঃসাড়ে ঘুমচ্ছে। ঘুমের দেশের বাইরের আমরা কিছু প্রাণী শুধু ব'সে ব'সে দুঃস্বপ্ন দেখছি! আর ব'সে বসেই একের পর আর অজানা দেশ পাড়ি দিয়ে চলেছি। যে-দেশের মাটিতে কোনদিন পায়ের স্পর্শও পড়বে না, সেই মাটির ওপর দিয়েই দিব্বি নিশ্চিন্ত-মনে ভেসে চলেছি। এ-ও তো মানুষের জয়-ফল।···

দুঃস্বপ্ন দেশের রাত্রিকে পেছনে ফেলেই ভোরের দিকে 'কোটা' স্টেশানে এসে গাড়ি থামলো। কোটা বেশ বড় স্টেশান। শুনলাম, কোটা স্টেটের সদর স্টেশান এটা। কোটা, বুন্দি প্রভৃতি স্টেটের নাম আমরা ছোটবেলায় রাজপুত বীরদের কাহিনীর মধ্যে পড়েছি। সেই 'কোটা' স্টেটেই আজ সশরীরে এসে গেছি। ভোরের এই স্তব্ধ মুহূর্তটিকে সম্বর্দ্ধনা জানাই। এখানে দেখি সবাই মুখ হাত ধুয়ে খাবারের ব্যবস্থা করছে। চারদিকে খাবারও প্রচুর। কাল রাতের উঁটের দুধের মহিমায় খাবারের দিকে আর ঝোঁক ছিলো না! তবে মুখ ধোবার ইচ্ছা ছিলো। এখানে জল সুলভ—তাই, এই দুর্লভ সামগ্রীটির সদ্ব্যবহারের ইচ্ছায় গাড়ি থেকে নামলাম। শরীরে কেমন একটা তন্দ্রালু জড়তা। সবই যেন ঝাপসা ঝাপসা লাগে। মুখ হাত ধুয়ে ট্রেণে এসে বসলাম। 'চা গরম' এর চোটে স্টেশান মুখর। এত মুখরতার মাঝে মূক হয়ে ব'সে থাকা কঠিন। এক কাপ চা কিনে

সদ্ব্যবহার করা গেলো। রাত-জাগা চোখের দৃষ্টিতে সৃষ্টির মহিমা কিছু কিছু চোখে পড়েছে এবার। এদিকে প্রত্যেক স্টেশানেই প্রায় কমলালেবুর মত একরকম ফল বিক্রী করছে দেখলাম—'মৌসাম্বী' 'মৌসাম্বী' ব'লে চীৎকার করছে। দেখতে অনেকটা কমলা লেবুর মত হলেও কমলালেবুর মত এর গায়ের চামড়া অমসৃণ নয়। এর বাইরের আবরণ রবারের বলের মতই নিটোল। বাংলাদেশে এরকম ফল চোখে দেখিনি। দুটো কিনে খেলাম; চামড়াটা দারুন শক্ত। কোয়াগুলোতে অম্লতার লেশ-মাত্র নাই—একেবারে মিষ্টি। পরে শুনেছি এদিকে ডাক্তাররা এগুলোকে রোগীর অপরিহার্য পথ্য হিসেবে ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। খুব পুষ্টিকর নাকি। স্টেশানে স্টেশানে খরমুদা (খরমুজ) দেখা যাচ্ছিলো। অন্য কোনরকম খাবার প্রায় চোখে পড়ছিলো না।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি যেন খালি হ'য়ে উঠলো। দিব্বি আরামে পা ছড়িয়ে বসলাম। এক স্টেশানে এক বৃদ্ধ রাজপুত ভদ্রলোক নাতিপুতি নিয়ে উঠলেন। সংখ্যায় তাঁরা কম নন্। ছেলেদের কথাবার্তা, হাসি-খুশিতে কম্পারট্‌মেন্ট সজীব হ'য়ে উঠলো। বৃদ্ধের ছেলেরাও এ-দলে আছেন—তাদের ধরন ধারন দেখে মনে হ'চ্ছিলো। অন্য সবাই হাসি-খুশি, গানে-গল্পে মশগুল থাকলেও বৃদ্ধের দিকে সবারই সম্ভ্রম দৃষ্টি আছে। এটা চাই কিনা, ওটা লাগবে কিনা ব'লে বৃদ্ধকে ব্যস্ত ক'রে তুলেছে। লোকগুলোর ফুট্‌ফুট্ করছে গায়ের রং। কেন যেন মনে হ'লো, বৃদ্ধ কোন Retired Government Servant.

এ গাড়িতে Dining car-ও আছে। মাঝে মাঝে 'বয়' এসে হেঁকে যাচ্ছিলো। Rate শুনে—বিশেষতঃ, খাবার অন্য কিছু না দেখে শেষ পর্যন্ত Dining car-এ গিয়েই উঠতে হ'লো। কিন্তু, খাবার উপকরণের চেয়ে style-ই বেশি। Curry, Soup, Plate প্রভৃতি ইংরাজী শব্দের

মধ্যে যে জমক আছে পরিবেষণ করা হ'লে দেখলাম সেগুলো নিতান্তই মামুলী ডাল, আলুর টলটলে ঝোল ইত্যাদি। দুধও আছে নাকি। দুধের অর্ডার দিলাম। খানিকটা ঠাণ্ডা দুধ দিয়ে গেলো। পাশের ঘর থেকে রান্নার শব্দ আসছে। চল্‌তি গাড়িতে ব'সে ভাত, ডাল, তরকারী খাচ্ছি—বেশ লাগ্‌ছিলো। এ অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। খাবাবের মধ্যে চাপাটিটাই ভালো লাগলো শুধু। গাড়ি থামলে বারো আনা পয়সা দিয়ে অতৃপ্ত মন নিয়ে ফিরে এলাম—সেই উটের দুধের সন্দেশের গন্ধ যেন তখনও নাকে জড়িয়ে রয়েছে।

রামগঞ্জমণ্ডি স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করছে চারদিকে। শুনলাম, রামগঞ্জমণ্ডি থেকে ঝালোয়ার স্টেটে যাওয়া যায়। হলদীঘাটের যুদ্ধের সেই বীর ঝালোয়ারাধিপতির কথা মনে হ'লো—যিনি রাণা প্রতাপের বিপদ নিজের ঘাড়ে নিয়ে প্রতাপকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। শৈশব কল্পনায় যাঁরা একদিন অপূর্ব গৌরবময় স্থান অধিকার ক'রে রেখেছেন আজ তাঁদেরই রাজ্যের পাশ দিয়ে ট্রেনে ক'রে যাচ্ছি! ঝালোয়ারে নাকি প্রচুর কমলা পাওয়া যায়। সেই জন্যেই কমলালেবু একটু সস্তা এইদিকে। কমলালেবুর মধ্যেও ঝালোয়ারের মধুর স্মৃতির আস্বাদ পাওয়া যায়।

নগ্‌দা জংসন-এর আগে গাড়ি দিয়েছি। নগ্‌দা থেকে বাসে উজ্জয়িনী যাওয়া যায়। উজ্জয়িনী! কালিদাসের, বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী। অনেক দিন পরে পত্রিকা-মারফৎ জেনেছিলাম, এই নগ্‌দাতে বিড়লার একটা মিল হ'চ্ছে এবং সেই মিলের স্থান ছেড়ে দেবার জন্য নগ্‌দার দরিদ্র চাষীদের একরকম বিনাখরচে জমি থেকে উৎখাত করা হয়েছে। এই সমস্ত বিড়লাই জনগণের বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ নেতাদের সম্বর্দ্ধনা করবার যখন সুযোগ পায় তখন একই সঙ্গে রাগে এবং দুঃখে মন ভরে ওঠে। জনগণের অস্তিত্ব চূর্ণ ক'রেই জনগণের প্রতিষ্ঠানের

মধ্যে যারা সম্মানিত পদে টিকে আছে—তখন তাদের টিকে থাকাই প্রমাণ করে জাতির জীবনে কোথাও নিশ্চয়ই কোন গলদ ঢুকেছে—নইলে খুনীরা শান্তিরক্ষকের ভূমিকা অবলম্বন করে কি ক'রে?

ট্রেনের বাইরে দেখবার মত বিশেষ কিছু চোখে পড়ছিলো না। পড়লেও চোখে ধরছিলো না—যা রোদের ঝাঁজ! রুক্ষ মাটি—তেমনই রুক্ষ বাবলা গাছের সারি আর মাঝে মাঝে কাল্‌চে পাথরের স্তূপ। একবার একটা হরিণ চোখে পড়েছিলো। বড় বড় চোখে ট্রেনের দিকে চেয়ে শেষে দে ছুট্। বুনো হরিণের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎ। তাই, ঝাঁজালো দুপুরের অলস-করা শরীরেও একটু উল্লাস বোধ করেছিলাম। ময়ূরও এক আধটা চোখে পড়েছে—কিন্তু, ময়ূর নতুন নয়—কুতুবমিনারের পথেই তার প্রথম দর্শন হ'য়ে গেছে। বেলা প্রায় দুটো আড়াইটেতে রাটলাম্ জংসনে পোঁছলাম।

আজমীর-খাণ্ডোয়া রেলপথ রাটলাম ছুঁয়ে গেছে। এই লাইনেই ইন্দোর, মিটার গেজের লাইন। গাড়িগুলো ছোট ছোট, খুব ভিড় না থাকলেও ভিড় ছিলো। গাড়িটার রং কেমন পাটকেলী-হলুদে মেশানো—অথবা, রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঠিক মত করতে পারলাম না। মোট কথা গাড়িটার রং একটু নতুন নতুন। একটা কম্পার্টমেন্ট-এ গিয়ে উঠলাম। দুজন সৈন্য বসে বসে কমলালেবু চিবোচ্ছিলো। গাড়িতে আবার বাঙ্ক নাই। মহামুস্কিল! কোন রকমে পায়ের নিচে সুটকেসটা ঢোকালাম। বিছানাটা চলাচলের পথের উপরই রাখতে হলো। ঠিকঠাক হ'য়ে বসে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। সেই অচেনা মানুষের জঙ্গল। সৈন্য দু'জনের সঙ্গে আলাপ ক'রে বুঝলাম ওরা ইন্দোরের স্টেট সৈন্য। দেখতে বাচ্চা বাচ্চা—স্বাস্থ্যও সৈন্যের মত নয়। সময় আর কাটে না। রোদের তাপে মেজাজ খিঁচড়ে গেছে। ভালো লাগছিলো না কিছু। একজন লেমনেড ফিরি করছিল, 'নাই কাজ

তো খই ভাজ' গোছের লেমনেড খেয়েই খানিকটা সময় কাটানো গেল। এর পরে কমলালেবুর :পালা। খুব ধীরে ধীরে কমলানেবু চিবিয়েও সময় কাটলো না। দূরে মেন লাইন-এর ধারে বড় একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিলো—কে একজন বললো—ওটা রাট্‌লামের মহারাজার বাড়ি ! রাটলাম ছোটখাট একটা স্টেট। কিন্তু, বাড়িটাকে তন্ন তন্ন করে দেখবার চেষ্টা করেও সময় কাটলো না।

যাক্, শেষ পর্যন্ত ঘন্টা পড়েছে। গাড়ি ছাড়লো। অসহ্য গরম। স্টেশানে স্টেশানে জল খাবার জন্যে লোকে ছুটাছুটি করছে। একজন মাত্র পানি পাঁড়ে। প্রত্যেক স্টেশানেই জল খাওয়ার চেয়ে না খাওয়ার দলই থাকছিলো বেশি। জলের ক্রটীপূর্ণ ব্যবস্থায় মেজাজ খারাপ হয়ে উঠছিলো। প্রত্যেক স্টেশানে দেখতে দেখতে মুখগুলো পরিচিত হয়ে উঠছিলো। প্রত্যেক স্টেশানেই খাবারের মধ্যে প্রচুর তেলে-ভাজা খাবার। সবাই প্রাণ খুলে খাচ্ছে। বাংলার মত পেট টেপার ভাবনা তো আর নেই ! ভয়ে ভয়ে দু এক পয়সার তেলেভাজা সেই খাবার খেলাম। বাংলার রসগোল্লা সন্দেশ তো আর পাওয়া যাবে না ! এক স্টেশানে একজন গেরুয়াপরা মহিলা (সম্ভবতঃ ভৈরবী) নামলেন, সঙ্গে দু চারজন শিষ্য আছে। ভৈরবীর দিকে সবাই কৌতুহলের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

এদিকে ট্রেণের মধ্যে ভিড় ক্রমেই বেড়ে উঠছে। আমার বিছানাটা যাতায়াতের পথের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। সবাই যাবার সময় একবার করে মাড়িয়ে যাচ্ছে। আর কিছুক্ষণ পর ওর অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ—তবু উঠে যে তার কোন ব্যবস্থা করবো সেরকম কোন উপায়ও ছিলো না আর শক্তিও ছিলো না। গরমে, ঘামে, ভিড়ে শরীরটা যেন অসাড় হয়ে গেছে। ইন্দোর আর আসে না। পাশের লোকটা বহু কষ্টে গাড়িতে উঠেছে ; চোখে মুখে অপরাধীর

ভাব। গ্রাম্য সরলতা ওর মুখে চোখে, কথাবার্তায় ফুটে বেরচ্ছে। একটু গল্প করবার চেষ্টা করলাম ওর সঙ্গে। স্টেটের মহারাজার কথা জিজ্ঞেস করতেই লোকটা ভক্তিভরে দুইহাত মাথায় ঠেকালো। বুঝলাম, দেবে দ্বিজে রাজায় ভক্তি সামন্তরাজ্যে আজও অটুট আছে। ইন্দোর এগিয়ে আসছিলো। আসে পাশে ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড় চোখে পড়ছে। ভাবছি এই নিরালয় উষর মাটির দেশে লোকজন, দোকান পসার, বিদ্যুতের আলো, কারখানা নিয়ে ইন্দোর নগরী ওই সীমান্তের পারে কোথায় লুকোনো রয়েছে বা। শহর নয়, ইন্দোর আবার নগরী। এইরকম বিজন প্রান্তরের মধ্যে হঠাৎ আধুনিক শহর দেখতে পাবো ভাবতেও কেমন লাগছিলো। নতুন দেশ, নতুন হালচাল ছেড়ে দিলেও পুরনো বন্ধুর সঙ্গে নতুন করে দেখা হবে ভাবতেও বেশ লাগছিলো।

যতই ইন্দোর কাছে আসছে ততই যাত্রীদের মধ্যে এই অসহ্য অবস্থার হাত থেকে মুক্তির চাঞ্চল্য জাগছে। শেষে সত্যিই যখন ইন্দোরের আভাস পাওয়া গেল তখন বসার চেয়ে দাঁড়ানো লোকের ভিড়ই বেশি হয়ে উঠেছে। ডিষ্ট্যাণ্ট সিগন্যাল পেরিয়ে লাইনের জঙ্গলের মধ্যে পথ করে ট্রেণ ইন্দোর স্টেশানে ঢুকবে ঢুকবে করছে, অদম্য আবেগভরে বাইরে চেয়ে আছি। হঠাৎ "রাজকুমার মিলস, লিমিটেড" সাইন্‌বোর্ড চকিতে চোখে পড়লো। বুঝলাম, এটাই আমার কাম্য স্থান। অদৃশ্য রাজকুমার মিলস-এর সঙ্গে পরিচয় ছিলো। আমার কত চিঠি এখানে এই মিলের গেট্ দিয়েই ঢুকেছে—আজ সেই চিঠি-লেখা হাত সশরীরে আর একটু পরেই ওই গেট্ দিয়ে ঢুকবে ভাবতেও কেমন লাগছিলো। ভাবনার অবশ্য অবসর মেলেনি আর। ইন্দোরের প্লাটফর্মে ইঞ্জিন মাথা গলিয়েছে।

প্লাটফর্মে ভীষণ ভিড়। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের প্রতীক্ষায় বহু অধীর উজ্বল চোখ চারদিকে ঝিকমিক করছে। আমার আসার ঠিক

থাকলেও দিনের ঠিক ছিল না—তবু একবার চারদিকে চেয়ে দেখলাম, বন্ধু এসেছে কিনা। হতাশ হ'য়ে গেট দিয়ে ঢুকে টাঙার ঘাঁটিতে গেলাম। টাঙার সমুদ্রে হাবুডুবু খাবার ভয়ে সামনে যেটা পেলাম সেটাতেই উঠে বসলাম—বললাম, রাজকুমার মিল্‌স্ চল্‌না।

—রাজকুমার মিল্‌স্ জায়েগা বাবুজী!—টাঙাওয়ালা সশব্দে টাঙ হাঁকালো। ইলেকট্রিক আলোর ফাঁকে ফাঁকে অন্ধকার জমাট হয়ে আছে। দূরে দূরে আলোকিত বাড়ি চোখে পড়ছিলো, শহরের পথ ছেড়ে টাঙা মিলের পথ ধরলো। নাঃ, ইন্দোরের টাঙায় চড়ে সত্যিই আরাম আছে। যাত্রীদের হেলান দেবার জন্যে চারধারে চারটা বালিস ফিট করা—আবার আয়নাও আছে চার খানা। এমন শৌখীন্ টাঙা তো কোথাও দেখি নি! এরকম টাঙায় উঠে কি শেষে পকেটটাকে বেশ কিছু খালি করতে হবে! মাথায় থাক আমার বালিস আর আয়নার আয়েস। চিরকেলে কাঠের বেঞ্চওয়ালা মুসাফিরের ওতে প্রয়োজন নেই কোন, বেঁচে থাক আমার ছেঁড়া পকেটের মূলধন! শেষে অবশ্য বুঝেছিলাম আমার আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। সব টাঙাতেই এখানে এই ব্যবস্থা এবং ইন্দোরের এটা বৈশিষ্ট্য।

মিনিট কুড়ি পর টাঙা রাজকুমার মিলসের গেটে এসে থামলো। এদিকে অনেকগুলো মিলের আভাস পাওয়া গেল। ঝক্ ঝক্ করো মিল চলছে। ধক্ ধক্ করে আলো জ্বলছে। কেমন একটা থমথমে ভাব। মিলের অফিস-ঘর গেটের সামনেই। গিয়ে উঠলাম সেখানে। ছোট ঘরে জনকয়েক অফিসার (?) ব'সে আড্ডা জমিয়েছেন। আমি লাহিড়ীর কথা জিজ্ঞেস করতেই একজন চটপট বলে উঠলেন, Oh you want Mr. Lahiry, well. সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হলো। অতগুলো উজ্জ্বল চোখের সামনে ট্রেনভ্রমণ ক্লিষ্ট মন কেমন অস্বাচ্ছন্দ বোধ করছিলো। টিক টিক করে ঘড়ি চলছে। জুতোর মচ্‌মচে

আওয়াজে চোখ ফেরাতেই দেখি যশা। আরে! সে অবাক হ'য়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো।

দু'জনে মিলে রেল লাইন, তারের বেড়া, অন্ধকার পথ ডিঙিয়ে শ্রেণীবদ্ধ বাড়ির একটায় গিয়ে ঢুকলাম। চারদিক নির্জন। নিস্তব্ধ রাস্তার নিঃসঙ্গ আলোগুলো 'দাঁড়িয়ে' দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। এ রাজ্যে রাতে লোক থাকে না বোধ হয়। পথ জনশূন্য। যশা ব'ললো বিশ্রাম করার আর সময় নাইরে, এক ঘণ্টা মাত্র খাবার ছুটি। শীগ্গির চল্। অনিচ্ছুক পা দুটোকে চালাতে হ'লো। কিন্তু যশার গতিতে থামার কোন লক্ষণ দেখছি না। সে বললো, হোটেলগুলো এখান থেকে বেশ দূরে। একটু কষ্ট হবে রে! যাক, মাইল দেড়েক প্রায় চলে একেবারে শেষ অবস্থায় যশার হোটেলে গিয়ে পৌছলাম।

আগ্রা, লাহোর, দিল্লী থেকে শত শত মাইলের ব্যবধান হ'লেও খাবারের ব্যাপারে কিন্তু কোন ব্যবধান চোখে পড়লো না—যদিও হাত ধোবার জন্যে সাবান আছে, হাত মোছার জন্যে তোয়ালে আছে। কিন্তু, সে রাত্রের জন্য অন্ততঃ সেই খাবারই অমৃত লেগেছিলো— বৈশাখের শুকনো মাটিতে প্রথম বৃষ্টির স্পর্শ যেন মধু বলে মনে হয়। ঘুমের ঘোরেই আবার সেই যোজন খানেক পথ পাড়ি দিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। স্নেহলতাগঞ্জের (সেই পাড়ার নাম) বাড়িতে বাড়িতে নিশঃব্দতা তখন আরও গভীর হয়ে উঠেছে। যশার দেরি করার উপায় নেই। ধনতান্ত্রিক যন্ত্রজগৎ মানুষের সম্পর্কও যান্ত্রিক করে তুলেছে। সঙ্গীহীন ঘরের মধ্যে আমাকে একা রেখেই নিশাচর বন্ধুকে ছুটতে হলো। খুবই ক্লান্ত হয়েছিলাম। রাত হলেও চারদিকে যেন আগুন ছুটছে। খাটিয়াটা জানালার ধারে টেনে নিয়ে light off করে, দরজায় খিল লাগিয়ে শুয়ে পড়লাম।

অহল্যা-বাই-এর দেশে

১

ভোরের দিকে দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেলো, যশা এসেছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে আবার শুয়ে পড়া গেল। অনেক বেলায় দুজনে উঠে স্নান করে আবার সেই হোটেলের দিকে রওনা দিলাম। হোটেলের দূরত্বের কথা ভেবে মন খিঁচড়ে গেলো। বললাম কাছে কিনারে কোন হোটেল নেই? যশা মাথা নাড়লো। বললো হোটেলের সুবিধে নিতে গেলে কারখানার সুবিধে নেওয়া যায় না এবং কারখানার সুবিধে নিতে গেলে হোটেলের সুবিধে নেওয়া যায় না। কারখানার সুবিধেটাই আমার কাছে বড় আর বাড়ি ভাড়াও এদিকে কম।

হোটেলের রান্না তখনও হয় নি। একখানা সাইকেল ভাড়া নিয়ে আমরা এক চক্র দিয়ে আসা ঠিক করলাম। যতটুকু দেখলাম তাতে ইন্দোরের বৈশিষ্ট বড় বেশি চোখে পড়লো না। সেরকম বাড়িও চোখে পড়লো না। খালি দোকানের সার। শহরটাই যেন দোকান দিয়ে ঘেরা।

এখানে বাঙালীরা চেষ্টা ক'রে একটা ক্লাব খুলেছে, লাইব্রেরীও আছে তার সঙ্গে। যশা সেখানে নিয়ে গেলো। লাইব্রেরীর বই দেখে শ্রদ্ধা এলো না। বইগুলো মান্ধাতার আমলের। ক্লাব-এর ম্যানেজমেন্ট-এও নাকি যথেষ্ট গলদ, দলাদলি ইত্যাদি। এখানে দুর্গাপূজা করা হয়। প্রবাসী বাঙালীদের নিজেদের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি নেই। শুনলাম উচ্চস্তরের বাঙালীদের লাটসাহেবী চালচলন। কেবল বাঙাল্

খেদা আন্দোলনের সময়ই এঁরা হঠাৎ বাঙালী হ'য়ে ওঠেন। আর সব সময়ই ইওরোপিয়ান—আমার এই ধারণা কতদূর সত্য তা জানি না। মিথ্যা হলেই সুখী হবো।

ফিরে এসে শঙ্করার হোটেলে খেতে ব'সলাম। অনেকদিন ধরে এই শঙ্করার হোটেলে খেয়েছি। শঙ্করা ছেলেটি বেশ হাসি খুশি দেখতেও সুন্দর—মারাঠীর ছেলে সে। খাবার সময় তার ছোট খাট হাস্য পরিহাস বেশ লাগতো। কোনদিন হয়তো ব'লতো, কি বাবু! খেতে পারছেন না কেন আজ? কোনদিন হয়তো ব'লতো, বাবু, আজ যত চাউল্ (ভাতকে চাউল বলে) পারেন নিবেন। এই চাউল নিয়ে একটা মজার ব্যাপার হ'তো এবং শঙ্করার কথা মনে হ'লে আজও সেই চাউলের কথাই মনে হয়। ইন্দোরে চাল টাকায় মাত্র দু'সের। এখন, মারাঠাদের (শুধু মারাঠাদের নয়, অনেকেরই) নিয়ম হ'চ্ছে, প্রথমে আধমুঠ ভাত দেয় এবং খাবার শেষে আধ মুঠ ভাত দেয়। আমার রুটি বেশি সহ্য হ'তো না বলে ভাতই খেতাম বেশি। কিন্তু শঙ্করার অবস্থা যে ওদিকে কাহিল হ'য়ে উঠছে সেটা পরে শুনলাম। ঠিক পাবার পর প্রায়ই রহস্য ক'রে বলতাম, শঙ্করা, আজ শুধু ভাতই খাবো! শঙ্করা অপ্রস্তুত হবার লোক নয় মুখ কালো করেও সে খুশির ভঙ্গিতে বলতো খান না বাবু, বত খাবেন! শঙ্করা কিন্তু আমার খাওয়া দেখে ভারি কৌতূহল বোধ করতো, এটাও পরে শুনেছি। এখানকার লোকে সাধারণতঃ তিন আঙুলের ডগা দিয়ে খায়, এঁটো হয় মাত্র আঙুলের ডগাটা। আমি ভাত একেবারে পাঁচ আঙুলের আগা গোড়া দুইদিয়ে চট্কিয়ে মাখি; এতে খুব আমোদ বোধ করে সে। আমি চলে আসবার পর আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে কেউ কেউ ওর হোটেলে খেতে গেলে ও আমার খাওয়া সম্বন্ধে গল্প করেছে।

বন্ধুর কাছে এসেছি বটে এখানে কিন্তু, বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক বড়ই

কম। সে সারারাত মিলে কাজ করে সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোয়। আমি একা একাই ঘুরি। সকালে উঠে যখন শহরে যাই তখন এক মজার দৃশ্য হয়। ইন্দোরে গোটা কতক কাপড়ের কল আছে এবং সবগুলোই এই ধারে। ত্রিশ হাজার শ্রমিকের মধ্যে পনের হাজার যখন রাতের shift এর মজুরদের relieve করার জন্যে রাস্তা দিয়ে আসে তখন সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। কাতারে কাতারে লোক চলেছে। কারও হাতে রুটির পোটলা, কোন কুলির পিঠে বাঁধা ছেলে মেয়ে, কেউ চলেছে সাইকেলে—ওই অগুণতি লোকের মাঝ দিয়ে ওরা অদ্ভূত ভাবে সাইকেল চালিয়ে যায়; এখানে আবার সাইকেলে বেল্ নেই। মানুষ সামনে পড়লে মুখ দিয়ে এক ধরনের শিস্ দেয়, পথে ঘাটে এমন শিসের এখানে ছড়াছড়ি। পথিক শিস্ থেকেই বুঝে নেয় পেছনে সাইকেল আছে। কিন্তু, ওই হাজার হাজার লোকের মধ্যে সাইকেলধারী মজুররা নানাভাবে অনায়াসে সাইকেল চালিয়ে যায় তাতে অবাক না হয়ে পারি নি। সকালে রোজ আমাকে এই হাজার হাজার লোকের শোভাযাত্রা পেরিয়ে যেতে হয়। প্রথম প্রথম মজা লাগতো, শেষে লাগতো বিরক্তি। এই অর্ধনগ্ন মজুরদের জীবন ভিড়ে ভিড়েই কেটে যায়। কারখানার ভিড়, বস্তিতে ভিড়—চলার ভিড়, বসার ভিড়। সাময়িক একাকীত্ব এবং নির্জনতা মানুষের জীবনে যে মাধুর্য দেয়, শান্তি দেয় আপনাকে চেনবার, আত্মসমালোচনার যে সুযোগ দেয় এরা সে সুযোগ পায় না। এদের জীবন বস্তি থেকে কারখানা পর্যন্ত বাঁধাধরা। রাত ভরে গায়ের রক্ত উজার করে ঢেলে দিয়ে সকালে পিঙ্গল চেহারা নিয়ে ফিরে আসে! চিমনীর ধোঁয়া যেন এদেরই জীবনের নির্যাস্, ধোঁয়া হয়ে আকাশে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। এই দেউলে জীবনের ভিড় ঠেলেই আমাকে রোজ শহরে যেতে হতো। বিকেলে শহর থেকে ফেরবার পথেই আবার আর একবার এই ভিড়

ঠেলতে হতো। যেদিন মন ভালো থাকতো সেদিন এই গতিশীল জনতার মধ্যে নতুন সৃষ্টির ইঙ্গিত খুঁজে পেতাম। মনে হ'তো, নতুন ইতিহাসের নায়ক নায়িকা তো এরাই। এদেরই আঘাতে আঘাতে ইস্পাত ধূলো হয়ে উড়ে যায়। লোহা গলে জল হয়ে যায়। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তো এদেরই সৃষ্টির স্বাক্ষর। সৃষ্টির ইতিহাসে এরা এক নতুন মানুষের গোষ্ঠী। দুনিয়াকে অচল যেমন এরা ক'রে দিতে পারে সচলও আবার এরাই রাখে। এদের অনুকম্পায় যন্ত্রজগতের হৃৎপিণ্ড ধিকি ধিকি চলে। অথচ, দিন এদের চলে না। আধুনিক জগতের পুরোভাগে দাঁড়িয়েও এরা সবার পেছনে। কিন্তু পশ্চিমের এক অদ্ভুত দেশ এদের চোখের ছানি কেটে দিয়েছে। এরাও লাল-ঝাণ্ডাকে চিনেছে। স্নেহলতাগঞ্জে মজদুর সভার অফিস ঘরে সেই ঝাণ্ডা ওড়ে।

সকাল বেলা উঠে এক একদিন রেললাইন ধরে শহরের বাইরে বহুদূরে চলে যেতাম। চারদিকে অবাধ প্রান্তরের স্থানে স্থানে ছোট ছোট পাহাড় মাথা তুলে রয়েছে। নির্জন, নিস্তব্ধ চারদিক। পেছনে কাপড়ের কলের কালো কালো চিমনী দিয়ে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী অনর্গল আকাশে উড়ে যাচ্ছে। এই শান্ত প্রভাত বেলায় চারদিকের দৃশ্য ছবির মত অপরূপ হ'য়ে উঠতো। নগরীর অতিরিক্ত কোলাহলে যখন ক্লান্তি আসতো তখন মাঝে মাঝে এইদিকে মুক্ত প্রকৃতির কাছে ছুটে আসতাম। মনটা আবার সজীব হ'য়ে উঠতো। সামনেই অবারিত মাঠে বন্ধনহীন বাতাস খেলা ক'রে যাচ্ছে, আর তারই কাছে কারখানার বদ্ধ বাতাসে আলো আর হাওয়ার অনটনে মানুষের জীবন তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই নির্মল বাতাসের অধিকারও যারা মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে যন্ত্রজগতের সমস্ত শক্তি তাদের কাছে আজ অসহায় বন্দী। দূরের কলের বাঁশীর আর্তনাদে

যেন তারই বুকফাটা যন্ত্রনা ফুটে বেরচ্ছে। ধোঁয়াগুলো যেন তারই বিষণ্ণ ইতিহাস।

আস্তে আস্তে এখানকার মজদুর সভায় প্রজামণ্ডল, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতির কর্মী এবং নেতাদের সঙ্গে আলাপ হ'তে লাগলো। গত আগষ্ট আন্দোলনে এখানেও কিছু ধরপাকড় হয়েছে। স্থানীয় মজদুর নেতা দিবাকরের সঙ্গে একদিন আলাপ হ'লো। দিনরাত খাটছে। দিনরাত ব্যস্ততার জন্যে কেমন অন্যমনস্ক ভাব। খান্দকর ভাইদের সঙ্গে আলাপ হ'লো। ছোট ভাই কমিউনিষ্ট পার্টির মেম্বার, বেশ অমায়িক। মুখে হাসি লেগেই আছে। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা ঝুলছে, কিছুদিন জেলেও আটকা ছিলেন, সম্প্রতি জামীনে খালাস আছেন। এঁর স্ত্রীও পার্টি সদস্যা। সরমণ্ডলে স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী। বিরাটকায় পুরুষ, ফুটফুটে রং। কানে একটু কম শোনেন। বক্তৃতা নাকি চমৎকার ক'রতে পারেন। এখানে কমিউনিষ্ট পার্টি খুব অল্পদিনই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একদিন পার্টির উদ্যোগে গনেশ মণ্ডলে—এটা town hall এর মতই একটা hall, মিটিং প্রভৃতি এখানেই হ'য়ে থাকে—স্থানীয় কবি, শিল্পীদের এক সম্মেলন হলো। একজন বিখ্যাত উর্দু কবি এই উপলক্ষ্যে এসেছিলেন। অনেক হিন্দী উর্দু কবিতা শোনা গেলো, বুঝলাম না অবশ্য বিশেষ কিছু, তবু ভালো লাগলো। শিল্পীদের সংঘবদ্ধ ভাবে এগোবার চেষ্টা হলে শিল্পজগৎ যে অশেষ সমৃদ্ধ হবে সন্দেহ নাই। সরমণ্ডলে একটা introductory speech দিলেন।

আব একদিন এই গণেশ মণ্ডলে এসেছিলাম। ছাত্রদের একটা মিটিং ছিলো। এখানকার meeting-এর নিয়ম হচ্ছে Invited guest শুধু আসতে পারবে, বাইরের কেউ নয়। Invited guest-দের meeting এ I. B. আসতে পারবে না। সেখানে যে কোন আলোচনা চলতে পারবে। এখানকার meeting-এর ধরনটা একটু

অভিনব লাগলো। চেয়ার টেবিলের বালাই নেই। সভাপতির পাশে মস্ত একটা তাকিয়া। Meeting আরম্ভ হলে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা দিলেন। একজন ছাত্র August আন্দোলনকে সমর্থন করে জোর বক্তৃতা দিলেন। কমিউনিষ্ট ছাত্র লাগুও উক্ত বক্তৃতার প্রতিবাদ করে এক বক্তৃতা দিলেন! যুক্তির কথা বাদ দিলেও বক্তৃতার ধরনটা August আন্দোলন সমর্থনকারী ছাত্রটিরই ভালো লাগলো। Meeting এর শেষে লাগু, রাজু প্রভৃতি কয়েক জন উৎসাহী ছাত্র নেতার সঙ্গে আলাপ হলো। লাহিড়ীর বন্ধু শুনে আরও অনেক ছাত্র আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। ঝালোয়ারের রামজীলাল আগরওয়ালা তাদের মধ্যে একজন। রামজীলাল এখানে হোলকার কলেজে পড়েন। হোষ্টেলে থাকেন। একদিন আমাদের খেতে আমন্ত্রন জানালেন।

আর একদিন যশার সঙ্গে কাশীবাঈ-এর ওখানে বেড়াতে গেলাম। কাশীবাঈ হচ্ছেন যশার কাকার ছাত্রী, ইন্দোরের শিক্ষয়িত্রী। প্রথম আলাপেই কাশীবাঈ-এর মুখের ওপর এমন একটা স্নেহশীলতার ছাপ দেখতে পেলাম যাতে তৃপ্তি বোধ না ক'রে পারলাম না। বাঙালীর মেয়ের মতই কথাবার্তা আদর অভ্যর্থনা। বাঙালীর সংস্পর্শে এসে বাঙালীর ভাবে অনেকটা ধোপ দুরস্ত হ'য়ে পড়েছেন। ওঁর মুখে বাংলা কথা এমন চমৎকার লাগছিলো! আর, হাসি তাঁর মুখে লেগেই আছে, হাসিতে যেন মধু ঝরে পড়ছে। সত্যিকার খোট্টা মারাঠিদেশে এমন স্নেহের স্পর্শ পাবো আশা করি নি। কাশীবাঈ না খাইয়ে ছাড়বেন না। স্নান করে নিতে বললেন। তাঁর ছাড়া একখানা বিরাট সাড়ি স্নান করবার জন্যে দিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যেই স্নানের ব্যবস্থা। স্নান করে খেতে বসলে কাশীবাঈ ভাত নিয়ে এলেন। কে বলবে তিনি একজন training পাশ mistress! কাছে বসে খাওয়ালেন—কত গল্প করতে লাগলেন। ব'ললেন, বাংলায়

খাবার একবার ভারী ইচ্ছে। ঘরের এক কোণে তাঁর বাবা বসেছিলেন। তাঁর নাকি একটু মাথার দোষ আছে। এই বৃদ্ধ বিকৃত-মস্তিষ্ক বাপের তদারকীর ভার তাঁর ওপর। বুড়ো ঘরের এক কোণে ব'সে আপন মনেই বিড় বিড় করছেন। কাশীবাঈ ডাল ও তরকারীর মাঝামাঝি এক জাতীয় জিনিস রেঁধেছেন—ওর নাম ব্যাসন। এটা নাকি মারাঠিদেশের অপূর্ব খাবার—জয়পুরের অপূর্ব খাবার যেমন চুর্মা এবং বাটী। জিনিসটি অপূর্ব না হলেও পূর্বে খাই নি কোন দিন। বেশ লাগছিলো। কাশীবাঈকে সন্তুষ্ট করার জন্যে বার বার চেয়ে খেলাম। কাশীবাঈও খুব আনন্দের সঙ্গে খাওয়াতে লাগলেন—খাইয়ে তিনি বেশ তৃপ্তি পান বোঝা গেলো। তাঁর মুখের ওপর স্নেহ কোমলতার এমন একটা মাধুর্য ফুটে উঠেছিলো যা জীবনে মাত্র আমি দুজন নারীর মুখে দেখেছি—একজন হচ্ছেন আমার দিদিমা (মায়ের মা) আর একজন রাজনৈতিক জীবনে কুড়িয়ে পাওয়া মা—এক অপূর্ব মহীয়সী নারী—যাঁর তুলনা আমি নারী-জগতে কোন দিন পাই নি, এটা জোর করে বলতে পারি এবং পাবো কিনা তাও জানি না। কাশীবাঈ-এর মুখের সেই ভাবটুকু আমাকে বাংলাদেশের নীল আমগাছের পাতায় ছাওয়া একখানা স্নিগ্ধ কুটীরের আর একখানা অমনি কমনীয় মুখের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো—যিনি দেশের ও দশের জন্যে এক অভূতপূর্ব নির্যাতনের মধ্যে নিজকে বিলিয়ে দিতেও এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন নি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে একটু বিশ্রাম ক'রে কাশীবাঈকে নিয়ে আমরা ইন্দোরের পুরণো ফোর্ট দেখতে বেরলাম। রোদ্দুর চারদিকে ঝাঁ ঝাঁ করছে। কাশীবাঈ একটা ছাতা নিয়ে আমাদের পেছন পেছন আসছেন। শিশুর মত সরল এই মহিলাটি যে কোন স্কুলের একজন কাঠমুখো নীরস মিষ্ট্রেস্ এটা ভাবা যায় না। মধ্য ভারতের উষর পাহাড়ী প্রান্তর ডিঙিয়ে যে এমন একজন মহিলার সাক্ষাৎ পাবো তাও ভাবি নি।

ইন্দোর ফোর্ট দেখে আমি তো হেসেই মরি। এ আবার কেমন ফোর্ট! গোয়াল ঘরের মত খানকয়েক ঘরে গোটা কয়েক ক'রে সেকেলে গাদা কামান রয়েছে; ব্যস্ দেখা শেষ। আর কিছু নেই। এরই জন্যে এই ঝল্‌সানে রোদ মাথায় এলাম!

নিরাশ চিত্তেই ফিরলাম। ফেরার সময় বড়ই ক্লান্তি লাগছিলো—এক পরিশ্রম ও রোদের দুই, ব্যর্থতার। কাশীবাঈকে তাঁর দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। আর একদিন আসবার নিমন্ত্রন জানিয়ে কাশীবাঈ বিদায় নিলেন। ফিরতে ফিরতে ভাবলাম, কাশীবাঈ-এর সবই ভালো কেবল কাছাটা ছাড়া। কাশীবাঈ মিষ্ট্রেস্ হয়েও পুরাণো যুগকে একেবারে miss করেন নি। আধুনিক ও পৌরানিক যুগের এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ ওই কাশীবাঈ,। একটা টাঙা ভাড়া ক'রে বাসায় ফেরা গেলো।

ইন্দোর নাকি অহল্যাবাঈ-এর দেশ। পৌরাণিক বা আধুনিক দেখার মত এখানে তেমন কিছু নেই। পৌরাণিক তো প্রায় নেইই, আধুনিক যা কিছু আছে তাও তেমন কিছু নয়। থাকার মধ্যে আছে হুকুমচাঁদের তৈরি শীষমহল। হুকুমচাঁদের রাজকীয় প্রাসাদও এখানে আছে। শীষমহল দেখবার মত বটে। আগাগোড়া নানা ধরনের কাঁচ ঝক্ ঝক্ করছে। চারদিক থেকে যেন আলো বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে। শুনলাম, এটা তৈরি করতে প্রায় এককোটী টাকা খরচ পড়েছে। অবশ্য, অনেকক্ষণ ধরে দেখবার মত কিছু এতে নেই। বিশ্লেষণ করবার কিছু খুঁজে পেলাম না। শুধু এর জাঁকজমকের ঔজ্জ্বল্য দেখে ব'লতে ইচ্ছে হ'লো চমৎকার।

হোলকারের পুরণো প্রাসাদ শহরের মধ্যেই। ঢুকতে অনুমতি লাগে। সে চেষ্টাও করি নি। নতুন প্রসাদ শহর থেকে কিছুদূরে এক চমৎকার নির্জন স্থানে। নিবিড় গাছের ছায়ায় স্থানটা শীতল। সেই গাছের

ফাঁকে ফাঁকেই হালফ্যাসানে তৈরি কাঠের কাজ করা হোলকারের আধুনিক প্রাসাদ দেখা যায়। শুনলাম, একটা নাচের ঘরও নাকি তৈরি হয়েছে। সেই নয়াদিল্লীর কথাই নতুন ভাবে মনে প'ড়লো। জীর্ণ কুটীরের অসহায় প্রলাপ যে দেশে ভিরমী খেয়ে মরে সে দেশে এই ঝকঝকে আলোছায়ায় রহস্যময় প্রাসাদের অর্থ কি তা আমাদের মত সাধারণ লোকে বুঝতে পারে না, বুঝতে চায়ও না। যুদ্ধের সংকটে রাজ্যের জনসাধারণের জীবন দেউলে হ'য়ে যেতে ব'সেছে, এদিকে সোনার দেউলে নীল আলোর তলে অর্ধনগ্ন বল-ড্যান্সের আয়োজন! কিন্তু এই আড়ম্বরেও হোলকার সাহেব সন্তুষ্ট নন্, তাই Holywood-এ তিনি divorce-এর পর divorce চালিয়ে নিত্য নতুন যৌবনের আরাধনায় মেতেছেন।

পুরণো প্রাসাদের পাশেই একখানা বিরাট বাড়ি (প্রাসাদও বলা যায়) আছে—যেখানে বল্‌ধা নামে নাকি হোলকারের এক রক্ষিতা ছিলো। শেষে তাঁকে কে বা কারা হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড বহুদিন ধরে বড় বড় অক্ষরে খবরের কাগজের নিয়মিত পাঠকদের অনেকের পক্ষেই বেশ রুচিকর হয়েছিলো। বন্ধুবর খান্দকরের কাছে সে সমস্ত ঘটনা শুনলাম।

ইন্দোরে British এজেন্সী এলাকাটা বেশ সুন্দর। চমৎকার কালো ঝক্‌ঝকে পীচের রাস্তা, কাছেই বিরাট হাসপাতাল। ওই রাস্তা ধরে অনেকটা গেলে তবে General Post Office. পথে বড় বড় সাহেবী ওষুধের দোকান। কদিন থেকে একটা কথা ভাবছি। বহুদিন দাঁতের আর পেটের রোগে ভুগে পূর্ণ রক্তশূন্যতা দাঁড়িয়ে গেছে শরীরে। শুনলাম, এখানে Dr. Mukherjee নাকি সমগ্র মধ্য ভারতের মধ্যে নামকরা ডাক্তার। হাসপাতালেও তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। তিনি ইচ্ছে করলে হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে পারেন। সে কথা শুনে ইন্দোর

সম্বন্ধে নতুন ক'রে ভাবতে আরম্ভ ক'রেছি। লাগু, রাজুর পরামর্শ চাইলে তারাও চিকিৎসা নেবারই পরামর্শ দিলো। যশারও আপত্তি নেই। সেজন্যে একদিন যশাকে নিয়ে ডাক্তার মুখার্জীর কাছে গেলাম। কিন্তু, সেদিন যদি জানতাম সুবিখ্যাত ডাক্তারটির সম্বন্ধে এমন বিষময় এক অবমানকর স্মৃতি সারাজীবন জড়িয়ে থাকবে! যাক্, বহুক্ষণ, চাকরীর উমেদারীর মত বিনাপয়সার বড় ডাক্তার দেখানোর বিড়ম্বিত প্রত্যাশায় ব'সে থাকবার পরে ডাক্তার মুখার্জীর কাছে যাবার হুকুম হ'লো। পরীক্ষা ক'রে তিনি বললেন, হাসপাতালে ভর্তি হুন, Stool, Urine প্রভৃতি পরীক্ষার পব ভালো ক'রে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে—তাতে খরচও কম পড়বে। একটা সময় ঠিক করে হাসপাতালে পরের দিন দেখা করতে বললেন।

ফেরার পথে ইন্দোরের আর একটা দিক চোখে পড়লো। এদিকটা ত বেশ! বহু বড় বড় লোকের বড় বড় ছবির মত বাড়ি।

পরের দিন হাসপাতালে গেলাম ঠিক সময়ে। বহুক্ষণ ব'সে থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হ'য়ে নিজের ব্যাধি আর দারিদ্র্যকে ধিক্কার দিচ্ছি এমন সময়ে ডাক্তার মুখার্জীর Car ঢুকলো। এতক্ষণ ধ'রে কত Carই যে ডাক্তার মুখার্জীর ব'লে ভুল ক'রে উৎফুল্ল হ'য়ে নিরাশ হয়েছি! অবশেষে, সত্যিই বাঞ্ছিত Car-এর সাক্ষাৎ পাওয়া গেলো। একটু আড়ষ্ট ভাবেই (আড়ষ্ট এই জন্য যে পরের কাছে অনুকম্পা পেতে যাচ্ছি—আর, একটু এই জন্যে যে নিজের রাজনৈতিক চেতনা আড়ষ্টতার কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হ'তে দেয় নি) ডাক্তার মুখার্জীর সঙ্গে দেখা ক'রলাম। তিনি একটা খালি সিটে ভর্তি ক'রে নেবার নির্দেশ দিলেন। তাঁর Assistant আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা খালি সিট দেখিয়ে ব'লে দিলেন কাল এই সময়ে জিনিসপত্র নিয়ে চ'লে আসবেন। বেশ স্ফূর্তিতেই ফিরে এলাম। যাহোক, এবার রোগের যা হয় একটা হিল্লে হবে!

মানুষ ভবিষ্যৎকে দেখতে পায় না তাই রক্ষে, সময় সময় তার অহেতুক স্ফূর্তিও বাধা পায় না।···যশার কাছ থেকে কিছুদিনের মত বিদায় নিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হ'লাম। আমার ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছিলো তবু কেমন যেন বিষণ্ণ ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়েছিলাম। হাসপাতালের বন্দী জীবন! ভরসা ছিলো যশা রোজ একবার ক'রে যাবে আর, লাগু এবং রাজু আমাকে খাবার পৌঁছে দেবে। কিন্তু, হাসপাতালে গিয়ে দেখি চাকা ঘুরে গেছে। The seat has already been filled-up. Well, let me see what I can do for you. বা রে, মজা মন্দ নয়! যে seat alreadyর চেয়ে already booked হ'য়েছিলো সে seat filled up হয় কি ক'রে? mysterious! ব'সে আছি তো ব'সেই আছি। সেই assistant দেখি একজন female nurse-এর সঙ্গে আমাকে দেখিয়ে কি আলোচনা করছে। বড়ই অস্বোয়াস্তি এবং depressed লাগছিলো। অপরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে একেবারে একা একা! অনেকক্ষণ ওদের সাড়াশব্দ না পেয়ে শেষে ধৈর্য হারিয়ে ওকে এক ঘরে আবিষ্কার ক'রে জিজ্ঞেস করলাম, well, sir—what about the arrangement? তিনি সেই রকম মাথা চুলকিয়েই উত্তর দিলেন you better avail yourself of the next chance, what has been done can't be undone now, you see. The tragedy is all due to my forgetfulness. একে বহু দূর থেকে রোদের মধ্যে দুর্বল শরীরে হেঁটে আসছি, তায় শুধু শুধু আমাকে এরকম বসিয়ে রাখা হ'য়েছে তার ওপর বাসায় ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থাও নেই—চাবি যশার কাছে—একেবারে ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠলাম—And I have to knock out the street windows only for your forgetfulness, sir, I have taken leave of my friend's shelter only to suffer for your sheer irresponsibility.

—What !—irresponsibility ?—ক্ষেপে গিয়ে তিনিও বলে উঠলেন (যেন Already booked seat অন্যের কাছে ভাড়া দিয়ে তিনি মস্ত responsibilityর কাজ করেছেন)—Go report my conduct to Dr. Mukherjee. He will arrange your seat.

বুঝলাম, reportএর ভবিষ্যৎ তাঁর বেশ জানা আছে ব'লেই তিনি এমন নিশ্চিন্তভাবে কথাটা ব'লে ফেললেন। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার তিনিও তো অংশ। রাগে সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো ! Well you may be assured of that when you crave for it ! এই বলে চলে এসে সেই বেঞ্চে বসলাম। সমস্ত পৃথিবী যেন পায়ের তল থেকে সরে যাচ্ছে। কিন্তু, যেখানে বিচারের আশা ক'রেছি সেখানে বিচার যে কত অন্ধ তা সে সময় বুঝিনি—বুঝলেই বা কি করতাম। মানুষ ভাগ্যি ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না—তা'তে একদিক দিয়ে সত্যিই শান্তি নইলে, কি ভরসায় সেই মুহূর্তে ফুটন্ত আগ্নেয়গিরির রুদ্ধ আক্রোশকে শান্ত করতে পারতাম !

ডাঃ মুখার্জী এলেন। তাঁর assistant আগে থেকেই সম্ভবতঃ তাঁর কান ভারী করে রেখেছিলেন। আমার report করার আগেই assistant Dr. Mukherjee কে ঘটনাটা বিকৃত ক'রে ব'ললেন। ডাক্তার মুখার্জী তাঁর সুগম্ভীর মুখখানা আমার দিকে ঘুরিয়ে শ্লেষের সঙ্গে একবার জিজ্ঞেস ক'রলেন। Did you call my asssistant irresponsible ? Yes sir, but...

Oh, no question of 'but' here everything ends বলেই তিনি টুপি নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে গেলেন ; একবার আমার কাছ থেকে কোন কিছু শোনার ধৈর্যও দেখাতে পারলেন না। মনে হ'লো যেন আমাদের দেশের Royal Commission এর তিনি একজন সদস্য। এদেশী লোকদের ব'লবার কিছু থাকতে পারে Royal Commission-এর সদস্যরা সেটা

ভাবতে পারে না। Dr. Mukherjee গট্ গট্ ক'রে হাকিমী চালে চলে গেলেন। আমার চোখ ফেটে জল আসতে চাইলো—কিন্তু, বহুদিন বহুভাবে রুদ্ধ হ'তে হ'তে অশ্রুর পথ যেন একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। তাই, অশ্রু আর ঝ'ড়ে প'ড়লো না, অদৃশ্য অন্তরের মধ্যে তার রুদ্ধ আক্ষেপ শুধু অনুভব ক'রতে পারছিলাম। এক কথায় এত বড় সুযোগ চ'লে গেলো। মনের দুর্বলতায় কত কি হীন চিন্তা প্রশ্রয় পাচ্ছিলো কিন্তু, নিজের মনুষ্যত্বকে খাটো করা—পুরুষত্বকে খর্ব করা—একটা অলীক ষড়যন্ত্রের পায়ে আত্মবলি দেওয়া—না, সে সম্ভব নয়। তাহ'লে এতদিনে সুস্থ দেশপ্রেম, সত্যের জন্যে কারাগারের লাঞ্ছনা, বৃহত্তর জীবনের জন্যে শত সহস্র লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ব্যর্থ হ'য়ে যায়। চুলোয় যাক্ ডাক্তার মুখার্জী, চুলোয় যাক্ তার assistant এদের এই আত্মম্ভরিতা, এত মেদস্ফীতি, ভ্রূকুটি, এই আমলাতান্ত্রিক দম্ভ ও দুর্নীতি এরই বিরুদ্ধে তো আমাদের সংগ্রাম। ভাবীকালই শুধু আমার সেই লাঞ্ছিত মুহূর্তে আশ্বাসভরা হাত এগিয়ে দিলো। নতুন সংকল্প নিয়ে বন্ধুর কারখানায় ফিরে গেলাম। সব ব'ললাম তাকে। সে ব'ললো ওরা ওই রকমই করে। পকেটে কিছু পড়েছে বোধ হয় অমনি booked seat unbooked হ'য়ে গেছে। চাবি নিয়ে ক্লান্তভাবে বাসায় ফিরে গেলাম।

দেওয়াস

চিকিৎসার এত বড় সুযোগ চলে গেলো। দেশে ফিরে গেলে নানা হাঙ্গামে জড়িয়ে আর চিকিৎসার সুযোগ পাবো না—অথচ, কাজ যে কিছু করতে পারবো তাও নয়—নড়াচড়া করতে পর্যন্ত দুর্বলতা এবং অসাড়তা বোধ হয়। ছ্যাকরা গাড়ির মত জীবনের দাম কি হবে, দেশের সমস্যা এমন জীবনের কাছে কিছুমাত্র প্রত্যাশা রাখে না। শেষে চক্ষুলজ্জা কাটিয়ে মামার কাছে এবং মার কাছে এক চিঠি দিলাম। চিকিৎসার জন্যে কিছু টাকা দিতে পারেন কিনা। টাকা এলে দেওয়াসের নামকরা ডাক্তার Dr. Pandeর কাছে চিকিৎসা নেওয়া ঠিক করলাম। দেওয়াসে যশার কাকা থাকেন। তিনি সেখানকার বাণিজ্য এবং শিক্ষা সচিব। একদিন আমি আর যশা দেওয়াসমুখো রওনা দিলাম। এখান থেকে দেওয়াস বাসে যেতে হয়—তেইশ মাইলের মত পথ। journeyটা বেশ লাগলো। চারদিকে ধূ ধূ করা প্রান্তর। মাটির রং কালো। বুঝলাম, এটা black soil এর দেশ। তুলো এ মাটিতে ভালো হয়। পথে কাস্টমস্ হাউস পড়লো। দেওয়াস এবং ইন্দোর ষ্টেটের মধ্যে মাল যাতায়াতের শুল্ক আদায়কারী অফিস এটা। বাস্ এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। এর পরে শিপ্রা নদী পড়লো। কালিদাসের সেই শিপ্রা। ঐতিহাসিক গন্ধ যেন এর চকচকে জলে মাখানো রয়েছে। কিন্তু, কল্পনার শিপ্রার সঙ্গে এর মিল কই! শিপ্রা নদীতে অনেকে পূজো দিচ্ছে। মোটর কিছুক্ষণ থামলো। এই শিপ্রা নদীতে নাকি একরকম ছোট ছোট মাছ পাওয়া যায় এবং সেই মাছই এখানকার প্রধান অবলম্বন।

সন্ধ্যা হ'য়ে আসছিলো। সামনেই দেওয়াসের পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে শহরের বিদ্যুতের আলো চিক্ চিক্ করছে। শহরে ঢুকতে একটা তোরণদ্বার চোখে পড়লো। বাসায় পৌছতে পৌছতে রাত হ'য়ে গিয়েছিলো। আমাকে দেখে তো মামিমা অবাক। সব বললাম তাঁকে। সবাই সিনেমা যাবার জন্যে তৈরি হ'চ্ছিলেন। আমাদের আসায় একটু বাধা পড়লো। তবে বাধা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা আমরাই ক'রে দিলাম—খেয়ে দেয়ে বাইরে উঠোনে টানা ঘুম।

সকালে মামার সঙ্গে Dr. Pandeকে দেখানো সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। তিনি সানন্দে রাজী হ'লেন। তিনি নিজেও একজন Dr. Pandeর রোগী। এক কাপ গরম দুধ খেয়ে মামার মোটরেই Dr. Pandeর ওখানে গেলাম।

Pandeর বাড়ি লোকে লোকারণ্য। ইনি বিনা পয়সায় সবাইকে দেখেন। তাই, যত গরীবের ভিড় এখানে। Dr. Pande আবার সকালে আহ্নিক করেন ঘণ্টা দুয়েক ধ'রে। বহুক্ষণ বসে থেকে তাঁকে দেখিয়ে শ'দেড়েক টাকার একটা লম্বা Prescription করিয়ে তবে ফিরলাম। এঁর চিকিৎসা রীতিমত জহ্লাদী—শুধুই injection. গোটা বাটেক injectionএর ফর্দ নিয়ে ফিরে এলাম।

বাসায় এসে চন্দ্রশেখর যাদব নামে একজন মারাঠা যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'লো। এঁর জীবনের অধ্যায়গুলো নাকি নানা করুণ ঘটনায় ভর্তি। ভদ্রলোক প্রায় আট বছর ধ'রে পেটের কি একটা অসুখে ভুগছেন—রোগে শয্যাগত থাকার সময় এঁর বাপ-মা মারা যান। সে আঘাত ইনি আজও সামলে উঠতে পারেন নি। পাশেই এঁর বাসা। তাঁর কুঁড়ে ঘরে আমাকে নিয়ে গেলেন। আলাপ ক'রে বুঝলাম ভদ্রলোক সমাজ-রাষ্ট্র সম্বন্ধে বেশ progressive idea পোষণ

করেন। Temperamentally ইনি একজন কবি। School Magazine এ লেখা এঁর একটা কবিতা প'ড়তে দিলেন। কবিতাটা বেশ চমৎকার লাগলো—কবিতাটা অবশ্য ইংরাজীতে। আলাপ ক'রে বুঝলাম ভদ্রলোক বেশ বুদ্ধিমান—এবং বেশ parts আছে মনে হয়। রোগে রোগে ইনি পঙ্গু হ'য়ে আছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই এঁর সঙ্গে গাঢ়তর বন্ধুত্ব জ'মে গেল। সে বন্ধুত্ব হাজার দেড়েক মাইলের ব্যবধানেও আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

Prescription নিয়ে ইন্দোরে ফিরে এলাম। কয়েকদিন টাকার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব থাকার পর আমার টাকা সত্যি এলো। মা-ও টাকা পাঠাচ্ছেন লিখলেন। যাক্‌, এবার নিশ্চিন্ত মনে চিকিৎসা আরম্ভ করা যায়।

Bengal Immunityর এক ভদ্রলোকের পরিবারের সঙ্গে যশার খুব বন্ধুত্ব, সেই সূত্রে আমার সঙ্গেও আত্মীয়তা জ'মে উঠলো। ওঁর স্ত্রীকে আমরা বৌদি ব'লে ডাকতাম। মাঝে মাঝে তাঁর বাসায় গিয়ে রুটি-চা প্রভৃতির সংযোগে বেশ আড্ডা জমতো। ওঁরই দোকান থেকে সব ওষুধ কিনতাম। ভদ্রলোক Pandeর prescription দেখে শিউরে উঠে বললেন, লোকটা যে একেবারে কসাই। তাঁর prescription এর মধ্যে যেন ষাটখানা syringe এর সূচ উদ্যত হয়ে আছে।

হোটেল charge ভয়ানক বেশি। রাজুকে আমার অবস্থার কথা ব'ললে সে তার বাড়িতে মাস দেড়েক থাকার বন্দোবস্ত স্বচ্ছন্দে ক'রে দিলো। আমি তো একেবারে অবাক। এতটা সত্যিই আশা করি নি। জীবনে যার সঙ্গে চেনা শুনা তো দূরের কথা দেখা হয় নি পর্যন্ত, সে কিনা একটা মুখের কথায় এতটা ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী হ'য়ে গেলো! আমি তো রাজুর অবস্থা জানি। একে রাজনীতি করে সে, তার ওপর রোজগার করে না প্রায় কিছুই।

বাবাও তার বেঁচে নেই! অথচ···কিন্তু, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন সেখানে সামান্য স্বার্থ নিয়ে যেমন ঝগড়াঝাটিও চলে তেমনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগেও তার পৃষ্ঠা ভরপুর। অন্ধ কারাগার থেকে মানুষের আত্মাকে রাজনৈতিক চেতনা উদ্ধার করে বলেই রাজু তার দারিদ্রের মর্ম কেন্দ্রেও আমাকে স্থান দিতে এতটুকু সঙ্কুচিত হয় নি। রাজুর হৃদয়কে কি দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবো জানি না। অবশ্য, এর পেছনে লাগুর প্রচেষ্টাও কম কার্যকরী হয় নি।

লাগু। চমৎকার ছেলে লাগু। ওর পেছনে এক দীর্ঘ নির্যাতনের ইতিহাস আছে। এর আগে সে গোয়ালিয়রে ছাত্র ফেডারেশনে কাজ ক'রতো। সেখান থেকে ওকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর আরও অনেক জায়গায় ঘুরে সে এখানে এসেছে। এখানে রাজুর বাসাতে সে-ও স্থান পেয়েছে। রাজু আর লাগু দুজনে ঠিক মাণিক জোড়। গলায় গলায় ওদের ভাব। লাগুর স্বাস্থ্যটি হিংসা করবার মত। দুজনেই ওরা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। একদিন অবাক হ'য়ে শুনলাম, লাগু এক রাস্তায় ইট টানবার কাজ নিয়েছে। এখানে বাংলা দেশের মত মধ্যবিত্ত অভিজাত কম থাকলেও এতটা যে কম তা ভাবতে পারি নি। রাজু সম্প্রতি এক grain shopএ কাজ পেয়েছে। দুজনে অনেক বেলায় ফেরে। আমার খাওয়া অবশ্য আগেই হ'য়ে যায়। এদের পরিবারে স্থান পেয়ে মারাঠী পরিবারের সম্বন্ধে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা জন্মেছে। আমি রাত্রে শুই যশার ওখানে—খেতে আসি বেলা এগারোটায়। রোদের জন্যে দুপুরে আর ফিরে যাই না। আবার রাত্রে খেয়ে যাই। খাবার বানাতে যেদিন দেরি হয় সেদিন ঘরে ব'সে পড়ি। রাজুর এক বোন আছে (তার নাম ভুল হয়ে গেছে ; ধরা যাক তার নাম নলিনী) সে খাবার হ'লে এসে ডাকে, অমল

তুমহারা খানা তৈয়ার হ্যায়! এতবার এই কথাটা শুনেছি এবং এত মিষ্টি লাগতো শুনতে যে, মনে হয় আজও যেন এই ডাক শুনতে পাচ্ছি।

রাজুর মা একটু কাঠখোট্টা গোছের লোক। এঁরও কাছা আছে। আমাদের দেশের মেয়েদের মত ঘর সংসারের জন্যে এদের অত বেশি খাটতে দেখি নি—জানি না এটা এখানকার স্বাভাবিক নিয়ম কিনা। অবশ্য এদের খাবার ব্যাপারটা খুবই সহজ। রুটি আর ডালই প্রধান। হাঙ্গামা নেই কোন। রাজুর মা শেষের দিকে প্রায়ই দু'বেলার রুটি এক বেলাই বানিয়ে রাখতেন খেতে ব'সে টের পেতাম। দু'বেলা রাঁধার হাঙ্গামা হয়তো এই ভাবে বাঁচতো। আমাদের দেশে মেয়েদের খান্নাটা যেমন বেদ মন্ত্রের মতই পবিত্র এবং অলঙ্ঘনীয় এখানে সম্ভবতঃ তা নয়।

এর পরে লাগুর মা-বাবা-বোন প্রভৃতি সব একদিন এলেন। এঁবা পাকাপাকি এখানে থাকবেন। ঘরও কাছাকাছি একটা ভাড়া নেওয়া হলো। এঁরা আসার পর থেকে আমার একবেলা খাবার ব্যবস্থা এখানেই হলো। লাগুর মা খুবই স্নেহশীলা; মুখে মাতৃত্বের মাধুর্য তাঁর সব সময়ই যেন ফুটে আছে। ডাক্তারের নিষেধের জন্যে আমি সব কিছু খেতে পারতাম না বলে তিনি রীতিমত কুণ্ঠিত হয়ে পড়তেন। এঁদের তরী তাক্ (অর্থাৎ ঘোল) আর রুটি চমৎকার লাগতো খেতে।

লাগুর পরিবার আসার পর নলিনীর এক বন্ধু জুটলো, সে লাগুরই ছোট বোন। দুজনে অনবরত দুর্বোধ্য হাসাহাসি করে আমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতো। নলিনী একদিন ব'ললো, অমল, আমাকে একটা 'পুতলাই' এনে দেবে? পরদিন তার জন্যে একটা পুতলাই নিয়ে এলাম, লাগুর বোনের জন্যেও একটা। পুতলাই পাবার পর থেকে ওরা আমাকে দেখলেই অমল, পুতলাই এনেছো বলে ছুটে আসে। দরজায়

ধাক্কা দিলেই নলিনী পুতলাই (পুতলাই হ'চ্ছে পুতুল) করতে করতে খিল খুলতে আসতো। খিল্ খুলবার আগে একবার জিজ্ঞেস করতো অমল, পুতলাই এনেছো তো? এরা সবাইকেই নাম ধরে ডাকে। ওর বড় ভাই রাজুকে সে রাজু বলে ডাকে। লাগুর বাচ্চা বোনও তাকে লাগু বলে। শুনতে বেশ মিষ্টি লাগে। লাগুর বোনটা তো একেবারে টুকটুকে আলুর পুতুলের মত। নলিনী স্কুলে পড়ে। হিন্দি বোঝে তাই, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলা চলে। কিন্তু, লাগুর বোন খাটি মারাঠী, হিন্দীর সে বিন্দু বিসর্গও বোঝে না। ওর দিকে তাকিয়ে নলিনীকে কিছু বললে ও নলিনীকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—কি ব'ললো রে? অবশ্য, আমিও তার কথা কিছুই বুঝি না; শুধু ইঙ্গিতে বুঝি। নলিনীর সঙ্গে সঙ্গে ও-ও আমাকে অমল তুমহার খানা তৈয়ার হ্যায় ব'লতে শিখেছে। বেশ লাগতো এদের মধ্যে দিন কাটাতে।

এদিকে ডাক্তারের Injection নিতে নিতে আমার জীবন দুর্বিসহ হ'য়ে উঠলো। বন্ধু খান্দকর কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে তাঁদের কাছে বিনা পয়সায় Injection নেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। কিন্তু, সস্তার তিন অবস্থার মত আমার অবস্থাও সঙীন হয়ে উঠলো। প্রায় আটটায় বেরতাম আর ফিরতে ফিরতে প্রায় বারোটা হয়ে যেতো এক একদিন। Dr. Kulkarini-এর কাছ থেকে শুরু ক'রে Dr. Vahrao, Dr. Kunte পর্যন্ত যেদিন যার কাছে সুযোগ সেদিন তার কাছেই যেতাম। কিন্তু ব'সে থাকতে থাকতে জান বেরিয়ে যেতো। বিনা পয়সার রোগী অধীর হবার উপায় নেই। সূঁইএর বেদনার চেয়ে বিমর্ষ প্রতীক্ষার বেদনাই আমাকে পীড়িত করতো বেশি। ডাক্তারদের সঙ্গে সুযোগ পেলে রাজনৈতিক তর্কও উঠতো কিন্তু প্রায়ই তাঁরা ব্যতিব্যস্ত থাকতেন।

একদিন Dr. Kunteকে Cold drink এ নিমন্ত্রণ করলাম। নিজের তরফ থেকে সৌজন্যের জন্যেই এই ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু, সৌজন্য দেখাতে গিয়ে প্রায় অসৌজন্য সৃষ্টি ক'রে বসেছিলাম আর কি! সেই সন্ধ্যা আটটায় বসেছি Kunte-র প্রতীক্ষায় আর দোকান থেকে বেরতে বেরতে প্রায় রাত এগারোটা হয়ে গেলো। খুবই বিরক্ত হ'য়েছিলাম সেদিন! এই বিরক্তিকর প্রতীক্ষাই ইন্দোরের স্মৃতিকে চিরকাল আমার কাছে তিক্ত ক'রে রাখবে। উঃ, সে দুরবস্থা ভুলতে পারবো না। পরের অনুকম্পা যে কি ভীষণ Depression এনে দেয় মনের ভেতর তা আর বোঝাই কেমন ক'রে!

ইন্দোরে থাকতে থাকতেই একদিন Locust Enquiry Commision এর দুজন রাশিয়ান সভ্য ইন্দোরে এলেন। একজন Leningrad Academy of Science-এর আর একজন Bakuর। এত বড় সুযোগ জুটে যাওয়ায় বেশ উল্লসিত হলাম। Indore Friends of the Soviet Union-এর তরফ থেকে এঁদের একদিন সম্বর্ধনা জানানো হলো। Stalingrad-এর hero দের জন্যে Indore Communist Party এর তরফ থেকে একটা বই উপহার দেওয়া হলো। সম্বর্ধনার উত্তরে তাঁরা গরগর ক'রে রুষ ভাষায় কি সব ব'ললেন। সঙ্গের বৃটিশ interpreter সেটা ব্যাখ্যা ক'রে দিলেন। ওঁদের দুজনের মধ্যে একজনের (যিনি Leningrad Academy-র সদস্য) মুখে এমন শিশু সুলভ মধুর হাসি লেগে যে, একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে যেতে হয়। মুখের ওপরই যেন তাঁর সুনির্মল হৃদয় বিকশিত হয়ে উঠেছে।

সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির একটা অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং ইংরাজীতে লেখা একটা প্রবন্ধ পাঠ ক'রেছিলাম। প্রবন্ধ শুনে খান্দকরের দাদা খুব খুশি। আদর করে এক রেষ্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে সরবৎ খাওয়ালেন। তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমে গেলো।

এর মধ্যে যশার মিলও ঘুরে দেখে এসেছি যশার কাজের সময়। সেখানে কয়েকজন মজুর কর্মীর সঙ্গেও আলাপ হ'য়েছে—ভুরে সিং তাদের অন্যতম। ভুরে সিং মজুর আব মধ্যবিত্তের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। ওরই মধ্যে তার একটু family standard আছে যা সাধারণ মজুরের নেই। তার পোশাকে কথাবার্তায় শ্রী আছে, খাটে কিন্তু সে প্রায় মজুরের মতই। রাজকুমার মিল্‌সএও ধর্মঘটের ঢেউ এসেছিলো। ভুরে সিং মজুর আন্দোলনে উৎসাহী। সে আর তার এক বন্ধু একদিন কতকগুলো পরামর্শের জন্যে আমাদের বাসায় হাজির। লাহিড়ীর বিরুদ্ধে তাদের একটু আধটু অভিযোগও আছে। কতকগুলো গুণ্ডা ছোট ছোট ছেলেদের তাঁতে খাটিয়ে তাদের থেকে পয়সা রোজগার করে। ভুরে সিং এর অভিযোগ লাহিড়ী বাবু তাদের কাজের supervise না করে অন্যের কাজের খুঁৎ ধরে বেড়ায় কেন। ভুরে সিং বেশ ভদ্রতা জানে। হাসি খুশি চট্‌পটে লোক সে। ভুরে সিং এর কথা আজও আমার মনে আছে।

ডাক্তার আমাকে বাজার থেকে মেটে কিনে তার juice খেতে বলেছিলো। আমাদের পাশের ঘরেই এক বাঙালী পরিবার বাস করেন; যশা ভদ্রলোককে মুখুজ্জে বলে ডাকে। মুখুজ্জে মশায় আমাকে আগেই বলে রেখেছিলেন, দরকার হলে বৌদির সাহায্য স্বচ্ছন্দে নিতে পারি। মেটের juice তৈরি করায় বৌদির সাহায্য চাইলাম। অবশ্য ওতে লোকসানের কিছু নেই কেননা, এক পোয়া করে মেটে তাঁদেরই থাকতো। তবু রোজ ওইরকম ক'রে কাঁচের গ্লাসে juice দিয়ে যাওয়া? বিদেশে তাই বা কে দেয়!

মুখুজ্জে মশাই কিন্তু সপরিবারে একেবারে বিদেশী বনে গেছেন। তাঁর নিজের, তাঁর স্ত্রীর এবং তাঁর তিন বছরের ছেলে সবারই সংসর্গ প্রায় এদেশী লোকের সঙ্গে। চেহারায়ও তাঁদের পরিবর্তন ধরেছে। পাশের মারাঠী লোকটি প্রায়ই মুখুজ্জে মশাই-এর ছেলেকে আদর করে একই কথা

বলে, বাবুজী ক্যা করতে হ্যায় ? মনে হয়, লোকটার আলাপের ইচ্ছা আছে কিন্তু, ভাষার প্রাচুর্য নাই।

এখানে কাজের মধ্যে দাঁড়িয়েছে এখন সকালে উঠেই মেটে আনতে ছোটা। তারপর injection, শেষে খাওয়ার চেষ্টা। অত দূরে দূরে যাতায়াত করতে করতে প্রাণান্ত অবস্থা আর কী! ইন্দোর একেবারে তিতে হয়ে উঠলো। তার ওপর আবার আর এক মস্ত বিরক্তি বেড়েছে জলের সমস্যা। যশার ওপরের কলটা প্রায়ই খারাপ হয়ে থাকে। নিচে দুটো কল আছে কিন্তু একে টিপ টিপ করে জল পড়ে, তাতে বাড়িভরা লোক তার ওপর ঝুঁকে থাকে। কলতলায় ঝগড়া ঝাঁটি এখানে নিত্য নৈমিত্যিক শুধু নয়—প্রতি মুহূর্তের ব্যাপার। injectionএ ক্ষত বিক্ষত হাতে মস্ত বালতি হাতে সেই ভয়াবহ কল থেকে বহুক্ষণ প্রতীক্ষার পর ভয়ে ভয়ে জল নিয়ে আসি। অথচ, যশা কিছুতেই বাড়িওয়ালাকে তাড়া কসবে না কল সেরে দেবার জন্য। আর যশারই বা দোষ কি! রাতে জেগে আর দিনে ঘুমিয়ে সে কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। একদিন তাকে বললাম, যশা তুই না রাজনৈতিক কর্মী ছিলি একদিন! এমনভাবে জীবনের অপচয়ের কি অর্থ হয় বলতো? এই যুদ্ধের বাজারে কত কাজই তো পাওয়া যায় তার একটা নেওয়া কি এর চেয়ে ভালো না! এমন করে তিল তিল করে মানুষের ইতিহাস ভুলে যাওয়া—

উত্তরে যশা একটু করুণ হেসে অপরাধী, সুলভভাবে বলেছিলো, তাই ভাবছি এবার যুদ্ধের কাজেই যাবো!

সেতো ভাবছি বললো কিন্তু আমি তো তার ভাবার কোন লক্ষণ বা সুযোগই দেখলাম না। অবশ্য ভাবনাটা মানুষের আন্তরিক, বাহ্যিক নয়।

এখানে মজুমদার বলে একজন মারাঠী কমিউনিস্ট কর্মীর সঙ্গে আলাপ হ'লো। এত চমৎকার লাগতো তার কথাবার্তার ধরন ধারন। বাংলাদেশের কত খবর সে রাখে। কত নির্যাতনই না সে এর মধ্যে ভোগ করেছে। আমি তো দেখেছি কত কষ্টে সে খাওয়া দাওয়ার সংস্থান করে, তার সঙ্গে দেশের কাজও প্রাণ দিয়ে করে। মায়ের একমাত্র ছেলে সে পালিয়ে এসেছে। মায়ের সাংসারিক অবস্থা অচল তবু সে নির্বিকার ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ স্বার্থত্যাগের কি দিয়ে মূল্য দেবো জানি না। মজুমদারের মুখে হাসি লেগেই আছে। রাজুদের বাড়িতে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সে প্রায়ই আসতো। তার কাছে আমি হিন্দী শিখতাম কিছু। ইন্দোরের অনেক খবরও তার কাছে পেতাম। সব চেয়ে মজা লাগতো লাগু যখন তার তরবরে জিভ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে—গানটা আবৃত্তি করতো। মারাঠী জিভেতে বাংলা কথা চমৎকার শোনাতো—শিশুর প্রথম ভাষা ফুটলে যেমন কষ্টে ভাষা উচ্চারণ করে তেমনি।

লাগু আর রাজু হরদম ছুটাছুটির তালেই আছে। শুধু ওরাই নয় এখানকার কর্মীদের মধ্যে বেশ একটা তৎপরতার ভাব লক্ষ্য করি আর নিজের অকর্মণ্যতার জন্যে হতাশা ও লজ্জা বোধ করি। কতদিন তেম্বেকে (আর একজন কর্মী) বলেছি একটা কাজ আমাকে দাও আমি বসে বসেও তো তোমাদের কাজে লাগতে পারি। দে'বো দিচ্ছি করে আর তার দেওয়া হয়ে উঠে নি।

পার্টি লাইব্রেরী থেকে একদিন Red Star Over China বইটা নিয়ে পড়লাম। ঠিক যেন একখানা রোমাঞ্চকর উপন্যাস। জুনিয়ার খান্দকরের স্ত্রী হচ্ছেন পার্টি লাইব্রেরীয়ান। এখানে কর্মীদের মধ্যে ঠিক আছে পার্টি পত্রিকা এলে পর পর দুদিন সবাইকে (তিনি ডাক্তারই হন আর মোক্তার উকীলই হন) পত্রিকা রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করতে বেরতে

হবে। কতদিন দেখেছি রাস্তায় রাস্তায় ওরা চোঙা ফুঁকছে—শুধু পেশাদারী হকারের মত নয় ঠিক যেন রাজনৈতিক বক্তৃতা। পত্রিকায় দেশের বর্তমান সমস্যাগুলো যে ভাবে আলোচনা হতো সে সম্বন্ধে চোঙার ভেতর দিয়ে কর্মীরা রাস্তায় রাস্তায় সাধারণ লোকের সামনে বক্তৃতা দিতো। পত্রিকা বিক্রীও হতো বেশ।

এখানে একটা ব্যাপার দেখে আমার খুব হাসি পেতো। কোন একটা কথায় সম্মতি আছে এটা প্রকাশ করবার জন্যে এখানকার লোক সাধারণতঃ মাথাটা তিন চার বার ডাইনে বামে দোলায়। ছেলে থেকে বুড়ো পর্যন্ত সবারই এক কায়দা। রীতিমত মজা লাগতো তাদের এই সম্মতি প্রকাশের ধরন দেখে।

রাস্তাঘাটে আবাল বৃদ্ধ সবার মাথায়ই এখানে ব্রাউন রংএর একরকম ক্যাপ যাকে বলা হয় Central Indian Cap. পরনে পায়জামা গায়ে হাফ সার্ট পকেট নেই কিন্তু অধিকাংশেরই। এঁরা পকেট রাখেন না, সাধারণতঃ যেমন সাইকেলে বেল রাখেন না। ব্যয় সংক্ষেপের এই ফ্যাসন মন্দ নয়।

শঙ্করার হোটেলে এখনও মাঝে মাঝে খাই। রুটির উপর শঙ্করার পালায় করে বিদ্যুদ্বেগে ঘী ঢালার কায়দা উপভোগ করি। লোকে দেখলো সে দুপালা ঘী খাচ্ছে—কিন্তু, শঙ্করার হাতের সাফাইতে তার পাতে আধপালার বেশি ঘী পড়ে কি না সন্দেহ। শঙ্করার হাতের বাহাদুরী আছে! এতে দুপক্ষেরই লাভ। খাইয়ের লাভ মানসিক আর পরিবেশকের লাভ আর্থিক। আমি হোটেল ছাড়ার পর শঙ্করা একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে বোধ হয়। চাউলের ষ্টকে দেউলিয়া হবার আশঙ্কা তার ঘুচেছে। শঙ্করা কিন্তু বেশ ভদ্রলোক। তার কাকার সঙ্গে বহু ছোট থেকে সে হোটেল করছে। লোকজন বেশি না থাকলে খেতে খেতে শঙ্করার সঙ্গে সঙ্গে অনেক গল্প করতাম।

এখানকার নামকরা একটা খাবার হচ্ছে শ্রীখণ্ড। দইএর এক ধরনের বিশেষ রকমের তৈরি। দেখতে অনেকটা বেলপানার মত। তাছাড়া এখানে সুস্বাদু খাবারের পরিমাণ বড় কম। ইউ, পির একজন লোকের এক মিঠাইএর দোকান আছে। বাংলার মত রসগোল্লা সন্দেশ নেই। প্রায়ই ঘীয়ে ভাজা, তেলে ভাজা খাবার। একদিন পাঁউরুটি কিনতে গিয়ে আমি মহা বিপদে পড়েছিলাম। কিছুতেই দোকানীকে বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না সে অপূর্ব জিনিসটি কি, শেষে পাশ থেকে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, ডবল রোট্টি, ডবল্ রোট্টি। ডবল রোটি পাওয়া গেলো না বটে কিন্তু, নামটা আবিষ্কার করা গেলো।

বিকেলের দিকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এক একদিন বাজারের মধ্যেকার রাস্তার ধারের পার্কে গিয়ে বসতাম। বড়ই বিষণ্ণ লাগতো সে সময়, এত একা লাগতো! আসে পাশে সবাই সঙ্গী সাথী নিয়ে হাসি ঠাট্টা গল্প গুজোব করছে আর আমি বসে বসে ভাবছি কাল আবার কার কাছে Injection নিতে যাবো। Kunte যা দেরি করে তাতে তার কাছে যাওয়া আর ভালো লাগছে না। Injection এর কথা মনে হলে এতই হতাশা আসতো মনে। মনের বিষণ্ণতা ঢাকবার জন্যে মাঝে মাঝে কাঠিতে করা Ice cream কিনতাম কিন্তু Ice cream-এর শীতলতাও মানসিক বিষণ্ণতার উত্তাপকে এক একদিন ঢাকতে পারতো না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'একা' প্রবন্ধটির কথা তখন মনে হ'তো। আমার এই নিঃসঙ্গতার জন্যে দায়ী ধনতান্ত্রিক জগতের বিরুদ্ধে মানসিক বিদ্রোহ অনুভব করতাম। যে ব্যবস্থা মানুষকে একান্তভাবে নিঃসঙ্গ গণ্ডীবদ্ধ নিজ ভাগ্য নির্ভরশীল যন্ত্রের মত জড় জীবনের অভিশাপ এনে দেয় সেই ব্যবস্থাই তো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা! মানুষের সঙ্গে মানুষের cash nexus ছাড়া অন্য সম্পর্ক নাই। সহযোগিতা সহগামিতার ক্ষেত্র কত সীমাবদ্ধ! আপন আপন জীর্ণ পরিবেশের মধ্যেই পাক খেয়ে যাওয়া

যে জীবন তার মর্মদাহে সান্ধ্য আকাশ যেন লাল হয়ে উঠতো। ঝিক ঝিক্ করে মোটর ছুটেছে—দোকানে দোকানে আলোর মালা ঝুলছে। সান্ধ্য আকাশে নক্ষত্রের কাঁপন লেগেছে—আমি ব'সে ব'সে ভাবছি—ভাবছি অতলস্পর্শী অন্ধকারের মধ্যে ব'সে—এই সঙ্গীহীন নিঃসীমতার দিন কি সত্যিই ফুরিয়ে আসবে! ফুরিয়ে যে আসবে তা জানি এবং সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি তবু আজকের এই বিষণ্ণ সন্ধ্যার গাঢ় ছায়ায় ব'সে যেন নিজের অজ্ঞাতেই সে বিশ্বাসের পথ থেকে কত দূরে চ'লে গিয়েছিলাম।...ওঠা যাক্—রাজুর বাড়িতে আব'র সকাল সকাল খাওয়া হয়। অবশ্য এখানকার লোক সাধারণতঃ সন্ধ্যার মধ্যেই খেয়েদেয়ে নিজের কাজকর্ম ক'রে—বেড়ায়, সিনেমা দেখে। ব্যবস্থাটা মন্দ নয়। খেয়ে দেয়ে একা একা যশার নির্জন অন্ধকার ঘরে গিয়ে ঢুকি—খাটিয়াটি জানালার ধারে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ি—যা গরম! পাশের ঘর থেকে হিন্দুস্থানী একজন প্রাইভেট টিউটারের তার ছাত্রকে ধারাপাত শেখাবার অদম্য চেষ্টার সুর ভেসে আসে। ছেলেটা কি এতই অকাট—রোজই এক কথা পড়ে! অকাট না হ'লে কি আর কেউ প্রাইভেট টিউটার ডাকে! ওরা তো আর বড়লোক না যে,Furniture এর মত মাষ্টার দিয়ে ঘর সাজিয়ে রাখবে!

মেঘদূতের দেশে

ডাঃ পাণ্ডেকে আর একবার দেখাবার জন্যে দেওয়াস এসেছিলাম। মামাকে ব'লে মোটরে ক'রে উজ্জয়িনী trip দেবার লোভনীয় ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছি। কি যে আনন্দ লাগছে! অসিত, অমিয়, আমি, মামা-মামী আর তাঁদের ছোটমেয়ে ইতু—সবাই মিলে উঠে বসা গেল। আগুনের মত তাপ এসে ঝলসে দিয়ে যাচ্ছিলো—তার ওপর এঞ্জিনের গরম এবং গ্যাসোলিনের গন্ধ। এত বিড়ম্বনা সত্ত্বেও ভালো লাগছিলো। ভালো লাগছিলো এই মনে ক'রে যে, শৈশবের মধুর স্মৃতির দেশ উজ্জয়িনী নিজের চোখে দেখতে পাবো। কালিদাস, বিক্রমাদিত্য—বত্রিশ সিংহাসন, পুতুলের গল্প, বিচারক রাখাল কত কিছু গল্পের স্মৃতি সেই কল্পদেশের মাটি জড়িয়ে র'য়েছে। সবার ওপরে আছে মেঘদূত—কুচিফুল, শিপ্রা, অলকা, রামগিরি—চমৎকার সব নাম, কি অনবদ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য মেঘদূতের পাতায় পাতায়! জানি না সেই মানস-লোকের উজ্জয়িনীকে সেখানে খুঁজে পাবো কিনা। দিদিমার জন্যে দুঃখ হচ্ছিলো। যে বৃদ্ধা একদিন এই অপূর্ব দেশের রহস্যোদ্ধার এক অবোধ দুরন্ত শিশুর কৌতূহলী চোখের রেটিনায় প্রথম উদ্ঘাটিত ক'রেছিলো সে বৃদ্ধা জানতেও পারেনি তারই বংশধর একদিন সেই কল্পলোকের মাটিতে পা ছোঁয়াবে। বিকৃত সমাজ জীবনের সহস্র জ্বালায় জ্বলে জ্বলে যে স্মরণের পারাবার উত্তীর্ণ হ'য়েছে আজ অপরাহ্নের আলোক-স্নাত উজ্জয়িনীর সীমান্ত থেকে তার সেই বংশধর তাকেই আজ প্রথম স্মরণ করেছে—সে স্মরণের মূল্য কি সে জানে না। হয়তো বা জানেও। হতভাগিনী

দিদিমার জন্যে আজ সত্যিই দুঃখ হচ্ছিলো—দুঃখ হচ্ছিলো এই মনে ক'রে যে, কাহিনীর মুখে মুখেই যে উজ্জয়িনীর মাঠে-ঘাটে বিচরণ ক'রছে, বাস্তবে সেই মাঠে-ঘাটে পথে-প্রাসাদে বিচরণ ক'রতে পারলে সে কত খুশি হ'ত! হায় অভাগিনী দিদিমা!

উজ্জয়িনীর কাছাকাছি একটা পাহাড়ের ধারে লাল টালি-ছাওয়া কতকগুলো সুন্দর ঘরবাড়ি দেখলাম—শুনলাম, ওটা টী, বি স্যানাটোরিয়াম। স্যানাটোরিয়ামের মতই জায়গা বটে! উজ্জয়িনী শহরে ঢুকতে সৈন্যদের ছাউনি চোখে পড়লো। তারপরে শহরের সদর পীচের রাস্তা ছেড়ে ডাইনে মাঠের বাঁধারের এক সুরকির রাস্তা ধরে আমাদের মোটর চ'ললো। বাঁ ধারে এক লাইনে কতকগুলো বড় বাড়ি পড়লো তারই এক প্রান্তের এক ছোট বাড়ির সামনে আমাদের মোটর থামলো। শুনলাম এটা ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়ি—তাঁর নামটা আর শোনা হয় নি। ওপরের তলে উঠলে ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের দেখতে পেয়ে সসব্যস্তে অভ্যর্থনা করলেন। বুঝলাম এ'দের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ট পরিচয় আছে। মেয়েরা ভেতরে গেলো। আমরা বাইরের ঘরে ব'সলাম। পাখা এলো সঙ্গে সঙ্গে চা-ও এলো। বাড়ির মধ্যে বেশ একটা ব্যস্ততার আস্বাদ পাচ্ছি। ভট্চাজ মশাইএর অনেকক্ষণ পাত্তা নাই। শেষে ফিরে এলেন কোথেকে। অপাঙ্গে চেয়ে দেখলাম আমাদের প্রত্যাশিত ঠোঙা ইত্যাদি সসঙ্কোচে বাড়ির মধ্যে গেলো। শেষে এত ব্যস্ততার একটা কিনারা পাওয়া গেলো। আমাদেরও ভেতরে ডাক পড়লো। বুঝলাম ব্যাপার কি। টেবিলের ওপর সারি সারি প্লেট পড়েছে—গরম হালুয়ায় ধোঁয়া উঠছে। ঠাণ্ডা পেঁপে একতাল সিঁদুরের মত পড়ে আছে। নানারকম ছোট-খাট ফল ইত্যাদিতে প্লেট ভর্তি। মনে মনে খুশি হলেও বাইরে বড়লোকী ঔদাসীন্য এমন কি অবাক হবার ভাবও বজায় রাখতে হলো। দু'একটা ওজরও যে না করলাম

এমন নয়। ওজর তুলে দেখলাম ঠকে গেছি হালুয়ার দলাটা নির্বিবাদে আমার পাত থেকে উঠে গেলো। নিজের মৃত্যুর স্বাক্ষর নিজে লিখে আর অভিযোগ ক'রে লাভ কি—হ্যাঁ আফশোষের অধিকার আছে বৈকি।

খেতে খেতে ভদ্রলোকের জীবনের শোচনীয় ঘটনা মামার কাছেই শুনলাম। ভদ্রলোক এখানকার স্কুলের নাম করা হেডমাষ্টার ছিলেন ছেলে পড়িয়ে এবং অন্যান্য অনেক উপায়ে রোজগারও ছিলো প্রচুর। এঁর সুখ্যাতিতে সারা উজ্জয়িনী মুখর। এঁর আতিথেয়তা সর্বজনবিদিত ছিলো। পরে জলধর সেনের (?) ইন্দোর ভ্রমণের মধ্যে এঁর উল্লেখ দেখেছি। ক্রমে সর্বনাশ এঁর মাথায় ভেঙে পড়লো। আর্থিক দুর্দশা পারিবারিক শোকে ইনি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়লেন। এখন ইনি সামান্য কয়েকটা ছেলে পড়িয়ে কোনরকমে টিকে আছেন। দেশে আসার পর শুনেছি ইনি হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন। অতীতের উজ্জ্বল আভায় ইনি ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হয়ে গেছেন বলেই সম্ভবতঃ তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যাবার ব্যবস্থা করেছেন। সত্যি লোকটার খুবই দুর্ভাগ্য। এ দুর্ভাগ্য বর্তমান সমাজেরই অনিবার্য সঙ্গী। কাল যে লক্ষপতি আজ সে পথের ফকির। আজ যে ফকির কাল আকাশস্পর্শী Sky scrapperএ সে সোনার স্বপ্নে মশগুল। এমনিই হয়। কিন্তু, কেন তার উত্তর খুঁজতে চেষ্টা না করে পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘন করার ব্রত গ্রহণ করেছি আমরা। কোথায় কে কেমন করে লক্ষপতি হয়েছে, কোথায় কে কেমন উপরি ভোগ করছে জিভের জলের ঢেউ তুলে আমরা হা করে শুনি কিন্তু, একবারও হিসেব করি না সমষ্টিগতভাবে মানুষ ফাগুনের নিষ্প্রভ পাতার মত নিঃস্বতা ও নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছে। দেউলিয়া পাল্লার ইতিহাসই কি আমরা বয়ে বেড়াবো চিরকাল! ভট্‌চাজ মশাইএর জীবনী হয়তো

তার কিছুটা নির্দেশ দিতে পারে। গাছের গোড়া শক্ত নয় বলেই কি আজ ভট্চাজ মশাইএর মত পিঙ্গল পাতার ভিড়ে ভিড়ে অসহায় পথ প্রান্তরের বুক ভারী হয়ে উঠে নি—ভট্চাজ মশাইএর জীবন তারই নিরীখ।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা আবার মোটরে উঠলাম। কথা থাকলো ফেরার পথে রাতের খাবার এখানে খেয়ে যেতে হবে।... মেঘদূতের দেশে মোটর ছুটেছে। পূবের মেঘ উত্তরের পথে এসেছিলো অবন্তীর পুরললনাদের ভ্রূ বিলাস দেখবার জন্য, শিখির নৃত্য লক্ষ্য করবার জন্য। শিপ্রার জলে স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে মেঘ দূরান্তরের পথ ধরেছিলো। আমরা পশ্চিম থেকে পূবে ছুটেছি। যে পথে আমাদের মোটর ছুটেছে জানি না সে পথে একদিন বিরহী যক্ষের দূতের ছায়া পড়েছিলো কিনা। রামগিরি থেকে অলকা, অলকা থেকে রামগিরির পথে যে বার্তাবহ মেঘ উধাও হয়েছিলো মাথার উপর উজ্জ্বল নীলকান্ত মণির মত আকাশের দিকে চেয়ে তার এক কণাও চোখে পড়লো না। হায় মেঘ, তুমি কি বিরহী যক্ষের বার্তা বইতে বইতেই নিঃস্ব হয়ে গেছো! কার কাছে সে উত্তর চাইব?

প্রথমে আমরা Kabidaha Palaceএ গেলাম। শুনলাম Palaceটা নাকি আকবর তৈরি ক'রেছিলেন। মধ্য ভারতে অভিযান চালাবার সময় আকবর নাকি এই পথ দিয়ে যাতায়াত করতেন। জানি না এ ইতিহাস কতটুকু সত্য তবে, Palace একটা তো চর্মচক্ষুতে দেখতে পাচ্ছি! আকবরেরই হোক আর বিক্রমাদিত্যের হোক্। তবে বিক্রমাদিত্যের হলেই বেশি খুশি হ'তাম। কেন না, তিনি আমার কিশোর কল্পনার এক মহাকাহিনীর নায়ক।

মামার স্যুট্, প্রাইভেট্ Car একজন দারোয়ানের সেলাম দেবার পক্ষে যথেষ্ট তারপর, সঙ্গে আবার মাইজী দিদিমণিরা আছেন। দারোয়ান্

ছুটে এসে সেলাম করলো। Palace এর বিভিন্ন অংশ ঘুরে ফিরে দেখলাম। শুনলাম গোয়ালিয়রের মহারাজা (সিন্ধিয়া) মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকেন! ঝক্ ঝকে তক্তপোষ যাক্। রাজা মহারাজার তক্তপোষ দেখাও এক সৌভাগ্য বই কি! Drawing room রীতিমত ইওরোপীয় কায়দায় সাজানো। খেলার ঘর ডাইনিং রুম সবই মহারাজার উপযোগী ক'রে সাজানো। দারোয়ান্ আমাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দেখালো। মনে মনে ভাবলাম, ভবিষ্যতের মানুষ এক আজবদৃষ্টি নিয়ে সরীসৃপদের পাঁজরার মত অতীতের নিদর্শন হিসেবে এই সব রাজা মহারাজাদের জীবন ধারার পরিচয় মিউজিয়াম থেকে নেবে। তারা ভাববে, রাজা আবার কেমন জিনিস—যেমন আমরা ভাবি Pithecanthropus আবার কেমন মানুষ! ভবিষ্যতের সেই মিউজিয়ামের পথ আর কতদুর?

Palace একেবারে শিপ্রা নদীর পারে। নদীর ওপারে চমৎকার একটা বাঁধ দিয়ে জলের স্রোতের এক গোলক ধাঁধাঁ সৃষ্টি করা হ'য়েছে। এই দুর্বোধ্য জিনিসটিই নাকি এখানকার এক পরম দর্শনযোগ্য জিনিস। সেই গোলক ধাঁধাঁর কাছে গেলাম। মামা, ব'ললেন, বলতো অমল এই জলের স্রোত কোনখান দিয়ে ঢুকে কোনখান দিয়ে বেরচ্ছে? বহু চেষ্টা ক'রেও সেই ঘুরানো ফিরানো গোলক ধাঁধার মাঝ থেকে স্রোতের নির্গম পথ বের ক'রতে পারলাম না। স্রোতের রেখা ধ'রে চোখ বুলাতে বুলাতে দুর্বোধ্য প্যাঁচের মধ্যে চোখ খেই হারিয়ে ফেলে। সত্যিই একটা মজার জিনিস তো! ব্যাপারটা হ'চ্ছে এই শিপ্রার উপর বাঁধ দিয়ে তার স্রোত বেরিয়ে যাবার জন্য কংক্রীটের (?) ছোট্ট ছোট্ট বাঁধ তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক দুর্বোধ্য পথে সেই স্রোত বেরিয়ে গেছে। মহারাজাদের হারেমের শাহজাদীরা সময় কাটাবার অন্য উপায় নাই দেখে হয়তো এক কটাক্ষ বানে মহারাজাকে দিয়ে

এই ক্রীড়াযোগ্য গোলক ধাঁধা তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। অনেক বড় লোকে শুনেছি সময় কাটাবার জন্যে প্রচুর টিয়া নিয়ে এসে খাঁচায় পোরে আবার খাঁচা থেকে একে একে ছেড়ে দেয়। এটাও হয়তো সেই ধরনের কোন খেয়ালী খেলায় উপকরণ হবে।

বাঁধের ওপর দিয়ে আমরা শিপ্রার অপর পারে গেলাম। চমৎকার এবং প্রকাণ্ড ফুল ও ফলের বাগান। একজন মালী stirrup pump এ ক'রে শিপ্রার জল গাছে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এমন রুক্ষতার মাঝেও এরই জন্যে গাছগুলো সবুজ।

দারোয়ানকে কিছু বখশিস্ দিয়ে মোটরে উঠলাম আমরা। ফেরবার পথে ময়ূর উজ্জয়িনীর রাজপথ প্রতিধ্বনিত করছিলো। কিন্তু নিরাশ হলাম চারিদিক রুক্ষ ধূসর। এতটুকু রসের চিহ্ন কোথাও নেই। এই নীরস বিশুষ্ক দেশের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে যে মেঘদূতের একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে যাবার কথা। না মেঘদূতের যাবার পথ এ নয়; তবে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময় এদেশ কেমন ছিলো জানি না। প্রকৃতির সঙ্গে কি তিনি সন্ধি করবার মন্ত্র আবিষ্কার ক'রেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে যত আজগুবি কাহিনী প্রচলিত আছে তাতে এরকম আর একটা আজগুবি কাহিনী সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। বাজারের মধ্যে এক মন্দিরের সামনে এসে মোটর থামলো। সবাই মন্দিরে ঢুকলো; আমি মোটর থেকে বেরিয়ে রাস্তার লোক চলাচল দেখতে লাগলাম। চারদিকে Central Indian cap আর লাল হলুদ পাগড়ীর রাজত্ব। ইয়া গোঁফ লাঠি হাতে কাঠখোট্টা লোকের অভাব নেই। সামনের এক চাখানার একজন বিরাটকায় গোঁফওয়ালা লোক ব'সে এক রাশ ছাতু খাচ্ছে। কল্পনার কালিদাসের সঙ্গে এদেশের কারও চেহারার মিল খুঁজে পাচ্ছি না। কালিদাসের যুগটা হঠাৎ যদি এক মুহূর্তের জন্যে ফিরে আসে তাহলে হয়তো

দেখতে পেতাম কালিদাসও এমনি গোঁফপাকানো ভুঁড়িওয়ালা একজন লোক চাথানায় (অবশ্য তখন চাথানা ছিলো না) বসে ছাতু খাচ্ছেন। হাসিও পেলো, দুঃখও হলো। নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলাম। নিজের নৈরাশ্যে নিজেই দুঃখিত হলাম। হায় রে মানস কালিদাস! তুমি কি গোঁফ-মুখো বৃকোদর এমনিতর সামান্য একজন মানব!···দিদিমার মানস কালিদাসকে খুঁজে পাচ্ছি কই!

মন্দির থেকে সবাই ফিরে এলেন, মাসিমা একটু খোচাও দিলেন মন্দিরে না যাবার জন্যে। এবার মহাকালের মন্দির।···

মহাকালের মন্দিরে একটা আধো-আঁধারী সুড়ঙ্গপথে ঢুকতে হয়। মহাকালের মন্দিরটা ছোট, দিনের বেলায়ও সেখানে রাশিকৃত অন্ধকার। ঢুকলাম সেই অন্ধকার মন্দিরে—ফুল আর পাতা, প্রদীপ আর ধূপের মিশ্র গন্ধে বাতাস ভারী। অনেকে ভক্তিভরে তার মাথায় হাত ছোঁয়াচ্ছে। মাসিমা মামা ভক্তিভবে পূজা দিলেন।

এই মন্দিরে নাকি এক সময় প্রচুর মণিমাণিক্য ছিল। সে সবের অস্তিত্বও আজ নেই। চারিদিকে মন্দির ঘেরা মাঝখানে একটা বাঁধানো পুকুর। একটা ছেলে আমাদের হাতে পবিত্র জল দিলো- ভক্তিতে না হোক্ তৃষ্ণায় সে জল পান করলাম। দেখার বড় কিছু নেই। মামা একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। আমরা মোটরে উঠে বসলাম।

মোটর আবার ভট্চাজ মশাই-এর বাড়ীতে ফিরে এলো। রাত তখন হ'য়ে আসছে। ছাদের উপর আমরা পুরুষেরা গিয়ে বসলাম। টেবিল চেয়ার পাতাই ছিলো। এ বাড়ীর পাশ দিয়েই নগ্দা-উজ্জয়িনীর রেল লাইন। অনবরত whistle বাজছে। উজ্জয়িনীতেও অনেকগুলো কাপড়ের কল আছে, তাদের ঝিক্ ঝিক্ শব্দ আসছে। ভট্চাজ মশাই যে কিভাবে আমাদের আদর করবেন বুঝতে না পেয়ে অনবরত

ছুটাছুটি করছেন। অদ্ভুত বিনয়ী লোক। ভট্‌চাজ মশাই দেওয়াসে তাঁর এক ছেলেকে Technical line এ কাজ শেখাতে চান। দেওয়াসে নতুন একটা কারখানা শহর থেকে দূরে হয়েছে। মামা সোৎসাহে তাতে সায় দিয়ে ছেলেকে পাঠাতে ব'ললেন। তাঁর ওখানেই অনায়াসে থাকতে পারবে। একটা খুশি ও তৃপ্তির হাসি ভদ্রলোকের মুখে চোখে ফুটে উঠলো।

কিছুক্ষণ পর খাবার ডাক পড়লো। এবার আর ওজর তুলতে চেষ্টা করি নি—পাছে লুচিগুলোরও হালুয়ার দশা হয়। বেশ করে লুচি ডালনা প্রভৃতি তৃপ্তি করে খেয়ে একটু বিশ্রাম করে গল্প গুজব করে একটা মধুর অথচ করুণ স্মৃতি নিয়ে মোটরে উঠলাম। ফেরার পথ স্নিগ্ধতায় অমৃত হয়ে উঠলো। আকাশে আবার নীল চাঁদ ঝকমক করছিলো। প্রান্তরের ঝিকিমিকি আলোর ঝলকানি—বিশীর্ণ বাবলার গতিতে রাতটা অপরূপ হয়ে উঠেছে। মধ্যভারতের বামন পাহাড়ের দল স্থানে—অস্থানে রহস্যঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মোটরের গাঁ গাঁ শব্দও তাদের তন্দ্রায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারছে না। দেওয়াসে যখন পৌছলাম তখন রাত প্রায় এগারোটা।

আবার দেওয়াস

খুব ভোরে উঠে যাদবের সঙ্গে বেড়াতে বেরলাম। তখনও একেবারে ফর্সা হয় নি। মাঠের মাঝ দিয়ে বাঁধা পথ—এঁকে বেঁকে পাহাড়ের নিচে কারখানা পর্যন্ত চ'লে গেছে। অবারিত প্রান্তরের হাওয়া চারদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেহ মন স্নিগ্ধ ক'রে তুলছিলো। এমন সুন্দর প্রভাত বেলা যারা শুয়ে কাটিয়ে দেয় তারা সত্যিই দুর্ভাগ্য। উঃ! এখানে পথে ঘাটে যত ময়ূর। আমাদের খুব কাছেই চ'রে বেড়াচ্ছে। এত প্রচুর ময়ূর কোথাও দেখি নি। কেমন গাঢ়তর স্তব্ধতা চারিদিকের সব কিছুর মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়ে আছে। পায়ের আঘাতে যে ধুলো উড়ে যাচ্ছে তারও কুণ্ডলীতে কুণ্ডলীতে যেন সে স্তব্ধতা মূছিত হ'য়ে আছে। এমন নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার মধ্যে কথা ব'লতে স্বভাবতঃই অনিচ্ছা হয়। চ'লতে চ'লতে পূব আকাশে সোনার আঁচড় কেটে গোলাপী সূর্যের মাথা জেগে উঠলো। ধূসর প্রান্তরে গোলাপী আভা পড়েছে। পাহাড়ে পাহাড়ে অনির্বচনীয় রূপ সৃষ্টি হ'য়েছে। বললাম, যাদব, তোমার দেশ তো ভাই বেশ লাগছে! এমন অবারিত প্রান্তর আর গোলাপী আলোয় তোমরা তো বেশ আছো! অবশ্য, আমাদের দেশেও এসব আছে—কিন্তু, পাহাড় নেই তাই, সমভূমির সে সৌন্দর্যে আমরা আর বৈচিত্র্য খুঁজে পাই না।

যাদব কবি মানুষ। কবির মতই উত্তর করলো। This very meadow is a veritable elixir of life to me, my dear friend, of which you are so much jealous. It is bringing me

positively to the path of resurrection and to the blessings of life. I deeply inhale its aroma.

পায়ে দুর্বলতা ছিলো প্রচুর। যাদব আজও লাঠি নিয়ে চলে। এমন অবস্থা হ'য়েছিল নাকি একসময় যে, সে লাঠির সাহায্য ছাড়া চ'লতেই পারতো না। আজ সে তিন মাইল পর্যন্ত বেশ হাটতে পারে। যাদবের কুটীরে ফিরলাম গল্প ক'রতে ক'রতে। যাদবের ছোট ভাই-এর সঙ্গে আলাপ হ'লো। সে নমস্কার করলো। তার মুখ কি একটা চর্মরোগের ফলে একেবারে কালো হ'য়ে গেছে। যাদব তার এক artist বন্ধুর paramourএর গল্প করলো।

আজ সারা সকাল ঘুরে ঘুরে দেওয়াস শহর দেখলাম। দেওয়াসে পাশাপাশি দুটো state—senior এবং junior. দুই শহর লাগোয়া। শহর দুটোতে বড় ঘর বাড়ি বিশেষ দেখলাম না। সব কেমন এক ধরনের ছোট ছোট ঘর। বাজারে তরকারীর মধ্যে দেখলাম পিঁয়াজ, বাটাটা (আলু), বায়গন্ (বেগুন) প্রধান। দুধ সস্তা, টাকায় সাত সের, ঘীও সস্তা। গম টাকায় চার সের; বাইরে চালান দেওয়া নিষিদ্ধ। মোট কথা, দেওয়াসের লোক বেশ সুখেই আছে এত বড় যুদ্ধের মধ্যেও।

শহরের একপাশ দিয়ে Bombay-Agra Road—চকচকে কালো পীচের রাস্তা ইন্দোর স্পর্শ ক'রে চলে গেছে। এই রাস্তা পেরিয়ে মাঝারি ধরনের একটা টিলা পাওয়া যায়। সন্ধ্যার দিকে সেই টিলায় অমিয় আর অজিতকে নিয়ে উঠলাম। হ্যাঁ, দেওয়াসের গর্ব করার মত একটা স্থান আছে বটে। মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠলাম। রাজসরকারের চেষ্টায় টিলা পর্যন্ত রাস্তা উঠেছে। আমরা মোটরেই এসেছিলাম। টিলার মাঝামাঝি উঠতেই পা ধ'রে গেলো। ওপরে উঠে দেওয়াস শহরকে ছবির মত দেখাচ্ছিলো। শহরের ছোট ছোট ঘর বাড়ি

আরও ছোট দেখাচ্ছে। সারি সারি আলো নিয়ে একটা বিয়ের procession চ'লেছে। আলোগুলো একবার গাছের আড়ালে পড়ছে আবার দেখা যাচ্ছে। চমৎকার বাজনা শোনা যাচ্ছে। কি চমৎকার হু হু ক'রে বাতাস আসছে। কি চমৎকার যে লাগছিলো! ইতু মাসিমা এসেছিলেন। রাত হ'লে ফেরা গেলো। Bombay-Agra Roadএ এসে যাদবকে দেখতে পেয়ে মোটর থেকে নামলাম—মোটর চ'লে গেলো। যাদবের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে এখানকার public library দেখতে গেলাম। বই মোটামুটি ভালই ছিলো—তবে পড়ুয়ার সংখ্যা বড়ই কম।

দেওয়াসে মেয়েদের একটা হাই স্কুল আছে। একটা হাসপাতালও আছে। সিনেমা হল আছে। junior-এর রাজা নাকি বেশ cultured লোক। ভালো লাইব্রেরী আছে। এখানে (juniorএ) tree planting day ব'লে একটা দিন অনুষ্ঠিত। হয়; তাতে state-এর কর্মচারীদের সবাইকে গাছ পোঁতায় অংশ নিতে হয়—জানি না, বাংলার ফজলুল হক্ মন্ত্রিত্বের কচুরীপানা সাফের প্রচেষ্টার মত কিনা সেটা।

এদেশে থাকতে থাকতে মামার ছেলেমেয়েরা একেবারে পাকা হিন্দুস্থানী ব'নে গেছে—কথায়, আচরণে—এমন কি চেহারায় পর্যন্ত প্রায়। অমিয় আর অসিতে যখন ঝগড়া চলে তখন রীতিমত 'তেরি' দিয়েই প্রায় আরম্ভ হয় আর কি! সবচেয়ে হিন্দুস্থানী হ'য়েছে অসিত। সে সবচেয়ে ছোট, তাই, সবচেয়ে বেশি বিদেশী হয়ে গেছে। মায়ের সঙ্গে সময় সময় সে হিন্দীতেই কথা আরম্ভ ক'রে দেয়। তার চেহারা দেখে অচেনা লোকের পক্ষে জোর ক'রে বাঙালী বলা কঠিন। এরা অনেক কথাই বাংলার substitute হিন্দীতে ব্যবহার করে। এদের এই সব ব্যাপার দেখে ভারি মজা লাগতো।

ইন্দোর ছাড়ার আয়োজন

বিকেলের দিকে মামার ট্যাক্সীতে বাস stand-এ গিয়ে বাস ধরলাম। ইন্দোর পৌছনো গেলো।

Injection শেষ হ'য়েছে—এবার অহল্যাবাঈ-এর দেশ ছাড়তে হবে। এখানে change-এর মত থাকা হ'ল না—উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা হয়রানি। আর কঠোরতায়ই এখানে দুটো মাস কাটলো। Dr. Mukherjee-র কাছে মাথা নত ক'রতে পারলে এ হয়রানির হয়তো অনেকটা লাঘব হ'তো—কিন্তু, ও ধরনের অপমান সহ্য করবার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়। সামান্য সুবিধালাভের জন্য নিজের মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দিই নি মনে ক'রে অত হয়রানিতেও নিজের ওপর বিরক্তি না এসে শ্রদ্ধাই আসতো। যতদিন বাঁচি মানুষের মতই বাঁচতে চেষ্টা করবো। ভবিষ্যতের কাছে আমি এই গৌরবময় বাঁচার আশ্বাসই চাই। চুলোয় যাক্ সামান্য সুবিধা আর লাভের মোহ।

মাসীমা (বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশনের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক অবনী লাহিড়ীর মা) বলেছিলেন নেপালে পান্নার কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকতে। জায়গাটা নাকি ভালো। ঠিকানাও দিয়েছিলেন। পান্নার কাছে চিঠি দিলাম আর আলমোড়ায় জগন্নাথের কাছে চিঠি দিলাম থাকার সুবিধা আছে কিনা। পান্না সাদর আমন্ত্রণ জানালো। জগন্নাথের ওখানে অনেকগুলো অসুবিধা। প্রথমতঃ যেতেই প্রায় চল্লিশ টাকা খরচ তার ওপর পথের কষ্ট ঝাঁপান ঘোড়া প্রভৃতির ঝক্কি। শেষে নেপালে যাওয়াই ঠিক করলাম।

যাওয়ার আগে এক দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। পাঁচ টাকার একখানা নোট আর খুঁজে পেলাম না। সম্ভবতঃ সেদিন যে পার্কে বসে পকেট থেকে কাগজ পত্র বের করেছিলাম সেখানেই হয়তো গণ্ডগোল হয়েছে, যাক গে।

যাবার সামান্য কিছুদিন আগে এক Type writing Schoolএ type শেখার জন্যে ভর্ত্তি হলাম। মায়না মাসে মাত্র এক টাকা। অবশ্য সেই অনুপাতেই কাজও হতো। প্রথমদিন মাষ্টার interest নিয়ে একটু শিখিয়ে দিলেন। তার পর দিন থেকে তাঁর আর পাত্তা নেই। আমি একবার এই machineটা নাড়ি আবার পাশেরটায় বসি কোনটায় কালি নেই, কোনটার ফিতে ছিড়ে গেছে। সস্তার তিন অবস্থায় এই এক নমুনাতেই ঘেমে উঠলাম। যাহোক সপ্তাহ তিনেকের চেষ্টায় কোনরকমে 'ASDFG'র সমুদ্রোত্তীর্ণ যদি বা হলাম অমনি হিমালয়ের ডাক এসে পৌঁছলো। লাগুর বড় বোনও এই স্কুলে type শিখতো। বেশ নম্র লাজুক অথচ চট্‌পটে মেয়েটী—জীবনে মানুষ হবার সম্ভাবনায় ভরপুর। আসবার আগের দিন নিরুদ্দিষ্ট মাষ্টারের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে দেখি তিনি নেই; ছাত্ররা সবাই যাযাবর কারও সঙ্গে কারও বন্ধন নেই। কার কাছে বিদায় নেবো? লাগুর বোন বসেছিলো। একমাত্র তার কাছ থেকেই বিদায় নিয়ে এলাম আর আমার অতি কষ্টে শেখা 'ASDFG'র ক্রুর লাইন ক্রুর হাসি হেসে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলো। তারাও বাঁচলো আমিও বাঁচলাম।

রাজু লাগু অন্যান্য বন্ধুবান্ধব যারা এই দীর্ঘ দুমাসের প্রবাস জীবনে অতি কাছে এসেছিলো সবার কাছ থেকেই বিদায় নিয়ে এলাম। কিন্তু, ইন্দোরের স্মৃতি আমার কাছ থেকে কোনদিন বিদায় নিতে পারবে না। শঙ্করের হাসি, কাশীবাঈ এর স্নেহ, দিবাকর খান্দ্‌করের সুগভীর স্বদেশ প্রেম, রাজু লাগুর মায়েদের অযাচিত স্বার্থত্যাগ,

নলিনীর 'অমল তুম্‌হারা খানা তৈয়ার হ্যায়' শব্দ এসব কি কোনদিন ভুলতে পারবো? স্বীকার করি ইন্দোরে প্রচুর কষ্ট স্বীকার ক'রতে হয়েছে—কিন্তু, তাই বলে মুখুজ্জে বৌদির সেবা, তেম্বে আর রামজী-লালের সাহচর্য্য, রাজু-লাণ্ড, মজুমদার, যশা, প্রভৃতির স্মৃতি কি তার চেয়েও সত্য নয়। যাবার আগে কষ্টের কথা ভুলে গিয়ে এই সত্যই আমার কাছে মহাসত্য হয়ে উঠলো যখন দেওয়াসগামী বাসের জানালার ওপর মাথা রেখে পশ্চিম আকাশের অপরাহ্ণ শেষের চিক্‌চিকে নক্ষত্রটির দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিলাম। ইন্দোরের শহরতলীর কারখানার কালো চিমনীর সারি কখন মিলিয়ে গেছে জানতেও পারি নি। রওনা হবার সময় ভুরে সিং আর গোপাল আমার ভারী সুটকেশ আর বিছানা কষ্ট ক'রে বাস্ ষ্ট্যাণ্ডে বয়ে দিয়ে গেছে। কিসের আশায় তারা তীব্র রোদের মধ্যে ওই কষ্ট ক'রে গেলো?—ডাক্তার মুখার্জীর মত তারা আমলাতান্ত্রিক নিয়মে জীবন কাটায় না বলে, মানুষকে মানুষের মর্য্যাদায় দেখে বলে। এই মর্য্যাদা বোধই মজুর ভুরে সিংকে মধ্যবিত্ত অমল সান্যালের এমন কাছে নিয়ে আসতে পেরেছিলো যেখানে টাকা ছাড়াও জীবনের আর একটা অর্থ হয় এবং গভীর অর্থ হয়।

সীমান্তের প্রহরী

নেপাল এবং হিমালয় দুইই রহস্য এবং বিস্ময়ে ঘেরা। দু'ই স্বপ্ন ও বিহ্বলময় বাল্য ও কৈশোরের আধ ফোটা চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। ঝড়ের রাতে মেটে প্রদীপের অস্পষ্ট আলোয় দিদিমার পাশে বসে যখন শুনতাম, হিমালয়ের কোন এক জায়গা থেকে স্বর্গের বাজনা শোনা যায়—তখন আলোছায়ায় অস্পষ্ট দিদিমার হাতের মোটা মোটা নীল শিরাগুলোর মত হিমালয়ের সেই দুর্গম স্থানটি আমার বালক মনে এক অদ্ভুত রহস্যের সৃষ্টি করতো। তারপর, বাল্য কৈশোরের সেই অপূর্ব রহস্য দিনে দিনে ফিকে হয়ে এসেছে সত্য, কিন্তু হিমালয়ের অসীম রহস্য রহস্যের রূপান্তর করে আজও মনের মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারে।
নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বেকার যুবকের দেশভ্রমণ আমাদের দেশে আজও বিলাস। তাই হিমালয়ের আকর্ষণ দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠলেও অশান্ত মনকে প্রবোধ দিয়েছি এই বলে—এই অনড় সমাজ-ব্যবস্থা নড়বে ঠিকই একদিন। ভয় কী?—পশ্চিমে আটলান্টিক চার্টার এবং প্রশান্ত সনদ অবশ্য (আজও জন্ম নেয় নি)—এ দুয়ের লেজ ধরে আমাদের দেশও একদিন দুঃখসাগর পার হবে বৈকি। অতএব মাভৈ। দেশভ্রমণের অনন্ত তৃষ্ণা সেদিন প্রাণ ভরে মেটান চলবে। যুদ্ধোত্তর কালের ডজন খানেক শান্তি-সুখের প্রোগ্রাম থাকতে ভয় কি!
কিন্তু কে ভেবেছিলো—সেই অনাগত সমাজ ব্যবস্থা রূপ নেবার আগেই রহস্যাবৃত হিমালয়ের অবগুণ্ঠন উন্মোচনের স্বপ্ন আমার কাছে এমনি করে রূপায়িত হয়ে উঠবে?

বাংলার গ্রামের বৌএর সুস্থ অবস্থায় কলকাতা দেখা—দুঃস্বপ্ন বলেই শুনেছি—তাই মরার আগে অনেকে নেহাৎ বরাত জোরেই নাকি কলকাতার সঙ্গে প্রথম এবং শেষ সাক্ষাৎ হয়ে যায়—অর্থাৎ, মৃত্যুর আহ্বানই শুধু সেই অখ্যাতা গ্রাম্যবধূর দেশভ্রমণের বিলাস যোগায়। আমার ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই। জেল থেকে বেরবার পর থেকেই আমি ব্যাধির বিপাকে মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে চলেছিলাম বুঝি! জীবনের হতাশা যখন দানা বাঁধতে শুরু করেছে তখনই সুযোগ এলো নেপালে যাবার—নেপালের স্বাস্থ্য ভাল—তারই ছোঁয়াচ যদি জীবনীশক্তি ফিরে দেয় এই আশা নিয়েই রেলে চেপে সেদিন কাটিহার থেকে মাত্র তিন ঘণ্টার ভ্রমণ এবং সওয়া দু'টাকার টিকিটের অঙ্গীকারে যোগবাণীতে এসে পৌঁছই। কিন্তু সময় যে কখন হঠাৎ অসময়ে রূপান্তরিত হয়েছে আকাশে কালো মেঘের দৌরাত্ম্য দেখেও সে দিন বুঝতে চাইনি। ভয়ের চোখ বড় জেনেছি, কিন্তু গরজের দৃষ্টি যে এত বড় সংকীর্ণ হয় তা প্রথম জানলাম এসে যোগবাণীতেই। যোগবাণী থেকে মোটর বাসে আমাকে যেতে হবে প্রায় ৩০ মাইল। পথে বিরাট নগর থেকে আমার গন্তব্যস্থল ধারাণ যাবার বাস মেলে। যোগবাণী থেকেই শুনলাম, বৃষ্টি হ'লে বিরাটনগর থেকে ধারাণের বাস বন্ধ হ'য়ে যায়। যোগবাণী থেকে বাস ষ্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ইঞ্জিনেও ষ্টার্ট পড়লো—অর্থাৎ বুকের ভেতর আশঙ্কার আওয়াজ বাজতে শুরু হয়ে গেলো। বিরাটনগর পৌঁছে শুনি—ছ' সাত দিন বাস বন্ধ হয়ে আছে—আজও যাবে না সম্ভব। আশঙ্কার আওয়াজ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সঙ্গে পথের ক্ষণিক আলাপী দুই বিহারী বন্ধু আর ডজনখানেক পাঁচ মিনিটের আলাপী নেপালীর সঙ্গে মোট ঘাট নিয়ে নেপাল সরকারের স্থানীয় বাজার আড্ডায় (আমাদের দেশের Officerকে এখানে আড্ডা বলা হয়) গিয়ে উঠলাম। সত্যিকার নেপাল সীমান্ত শুরু হয়েছে যোগবাণী

ষ্টেশনের কাছ থেকেই। বাসে উঠেই, বাংলার নদীস্নাত স্নিগ্ধ আবহাওয়া যে হঠাৎ কঠোর হয়ে উঠছে বেশ বুঝলাম। বাসের টিকিট চেকার দেখি চটেই আছে—টিকিট চাইলেও চোট, বসবো কোথায় জিজ্ঞেস করলেও সেই চোট,—যেন একটা উত্তপ্ত কড়াই-এর মধ্যে হঠাৎ উঠে বসেছি। এপাশে ওপাশে যেদিকেই পড় উত্তপ্ত কড়ার ফুটন্ত স্পর্শ। তার চোখের হাবভাব যেন নেপাল সম্বন্ধে শুরুতেই একটা রীতিমত তাপের সৃষ্টি করে তুললো। পাঞ্জাবের অভিজ্ঞতাটা এই সময় হঠৎ মনে হলো। পাঞ্জাবের একজন ভিক্ষুকের ভিক্ষা চাওয়ার কায়দা একটা দস্তুরমত আশঙ্কাজনক ব্যাপার। দেখে ভেবেছিলাম বৈষ্ণব বাংলার প্রান্ত শেষ হয়েছে এটা তারই লক্ষণ। বাংলার সরস মাটি বিনয়ী মানুষকে বেমালুম মাটির মানুষ করে ফেলে।—কিন্তু রুক্ষ মাটির ছোঁয়াচ যে মানুষকে কড়া করে তোলে—এ অভিজ্ঞতা বাংলার বাইরে পদে পদে হয়েছে। নেপাল সীমান্তে সেটা আরও পাকা হ'য়ে গেল। Glimpses of the World Historyতে জহরলালের লেখা একটা কথার অর্থ আজ আরও সুস্পষ্টভাবে ধরা দিলো। জহরলাল লিখেছেন মুসলমান শাসকের শাসনটা যে এদেশে এত কঠোর হ'য়েছে তার কারণ সাম্প্রদায়িক নয় (হিন্দুর ওপর অত্যাচার করার আশঙ্কা থেকে নয়)—মুসলমান শাসকরা যে আবহাওয়ায় মানুষ সে আবহাওয়া রুক্ষ এবং কঠোর—তাই তাদের মেজাজও ঠিক অতটা কঠোর ছিলো এবং তার ফলে শাসনও।

যাক্ অনেকদূর এসে পড়েছি। বিরাটনগরে একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ব'সে আছি। মন তখন আশা-নিরাশার বাইরে এক অদ্ভুত জগতে অবস্থান ক'রেছে। কানপুর থেকে আসছি দু'দিন স্নানাহার প্রায় বন্ধ। এমন একটা জায়গায় বর্তমানে এসে পৌছেছি—যেখান থেকে ফিরবার পথও বন্ধ এগোবার পথও—অর্থাৎ ত্রিশঙ্কুর মত। শুনলাম

এখানে থাকবারও কোন ব্যবস্থা নেই। অনেক চেষ্টায় খবর নিয়ে জানলাম একটা হোটেল আছে, তবে নেপালী। বেপরোয়া সুখ দুঃখের হিসেব থাকে না, তাই, দুঃসাহসী হয়ে মালপত্র ভগবান ভরসায় রেখেই ছুটলাম হোটেলের সন্ধানে। খোজাখুঁজি ক'রে যেখানে উঠলাম সেটাকে গোয়ালও বলা চলে, বাড়ীও বলা চলে (অবশ্য, আমাদের দেশের ষ্ট্যাণ্ডার্ডে)। হতাশভাবে তাকিয়ে দেখি দুখানা চাটাই বিছানো কিন্তু মানুষের ছানার অস্তিত্বের কোন সাড়াই মিললো না প্রচণ্ড ডাকা ডাকিতেও। ফিরে আসবো, হঠাৎ দেখি—মাটির দেওয়ালের একটা ফুটোর মধ্যে দুটো চোখ গজিয়ে উঠেছে। চোখের মালিকের কাছ থেকেই প্রশ্ন এলো—কি চান? (অবশ্য হিন্দিতে)—উত্তর, থাকতে চাই। প্রশ্ন বাহ্মন? উত্তর, হাঁ। শেষ প্রশ্ন—বাঙালী? উত্তর হাঁ। হঠাৎ মনে হলো চৈতালী উত্তপ্ত হাওয়ার বুকে ঘূর্ণী ঘুরে উঠলো। শেষ জবাব বিরক্তিকর, তাই আশা ভরসা শেষ চিহ্নও মুছে ফেলে নেপালের জেলা হেড্ কোয়ার্টারের মিউনিসিপ্যালিটি-হীন কাঁচা রাস্তার প্রচুর ধূলোর মধ্যে এসে যখন দাঁড়ালাম তখন বৈকালিক আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে।

আড্ডায় ফিরে দেখি মেঘক্লান্ত আকাশের মত ঝিমিয়ে পড়েছে সঙ্গীদের মন। এরই মধ্যে দুচার জন নেপালী সহযাত্রী বিরাশী ওজনের বোঝা পিঠে ফেলে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে রওনা দিয়ে ফেলেছে, মটরের অপেক্ষা রাখেনি। ত্রিশ মাইল দুর্গম পথের পাথেয় যে শক্তি ও সাহস তার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারলাম না। চেয়ারে বসেই যাদের ক্লান্তি এই দুঃসহ পথ অতিবাহনের ইচ্ছা তাদের কল্পনাই হয়তো বা স্বপ্ন। ঝড়ের হাতে নির্যাতিত ফুলের মত বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবছি, হটাৎ দমকা ঝড়ের মতই একখানা লরি এসে আড্ডায় দাঁড়ালো। তাতে সৈন্য বোঝাই। শুনলাম, এ

লরী ধারান যাবে। মহাপ্রস্থানের পথে প্রবোধ বাবুর হারানো টাকা ফিরে পেয়ে যে আনন্দ হয়েছিলো—যে আনন্দের পরিমাপ করেছি কল্পনায়, লরী ধারান যাবে শুনে মনে হলো, সে আনন্দ আমার আজকের এই আকস্মিক উল্লাসের কাছে ফিকে হয়ে গেছে। বার বার শুনেও বিশ্বাস করতে বাধছিলো যেন সত্যিই ধারান যাবে ; কারণ ছ দিন পরে এই তার প্রথম যাত্রা। এই আকস্মিক যোগাযোগই অনেক সময় মানুষকে ভাগ্যবাদী হবার ফাঁকে জড়ায়।

একগাদা মাংসপিণ্ডের উপর উঠলাম এবং সে মাংসপিণ্ড নেপাল দেশীয়, গিয়ে উঠলাম ব'ললে ভুলকরা হবে। ক্রমশঃ লরী বোঝাই হতে আরম্ভ করলো। আমরা হতাশ ভাবে চারদিকে তাকিয়ে যখন ভাবছি আর ধরবে কোথায়—কারণ মানুষে মানুষে ঠাসা বুনোনি একখানা জীবন্ত কুটির শিল্প এরই মধ্যে গড়ে উঠেছে—তখনও দেখছি বড় বড় বাণ্ডিল নিয়ে বেঁটে বেঁটে নেপালী স্ত্রী পুরুষ অনায়াস ভঙ্গিতে সেই ভিড়েব সমুদ্রে কোথায় মিশে যাচ্ছে, ঠিক যেমন ক'রে সেকালে পেটুক বামুনদের পেটে সেরের পর সের সন্দেশ সেঁদিয়ে যেতো—অথচ কোথায় মিশে যাচ্ছিলো সেটা ভেবেই পাচ্ছিলাম না। বৃটিশ ইণ্ডিয়ার over loading ধারণায় এ over stocking-এর অনুমান নেহাত অসাধ্য। গিটে গিটে-দেহ নেপালী জাতেরই সেটা সয়।

বিরাট নগর ছেড়ে সত্যিই আমাদের লরি চলতে শুরু ক'রেছে। এই অবসরে বিরাটনগরের খুব সংক্ষিপ্ত একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করব। বিরাটনগরের একটু প্রাচীন ইতিহাস আছে। মহাভারতের বিরাট রাজার নাকি রাজধানী ছিলো এটা—অবশ্য, তার কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। আপাততঃ এটা নেপাল রাজের একটা ডিষ্ট্রিক্ট হেড্ কোয়ার্টার—ডিষ্ট্রিক্টটা হচ্ছে মোড়ং। আমাদের জেলা হেড্-কোয়ার্টারের ধারণা এখানে অচল। কারণ, এখানে না আছে

মিউনিসিপ্যালটি, না আছে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড—না তার আনুসঙ্গিক ফাঁকা রাস্তা, জলের কল বা আলো। এমনকি হাইস্কুল যাওবা একটা ছিলো তাও নাকি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এইরকমই জনশ্রুতি। অধিকাংশই মাটির অথবা কাঠের বাড়ি—দু একখানা পাকা দালান যা আছে তাতে বিদেশী বাঙালী ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার প্রভৃতি অধিকার করে আছেন নেপাল সরকারের এক একজন অফিসার—যাঁদের বলা হয় কর্ণেল, সুব্বা প্রভৃতি।

আধুনিক জগতের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলার এই সচেতন প্রচেষ্টা--এরও খানিকটা উদ্দেশ্য থাকাই সম্ভব। যন্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে সব অপরিহার্য এবং অবাঞ্ছনীয় ধ্বংসের বীজ ইংরেজ একদিন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো বৃটিশ ভারতে, শোনা যায়, নেপাল সরকার সে সকল অভিজ্ঞতা নাকি কাজে লাগাতে চান তাঁর রাজত্বে। কিন্তু তিনি হয়ত ভাবতে পারেন নি, যে বিস্ফোরণ এক স্থানে হয় তারই কম্পনের আঘাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে না তারই পারিপার্শ্বিক। মধ্যযুগের আবহাওয়ায়ও যে ঝড়ের সঙ্কেত এসেছে তার প্রমাণ তো লরীতে বসেই পেলাম।

আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে লরী ছুটে চলেছে। সুদৃঢ় ট্রেনে বসে হিমালয়ের যে নীল রেখা চোখে ধরা দিয়েছিলো, লরীর মোড় ঘুরতে দেখি সেই পাহাড়ই এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে পড়েছে। এতটা অবসাদের গ্লানি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠলো। গ্লানি আর কষ্টের অবশেষ মানুষের জন্যে এমনি ভাবে প্রতীক্ষা করে থাকে বলেই মানুষ মানুষ। এই পুরস্কারের প্রত্যাশায় পৃথিবীর রূপের এমনি অদল হয়েছে। কোথায় গেলো রাত জাগার অবসাদ আর কোথায়ই বা গেলো দীর্ঘ রেলযাত্রার সনিবিড় গ্লানি। এ পাশে ছাতির খোঁচা, ওপাশে

বুটের পাড়া সহ্য করে ও ভুলে গিয়ে অসংখ্য নরবুদ্বুদের ব্যারিকেডের মধ্য থেকেও প্রাণ ভরে চেয়ে নিলাম এবার আমাদের ওই ভারতের উত্তর প্রান্তের দৃঢ়রক্ষীর দিকে, যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে যে একটা অবিমিশ্র বিস্ময় ও রহস্যের নীল কুয়াসা ছড়িয়ে রেখেছে। গাড়ি যতই এগোতে লাগলো ততই পাহাড়টি যেন সজীব হয়ে উঠতে লাগলো। দূরের আকাশকে আড়াল করে যেন ভীষণ কোন জীব পাখা বাড়িয়ে ছুটে আসছে।

চারদিকে অবাধ মুক্ত প্রান্তর বৃষ্টির ছোঁয়ায় সবুজের প্রলেপ মাখানো। হিমালয়ের নিচের এই সমতল ভূমির নাম সদেশ। এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে খাঁটি নেপালীয় চেহারার মিল নেই। মিশ কালো এদের রং দেখলে মনে হয়, বাংলা বা বিহারের কোন অঞ্চলেই আছি বা। এখানে ধান পাট হয় প্রচুর এবং শোনা যায় এই ধানের জোরেই এক একজন নেপালী জমিদার প্রচুর সম্পত্তির মালিক—অবশ্য, সেকথার আভাস পেয়েছিলাম গিয়ে ধারানে কিন্তু প্রমাণ পাইনি কোথাও।

ধীরে ধীরে অস্তসূর্যের শেষ আভাস দিগন্তের কোণে মিলিয়ে যাচ্ছে। সামনে আকাশজোড়া পাহাড় আরও রহস্যময় হয়ে উঠলো। দূর আকাশে চাঁদের আভাস পাওয়া যায়। আমাদের অমানুষিক নিস্পেষণে ভ্রূক্ষেপ না করে রোষক্ষিপ্ত লরী গাঁ গাঁ করে ছুটে চলেছে। লরীখানা এমন ঝাঁকি দিচ্ছিল প্রায় প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর যে, আমরা আমাদের বসবার জায়গা থেকে প্রায় এক হাত লফিয়ে উঠে এ ওর গায়ে গিয়ে ঠোকাঠুকি করছিলাম। লরীর একপ্রান্তে বার্মার লড়াই থেকে ফেরা একদল নেপালী সৈন্যের সঙ্গে একজন বুড়ো জমকালো চেহারাওয়ালা অফিসার ধরনের নেপালী তাঁর বার্মার লড়াই-এর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বীরত্বব্যঞ্জক গল্প করছিলেন। কিন্তু ভুলে যাচ্ছিলেন

তিনি যে, লরীতে বসে বসেই আমরা যে লড়াই চালাচ্ছি বার্মার লড়াই থেকে সেটা সহস্রগুণ শোণিতস্রাবী—সে শোণিত স্রাব চোখে দেখা যায় না এইটুকুই মাত্র পার্থক্য। নেপালী সাথীরা সবাই বেশ হাসি খুশি। অধিকাংশই দীর্ঘ দিন পর দেশে ফিরেছেন। ছোট্ট কাঠের ঘরে পাহাড়ী স্নেহ ও ভালবাসা নিয়ে অপেক্ষা ক'রছেন এঁদেরই মা বোন ভাই সব। সেই মিলনের আনন্দেই এত দুরবস্থার মধ্যেও এঁদের উল্লাস সব অটুট আছে। তাছাড়া নিজের দেশের বন্ধুবান্ধব এঁদের সাথী। কিন্তু লরীর একান্তে যে আমার মত একজন সাথীহারা রাতজাগা উদাসী যাত্রী সঙ্গীহীন ক্লিষ্ট অবসন্ন মুহূর্তকে ঠেলে নিয়ে চ'লেছি কেউ সেটা বুঝবে না। চলেছি একা এক অনিশ্চিত অবস্থানের পানে, পেছনে পড়ে থাকছে অবসাদের মুহূর্তে দেখা গাছপালা প্রান্তরের নীলিম সমারোহ। এক নিসীম শূন্যতার পটে রেখায়িত অভ্রভেদী হিমালয়ই যেন আমার সহযাত্রী, সহযোগী, বন্ধু—আমার সব কামনার জীবন্ত প্রতীক।

সন্ধ্যার অন্ধকার যত গভীর হয়ে উঠেছে পাহাড়টাও ততই কালো এবং ততোধিক রহস্যময় হয়ে উঠছে। সন্ধ্যার পরশ পেয়ে প্রেমিক আকাশের চাঁদ দীপ্ত হয়ে উঠলো। হঠাৎ লরীখানা বোঁ বোঁ ক'রতে ক'রতে এক গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। এই হ'লো সুবিখ্যাত তারাই-এর বন—ক্রোশের পর ক্রোশ গভীর হ'য়ে ছড়িয়ে গেছে। ওখানে যারা বাস করে সভ্যজগতের লড়াই তাদের বিরুদ্ধে, তাদের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রেই এক সময় মানবসভ্যতার অভিযান শুরু হ'য়েছিলো। তারা আজ রূপ বদলিয়েছে সত্যি কিন্তু বাঘ, হাতী, সাপ, গণ্ডার হিংস্রতায় এরা কি আজও আদিম পিতৃপুরুষের চেয়ে কম অগ্রসর!

এতক্ষণে প্রকৃত রোমান্সের মুখোমুখি হ'লাম। আফ্রিকার গহন বনে হায়েনার উল্লাস, গোরিলার দৃপ্ত অট্টহাসি, কৈশোরের স্বপ্নে বোনা

মন ও কল্পনায় যারা একদিন বিস্ময় ও আনন্দের নিবিড়তা সৃষ্টি ক'রে রেখেছিলো, কে জানতো তারই এক ক্ষুদ্র সংস্করণের রোমান্টিক রাজ্যে সত্যিই একদিন উপস্থিত হব। ইচ্ছে করলে এখনই লরী থেকে নেমে বাল্যের সেই স্বপ্নবিরচিত রাজ্যে উপস্থিত হতে পারি যেখানে বাঘ ভালুক গণ্ডার হরিণ দলে দলে ঘোরে ফেরে, দুর্বোধ্য ভাষায় নিস্পন্দ বনানীর বুকে স্পন্দন তোলে। ওইতো লরী থেকে হাত কয়েক দূরেই যে নীল গাছটা আকাশের কোলে মাথা তুলে দিয়েছে তারই পাশেই সেই রহস্যময় কল্পনার রাজ্য! ছুটবো কি তারই সন্ধানে? উচ্ছ্বাস যাক।

চাঁদের ধবধবে আলো শাল গাছের ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলছে। বহুদূরে বনের কোন্ এক গোপন প্রান্ত থেকে নিরালা পাখির আর্তনাদ ভেসে আছে। চারদিক নিস্পন্দ নিঝুম, মোটরের ঘর ঘর আওয়াজ শুধু তার ব্যতিক্রম। কে ব'লবে, এই এমন আলোভরা রাতেই রুষ-রণক্ষেত্রের কোণে কোণে মানব সভ্যতার এক ভয়াবহ অগ্নি-পরীক্ষা চলেছে। সেই অগ্নিপরীক্ষার কোন প্রত্যুত্তরই এই দুর্গম রাজ্যে এসে পৌছবে না। ভাবতে যেন কেমন অবাকই লাগছিলো। প্রতি ইঞ্চির জন্যে একজায়গায় মরণের সংগ্রাম চলছে যখন তখন এই নিস্তব্ধ বনানীর বহু বিস্তৃত এলাকা মানুষের স্বার্থের জন্যে যুগযুগ ধ'রে উদ্গ্রীব হ'য়ে আছে।

আঁলো আঁধারে ছাওয়া বনের মধ্যে মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে কেমন এক ধরনের লালফুল পথের দুধার দিয়ে ফুটে রয়েছে। শিশুর অব্যক্ত বিস্ময় ও কৌতুহল নিয়ে সে সব দেখছিলাম! আমার কাছে সে সবই তখন অপূর্ব। কেবল অপূর্ব লাগছিলো না হাতের মুঠোয় ধরা ইন্দোর থেকে কেনা ছোট ব্যাগটা যার মধ্যে রয়েছে লক্ষ্ণৌএর খরমুজ—অবশ্য, তখন সে খরমুজ আকৃতি হারিয়ে প্রকৃতি-টুকুকে শুধু কোনরকমে বজায় রেখেছে অর্থাৎ লরীর ঝাঁকানিতে সে খরমুজ

দলা পাকিয়ে গেছে আর তার থেকে কেমন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ উঠছে। এই ভ্যাপ্‌সা গন্ধে ভেতরকার কবিত্বের শ্বাসরোধ হবার উপক্রম আর কি!

গন্তব্য স্থানের কাছে যে এসে প'ড়েছি ছাড়া ছাড়া দু'একখানা কাঠের বাড়িতে তার প্রমাণ মিলছিলো। ক্রমে ঘর বাড়ি আরও ঘন হ'য়ে উঠতে লাগলো; তারই সঙ্গে জেগে উঠলো যাত্রীদের মধ্যে এক আনন্দের চাঞ্চল্য।

নির্মেঘ আকাশে নীল আলো ছড়িয়ে রয়েছে। বাতাসে কেমন এক ধরনের পাহাড়ী পাহাড়ী গন্ধ। শালগাছগুলো জাহাজের মাস্তলের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে র'য়েছে যেন কোন সামুদ্রিক বন্দরে আমরা এসে প'ড়েছি। খ্যাচাং ক'রে একটা শব্দ তুলেই হঠাৎ লরীখানা থেমে গেলো। তাকিয়ে দেখি ছেলে বুড়োয় মিলে বহু স্থানীয় লোক লরীখানা ঘিরে ফেলেছে। বুঝলুম আমরা এসে গিয়েছি। চারদিকে ঔৎসুক্যের সারা—ডাকাডাকি—হাঁকাহাকি—কেবল, আমাকে ডাকবার কেউ ছিল না। পরে জেনেছিলাম এই লরীই এখানকার প্রাণকেন্দ্র। একে কেন্দ্র ক'রেই এদের আলাপ আলোচনা চলে। যেদিন লরী এলো না, সেদিন কেমন যেন একটা হতাশার ভাব সবাইএর মুখে চোখে। এ হতাশা অনেকটা 'পালামৌ'-এর সেই বধুদের মত যারা কলসী নিয়ে বৈকালিক জল অভিসারে যেতে পারে নি।

আস্তে আস্তে মোটঘাট নিয়ে সবাই-এর মত নামলাম। মনে কেমন একটা অবসাদের ভাব। প্রাণান্তকর পথের ক্লেশ, তা ছাড়া নতুন এক সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন অচেনা দেশের প্রথম পরিচয়ের অস্বাচ্ছন্দ্য। অকপটে বলা চলে, একটুও ভাল লাগছিল না তখন।

কুলি কুলি ক'রে চীৎকার ক'রেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অগত্যা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মোটঘাটগুলো বয়ে নিয়ে চল্লাম। খানিকটা

যেতেই একটা ছোট ছেলেকে মাল নিতে পারবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় আর একটা বড় ছেলের ইঙ্গিতে সে মাল নিতে রাজী হ'য়ে গেলো। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম।

পথ ক্রমেই উঁচু হ'য়ে উঠে গিয়েছে তাকেই রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে হিমালয়ের বিরাট বিস্তৃতি আঁকা-বাঁকা ক্রোশের পর ক্রোশ, যোজনের পর যোজন। পথের আগাগোড়া পাথর ছড়ানো, বৃষ্টিতে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে জলের সঙ্গে। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব (লক্ষ্য ক'রবেন তখন আষাঢ় মাস) অনেকটা আমাদের দেশের অঘ্রাণ মাসের মত। বাতাসে হেমন্তের গন্ধ। দু'ধারে টিনের ছাওনি দেওয়া অজস্র কাঠের বাড়ি চাঁদের আলোয় ঝিকমিক ক'রছে। শব্দহীন আকাশের নিচে খাস-নেপালের এক শহরের মধ্য দিয়ে নেমে চ'লতে মনটা কেমন যেন একরকম হ'য়ে উঠছিলো। সামনে হিমালয় পৃথিবীর যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতার সর্বশেষে সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে।

অবশেষে আমার নির্দিষ্ট বাসায় গিয়ে পৌঁছলাম। আমার উপস্থিতিটা আকস্মিক না হলেও দিনটা একটু অপ্রত্যাশিত হয়েছিলো। রাত বেশি হয়ে গিয়েছিল, তাছাড়া পথের ক্লান্তি—তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়েই টানা ঘুম।

হিমালয়ের নেশা

সম্পূর্ণ এক নতুন পরিবেশের মধ্যে মেঘলোকের প্রথম রাত প্রভাত হলো। কাল জ্যোৎস্না রাতের অস্পষ্ট আভায় যা কিছু রহস্যময় বলে মনে হয়েছিল। আজ প্রভাতের অত্যুজ্জ্বল আলোকে সে সব অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সহজ বলে মনে হলো। তবু সে রহস্যের ঘোর একেবারে কাটেনি, হিমালয়ের নামের সঙ্গেই তার নাড়ীর সংযোগ।

এখানে বেলা আটটায় রোদ ওঠে কারণ, পাহাড়ের আড়াল বেয়ে সূর্যকে উঠতে হয়। রোদ ওঠেই খর দীপ্তি নিয়ে—তাতে উষার স্নিগ্ধ পরশ নেই, আছে অপরাহ্নের উগ্র আভাস। আষাঢ় মাস হলেও আজ আকাশ উজ্জ্বল নীল, পাহাড় সবুজ, আর তারই গায়ে সাদা তুলোর মত মেঘ শান্ত আবেশে গা ছেড়ে দিয়েছে। কাল পাহাড়টাকে ভালো করে দেখবার সুযোগ পাই নি—আজ দূর থেকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম। পাহাড়ের গায়ে গায়ে লাল রং এর মেটে পাহাড়ী কুটীর সুন্দর দেখাচ্ছে—ঠিক জন্মাষ্টমী দিনে যেমন অনেক বাড়ীতে পাহাড়ের ঘরবাড়ী, গাছপালা সাজান হয় তেমনি। স্থানে স্থানে বন আবাদ ক'রে ভুট্টার চাষ হয়েছে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিলো। অসংখ্য সুপারি গাছে লাল লাল সুপারি কি চমৎকার দেখাচ্ছে, যেন কোন থিয়েটারের উন্মুক্ত পটভূমিকা। পূব ধারের ওই জায়গাটা দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে বেঁকে রাস্তা উঠে গেছে, স্থানীয় বন্ধু দেখালেন। ধীরে ধীরে রেখে ঢেকে সব দেখতে হবে ভেবে সে দিনের মত ওইখানেই ইতি—কারণ, পাহাড়ী দেশে বেকার দিন কাটানো যে কত বিড়ম্বনা পূর্ব

অভিজ্ঞতা আংশিক থাকলেও পরে সেটা ভাল করে বুঝেছি। তাই, প্রৌঢ়ত্বের মনস্তত্ত্ব এক্ষেত্রে অবলম্বন করাই বিচারসহ মনে করেছিলাম।

ধীরে ধীরে সমগ্র আবেষ্টনীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠতে লাগলাম। কয়েকদিন আগেও যারা ছিলো অপরিচিত, আজ তাদের পরিচয়ের সান্নিধ্য গাম্ভীর্যের সম্পর্ককে ছাপিয়ে গেছে। আর রহস্যের আবছা আলোয় যাদের দেখেছিলাম, ক্রমে ক্রমে তারা সে রহস্যের স্বপ্নকুয়াসা কাটিয়ে উঠছে।

সেদিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঠিক হলো, সত্ত্য নদীর ঝরণা দেখতে হবে। বিকেলের দিকে খাবার খেয়ে রওনা হওয়া গেল। পথ ক্রমেই উন্নত হ'য়ে উঠছে। নিঃশ্বাস ঘন হ'য়ে উঠলো, কিছুদূর যেতে সত্ত্য নদীর একটানা ঝির ঝির শব্দ কানে এসে লাগছে। সেই শব্দের নেশায় মন চাঙ্গা হয়ে উঠলো। পেছনে তাকিয়ে দেখি, ক্লান্তিতে বোনটির মুখে মেঘছায়া ঘনিয়ে উঠেছে।

রহস্য ক'রে জিজ্ঞেস করলাম,—কিরে, খুব যে বড়াই করে এসেছিলি, কেমন লাগছে এখন! বাজী ধরে রসগোল্লা খাবার সময় পেটের সংস্থান হারিয়ে মুখখানা যেমন সঙ্কুচিত হয়েও আত্মমর্যদার খাতিরে স্বীকৃতি পায় না। মুখখানার তেমনি ভঙ্গি তুলেই সে উত্তর দেয় ভারি বীরত্ব দেখান হ'চ্ছে, আমার তো কিছুই হয় নি। নিজের মনের কথাটা কি আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে চাও? ওদিকে ভাগ্নেটি দেখি হরিণের মত লাফিয়ে চ'লছে লাল-নীল রংএর অসংখ্য কাঁকর মাড়িয়ে। নদীর শব্দ ক্রমেই ঘনিয়ে উঠেছে। এতক্ষণ আসছিলাম নির্জন বনপথ ধরে, লোকালয় চোখে পড়ে নি। শব্দ গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে দু'একখানা ক'রে বাড়িও নজরে পড়তে লাগলো। শেষে আমরা রীতিমত একটা বাজারের মধ্যে এসে পড়লাম। কিন্তু, আমাদের দেশে বাজার ব'লতে যা বোঝায় সে রকম

নয়। সামান্য চিড়ে, তেল, ডাল এই রকম টুকিটাকি দু'চারটে জিনিস আর কি। রঙীন্ জামা পরে সুশ্রী সুপুষ্ট নেপালী ছেলে-মেয়েগুলো ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে তাঞ্জামে (একরকম মানুষবাহিত যান বিশেষ) চড়ে সম্রান্ত কোন নেপালী মহিলা ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চ'লতে চ'লতে এক সময় সদ্যু নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম।

জায়গাটার বর্ণনা দিতে গেলে এক কথায় বলতে হয় অপূর্ব! বাস্তবিক, সৌন্দর্যের বর্ণনা কবিতা নভেলে যথেষ্টই পড়েছি। রবীন্দ্রনাথের জন্য তার অভাব বোধ করি নি কোন দিন; কিন্তু সে কবিতার সত্যিকার উৎস যে এত সুন্দর হ'তে পারে জীবনে তার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এই প্রথম। চারদিকে পাহাড় বেষ্টিত সদ্যু উচ্ছৃঙ্খলতার ফিনিক তুলছে। সন্ধ্যার ম্লান আলোয়ও তার দীপ্তি ঢেকে রাখতে পারে নি। পাহাড়ী ঝরণা—বন্ধ গতি তার পাথেয়। এই গতিই শুধু উপভোগ করছিলাম সন্ধার নীরব প্রাক্কালে। মাথার উপরে পাহাড়ের চূড়া অস্ত আলোয় হ'লুদ হ'য়ে উঠেছে। তারই শিয়রে শিয়রে লাল পাহাড়ী কুটীর মৌন নির্ণিমেষে সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে আছে যেন। শুনলাম এই পাহাড়টার মাথায় নাকি এই আষাঢ়ের মাঘের শীত। ধানকোটা যাবার পথটা এঁকে বেঁকে বনের মধ্যে মিশে গেছে। গৃহ-ফেরত পথ চলতি নেপালী, ডোকো (এতে জিনিসপত্র বোঝাই ক'রে নেওয়া হয়; এখানে মাল নেবার এটাই প্রধান উপকরণ, আমাদের দেশের বস্তার মত কাজ করে অনেকটা) মাথায় নেপালী কুলি ওই পাহাড়ের পথে মিলিয়ে গেলো। হাওয়াতে একটা শীত শীত ভাব।

বিস্তর চকমকি পাথর পড়েছিল। অমরা জলের ধারে বসে ঝরণার জলে পাথর ছুঁড়ে স্তব্ধ সন্ধ্যাকে খানিকটা মুখর ক'রে তুললাম।

ফেরবার সময় মনে হয়েছিলো সাধনা করবার জন্যে যারা হিমালয়ে ছুটে তারা ভগবানের টানে আসে না, আসে অস্থির জীবনকে সুস্থির করবার জন্যে হিমালয়ের এই প্রশান্তি ও ভাব গাম্ভীর্যের মায়ায়, মনের বিকারে জীবনকে যারা স্বীকার করলে না এই শব্দহীন বন ও পাহাড়ই তাদের সে বিকৃতির মায়া ফাঁদ। অসুস্থ ও বিক্ষুব্ধ মনের এই লোভ যে সত্যিই একটা প্রকাণ্ড লোভ নিজের মনের দিকে তাকিয়ে সেটা বিশ্বাস করতে বাধলো না। এই অনাবিল স্তব্ধতা, এই অচঞ্চল পাহাড়ের পটভূমিকা শান্তি ও তৃপ্তির বাঁধা ধরা পথ এই কি? জীবনের ক্লান্তির দিনে সাময়িক এই স্তব্ধতার মূল্য অস্বীকার করব না কোনদিন কারণ জীবনেরই মেয়াদ বাড়িয়ে দেয় যে সে। কিন্তু চিরন্তন পথ হিসেবে এটা মায়া ফাঁদ নয় কি?

এখানে হাট বসে দু'দিন। সেদিন হাটে গেলাম বেড়াতে। হাট বাজারই একমাত্র জায়গা যেখানে স্থানীয় আচার ব্যবহার রীতিনীতি ইত্যাদির সুলভ সন্ধান মেলে। গিয়ে দেখি ও বাবা! এ কেমন ধারা হাট! জন আট-দশ লোক বসে আছে দূরে দূরে ছড়িয়ে। কারও কাছে দুটো মুরগী কারও কাছে কিছু চিড়ে—এখানে চিড়ে দেখলাম মাত্র বার আনা ক'রে সের। আরও দু'একটা জিনিস উঠেছিলো। কিন্তু জনকয়েক লোকের সমাবেশকেও লোকে কি বলে হাট বলে ভেবে হেসে ছিলাম। শেষে শুনলাম, এখানে হাজা (কলেরা) লেগেছে, তাই এই দুরবস্থা। আমাদের দেশে টাকা ভাঙানর জন্যে বাটা নেওয়াটা বে-আইনী। এখানে দেখলাম, প্রকাশ্যে দিব্বি পাহাড় প্রমাণ রেজকী নিয়ে বাট্টা লোভী ব্যবসায়ীরা বসে আছে।

সব চাইতে ভালো লাগতো আমার ভোরের দিকটা, হঠাৎ কোন কোন দিন ভোর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতাম আকাশের কোলে শুকতারা দপ দপ করছে। রাতজাগা ধূসর পাহাড়টা বহুদূর

কোন মহাশূন্যের প্রান্তে মিলে গেছে। দূরে তরাই-বনে জমাট আঁধার আরও রহস্যময় হ'য়ে উঠছে। হয়তো ওরই আনাচে কানাচে হাতী বাঘের শতর্ক চলাফেরা ফিস্‌ফিসিয়ে উঠছে। আর এ সবকে ছাপিয়ে উঠছে শ্রান্তিহীন সত্যুর ঝির ঝির শব্দ, এই শব্দটা যেন কেমন একটা রহস্য কিছুকে ঘিরে রেখেছিলো। যতদিন ছিলাম ওই শব্দের কথা কোনদিন ভুলিনি।

ছোট খুকিটি ছিলো আমাদের সবাই-এর মাধ্যাকর্ষণ। বড় বড় চোখ দুটো মেলে ধরে সে যখন দাঁত বের করে ছুটোছুটি করতো সে এক দেখার জিনিস। সবার খাবার সময় তার প্রচুর উৎসাহ। সে-সময় সময়ের ভাঁড়ারে তার টান পড়তো—কোন্ পাত্র ফেলে কোন্ পাতে যায়, সময় যে খুবই কম।

এখানে এসে নেপালী ব'লতে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছি দু'জনের সঙ্গে। তাঁদের একটা জমিদার ভদ্র অমায়িক, সেবাপরায়ণ এক নেপালী যুবক। আর একজন রাজপরিবারের লোক ততোধিক স্ফূর্ত্তিবাজ এক তরুণ। নেপালে নাকি নিয়ম আছে, রাজবংশের কেউ কাটমুণ্ডতে থাকতে পারবে না। তাই তাঁরা এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছেন, রাজা বা মন্ত্রী এলে এঁদের অতিথি হন। এই ভৈরব বাবু রাজা হ'লেও প্রজার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পার্থক্য দেখলাম না কিছু। একটা হাফসার্ট গায়ে ভৈরববাবু চলেছিলেন বাজারের পথে, এ-দৃশ্য অসুলভ ছিলো না। এঁর ওখানে বিকেলের দিকে আমাদের আড্ডা জমতো। পাহাড়ের ওপর এঁর বাড়ি যেতে আমাদের রীতিমত পরিশ্রম করতে হতো; পাহাড়ের ওপরেই এঁর বাড়ি ছাদের ওপর খোলা এবং ঘেরা, খানিকটা জায়গায় চেয়ার পাতা, গল্প করতে করতে গরম গরম চা এসে পড়তো। দূরে আরও বড় বড় পাহাড়ের চূড়া বহু উঁচুতে আকাশে গিয়ে উঠেছে। 'উহাঁকা পানি আচ্ছা ফয়দা করতা হায়' উচ্ছ্বাস ভরে

ভৈরববাবু ব'লতেন, ওখানকার পানি দু'এক দিন খেলেই নাকি শরীর 'আচ্ছা' হ'য়ে যায়। ওখানে প্রচুর শীত নাকি এখনও। পাহাড়ের ওধারে প্রচুর কমলা নাসপাতি আলুবোখরা, আপেল ইত্যাদির গাছ। চার আনাতেই নাকি একশো কমলা পাওয়া যায় শীতের সময়! ধ্যানগম্ভীর পাহাড়ের কোলে বসে চা খেতে খেতে নানা গল্প হতো! দেখতে দেখতে অপরূপ পাহাড়ের মাথায় চাঁদ উঠতো। পাহাড় বন আলোময় হয়ে উঠে এক অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতো, পাহাড়ের বুকে বুকে পাহাড়ীদের কুটীরে আলো জ্বলে উঠতো যেন রাতের আকাশে তারার দীপালী, হিমালয়ের সায়াহ্নের একটা বৈশিষ্ট আছে যা বোঝা চলে, কিন্তু বোঝান চলে না। পাহাড় ডিঙিয়ে অনেক রাত করে যখন বাসায় ফিরতাম তখন সেই বৈশিষ্ট মনের মধ্যে থেকেই যেতো! ফিরবার সময় নিচে ধারান শহরটা অপরূপ হ'য়ে উঠতো। সারি সারি টিনের চালা চাঁদের আলোয় ঝক ঝক করছে। দূরে সপ্তকোশী নদীর রূপালী ধারা।

ভৈরববাবু এক মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক সেই মন্দির নাকি বাহান্ন পীঠের এক পীঠ। তাই, এর গুরুত্ব কম নয়। একদিন মন্দিরে ঢুকে দেখে এলাম সব।

স্বাধীন নেপালের চেয়ে পরাধীন ব্রিটিশ ভারতও যে অনেকাংশে স্বাধীন এটা মনে হয়েছিল সেদিন, যেদিন শুনলাম এখানে স্কুল দিতে গেলে গভর্ণ-মেন্টের বিষ নজরে পড়তে হয়। ধারানেই কিছুদিন আগে একটা স্কুল ছিলো, সেটা সরকারী আদেশে নাকি বন্ধ হয়ে গেছে, বিরাট নগরে হাইস্কুল নাকি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শোনা গেলো তার প্রতিষ্ঠাতা আপাতত জেলে, রাস্তাঘাটের বিস্তর আই, বির ছড়াছড়ি। খুব হুঁসিয়ার হয়ে কথাবার্তা চালাতে হয়। ছেলে বাপের বিরুদ্ধে এবং বাপ ছেলের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে এই রকম নজীরও আছে যদিও

এতটা বিশ্বাস করতে বাধছিলো। তবে নেপালের শহরগুলোর দুরবস্থা রাস্তাঘাটের শোচনীয়তা, শিক্ষার চরম দারিদ্র দেখে বাস্তবিকই নিরাশ হয়েছিলাম।

এখানে শতকরা নিরানব্বইটারও বেশির ভাগ বাড়িই কাঠের মাথায় টিনের চালা। এখানে কাঠ কিনতে হয় না, বন থেকে কেটে আনলেই হলো। তারাই-এর বন থেকে কাঠ কাটিয়ে নেবার contract নিয়ে কয়েকটা কোম্পানী কাজ করছে শুনলাম। কর্মচারীদের মধ্যে অনেক বাঙালী আছেন। শাল গাছ যে এত প্রকাণ্ড হ'তে পারে এখানে এসে সে অভিজ্ঞতা হলো, ছোটনাগপুর বা সাঁওতাল পরগনার শালগাছ এর তুলনায় ঘাসের সামিল।

নেপালে ভিখারীর উপদ্রব নেই, ভিখারী একদম নেই শুনলাম। শুধু একজন ভিখারী-ই আমার চোখে পড়েছে। সেও নাকি বিহার থেকে আমদানী।

নেপালে শুনলাম কোন ট্যাক্স নেই। জমির খাজনা বিঘা প্রতি গড়ে এক টাকা বারো আনার মত। ধান ও ভুট্টার চাষ প্রধান, পাহাড়ীদের প্রধান খাবারই ভুট্টা। ভুট্টাকে চালের মত করে ভেঙে নিয়ে এরা রেঁধে খায়। খেতেও খুব সুস্বাদু। পাহাড়ে ভুট্টার বাড়ও অসম্ভব দেখলাম।

নেপাল এসে মনে হয় না শিল্প বিপ্লবে দুনিয়া কি ঐন্দ্রজালিক পরিবর্তন এনেছে মানুষের জীবন ধারায়। যন্ত্র জগতের বিচ্ছিন্নতা এদের জীবনে গতি আনতে পারে নি, চিন্তার ক্লীবতা ঘোচাতে পারে নি, জীবনের বাঁকে এদের অনগ্রসরতার ঘুর্ণী সেই একই চক্রে ঘুরপাক খাওয়া। অথচ এখানে এক বিরাট শিল্পনগরী গড়ে উঠতে পারে, তার উপকরণ রয়েছে প্রচুর। একদিকে অফুরন্ত বনজ সম্পদ যা থেকে কাগজ, আর্টিফিসিয়াল সিল্ক, ফার্নিচার ইত্যাদি অসংখ্য রকম

শিল্পের সৃষ্টি হতে পারে; আর এক দিকে এই উন্মাদ পাহাড়ী ঝরণা দিতে পারে সেই শিল্পে প্রাণকনিকা। হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটির এক বিরাট সম্ভাবনা নেপালে রয়েছে যা দিয়ে সমগ্র নেপালকে আলোকে-পুলকে, গতিতে-উচ্ছলতায় জীবন্ত ও সজীব করে তোলা যায়। কারণ হিমালয়ই ভারতের অধিকাংশ নদীর প্রসূতি এবং নেপাল তারই একটা অংশ। বন্য প্রকৃতি ও বর্বর মানুষের সংঘাতে একদিন পৃথিবীর রূপান্তর শুরু হয়েছিলো, আজও তার প্রথম অধ্যায়ের শেষ হয়নি এখানে। এখানে তেমনি হিংস্র বাঘ নিরাপদ আশ্রয়ে চলাফেরা করে, 'সাপে-ভালুকে' লড়াই চলে, নদীর ঝরণা বন্য উচ্ছৃঙ্খলতায় ফেনিল হ'য়ে ওঠে—বুনো পাখী আকাশের গান গায়, মানুষের সবল হাতের ছোঁয়াচ এদের বন্ধ্যা জীবনযাত্রায় শৃঙ্খলা আনতে পারে নি—মানুষের কল্যাণে এদের আজও লাগান যায় নি। অনাবৃত শিরে দাঁড়িয়ে হিমালয় আজও মানুষের সেই আদিম জীবনযাত্রার নীরব দর্শক হ'য়েই রইলো। এই কি বিংশ শতাব্দীর সুবিপুল অবদান! এই কি মানবসংস্কৃতির বিজয়স্মৃতি। বিজয়েরই স্মৃতি না হয়ে নেপাল আজও স্মৃতির বিজয় ঘোষণা করছে।

কিছুদিন থাকার ইচ্ছা নিয়েই নেপাল এসেছিলাম কিন্তু সে ইচ্ছা কার্যকরী হ'ল না। আবহাওয়া এখানকার চমৎকার সন্দেহ নাই! কিন্তু পেটের পক্ষে যা-কিছু খারাপ—আলু আর ডাল, ডাল আর আলু, খাবার হিসেবে তাই শুধু পাওয়া যায়। অবশ্য, মাংস আর ডিমও কিছু কিছু মেলে। এই খেয়ে শরীরের অবস্থা খারাপই বোধ করছিলাম। তাছাড়া আর একটা বিরাট বাধা ক্রমেই ঘনিয়ে আসছিল। শ্রাবণ ভাদ্র এবং আশ্বিন এই তিন মাস এত বৃষ্টি হয় এখানে যে, মোটর প্রায় এক রকম অচলই হয়ে যায় নাকি তখন। অর্থাৎ, দু তিন মাসের অনিশ্চিত বন্দী জীবনের মধ্যে পড়ে যাওয়া আর কি। এখান থেকে যাবার অন্য

কোন উপায়ও নেই। তা ছাড়া অন্যান্য কারণ আরও ছিল যার জন্যে যাওয়াটা অত্যাবশ্যক হ'য়ে পড়ছিলো। কিন্তু যাওয়া বললেই তো আর যাওয়া চলে না! রীতিমত রিহার্সেল দিতে হবে কয়েকদিন ধরে! সব ঠিক করে বসে আছি মোটর আর আসে না। যুধিষ্টির বাবুর দোকানে (একমাত্র বাঙালী দোকান) রোজই ব'সে থাকি রাত দশটা নাগাৎ—মোটরের আলোর প্রতীক্ষায় চোখ দুটো শ্রান্ত হয়ে ওঠে। নিরাশ চিত্তে বাসায় ফিরে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গেই বলি সেই একই দুঃসহ সংবাদ। এ কদিন মোটরই যেন আমাদের জীবনের ধ্যান ধারণা হয়ে উঠলো। অনেক প্রতীক্ষার শেষে সত্যিই একদিন মোটর এসে হাজির হলো। যুধিষ্টির বাবুর দোকানে বসে আমাদের মনে হ'লো জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন বোধ হয় এইটাই। কিন্তু এমনি বিড়ম্বনা সে রাত্রে এমন বৃষ্টি হলো যে, আমাদের সব আশা শেষ হ'য়ে গেলো। পরদিন মোটর যাবে না শুনে নিরাশ হ'য়ে মুখ কালো ক'রে বসে আছি—হটাৎ শুনলাম মোটরটা আমাদের ফেলেই চম্পট দিয়েছে। আরো নিরাশা, আরও মুখ কালো। ড্রাইভারের শ্রাদ্ধের আয়োজনে আমাদের পাত পড়েছে অদম্য রোষ ভরে এই কল্পনাই করছিলাম।

আবার মোটর এলো কিন্তু পরের দিন করুণ ভাবে বিদায়ের সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেলো যখন মোটরে মোটঘাট নিয়ে বসেও উঠে আসতে হলো মোটর যাবে না ব'লে। বিদায়ের সময় যাদের চোখে জল দেখে গিয়েছিলাম ফিরে এসে দেখলাম সবাই হাসছে। আর আমাদের চোখে—না না সেটা অত্যন্ত লজ্জার কথা।

পরদিনও আবার রওনা হবার আগে হটাৎ পাহাড় থেকে মেঘ গড়িয়ে নেমে সারা শহরটাকে ঝাপসা করে তুললো। অনিশ্চিত ভাবে পথে নেমে মোটরের সন্ধানে চলেছি পেছনে ফিরে দেখি

খুকি কপাট ধরে দাঁড়িয়ে—তার বড় বড় কালো চোখ দুটো স্থির উদাসী দৃষ্টিতে পথের পানে ফেরানো।

মোটর ছুটে চলেছে। আবার সেই রকম ভিড়, সেই বিরক্তি, অবসাদ ও নৈরাশ্যের বিরাট গ্লানি। পেছনে দাড়িয়ে ধূসর হিমালয় বিদায় মুহূর্তের বিপদে পাণ্ডুর। মেঘক্লান্ত আকাশে দুর্যোগের আভাস। টেরাই এর বনে মোটর ছুটেছে। আসবার পথে অস্পষ্ট আঁধারে যে সুনিবিড় বিস্ময় ঢেলে দিয়েছিলো মনে, আজ ফেরবার পথে সূর্যের আলোয় সেই রহস্য খানিকাংশে ফিকে হয়ে গেছে। নেপালের সীমান্ত পেরিয়ে যখন যোগবাণীতে পৌছলাম তখন হিমালয়ের নীল সঙ্কেত দূরে, বহু দূরে সবুজ আকাশের পানে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ভোটান সীমান্তে

ভোটান সীমান্তের গাড়িতে সেদিন বেজায় ভিড়। পুজোর মরসুম লেগেছে। চলেছি ভোটানের সীমান্তে মধু টি এস্টেটে এক বন্ধুর কাছে—প্রয়োজনেও বটে, অপ্রয়োজনের অবসর বিনোদনের অন্বেষণেও বটে। লালমনিরহাট ষ্টেশনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'লো—তিনিও হাসিমারা ষ্টেশনেই নামবেন। শুনলাম, গাড়ি সেখানে পৌছতে পৌছতে বেশ একটু রাত্তির হবে। ভদ্রলোক হাসিমারার নিকটবর্তী এক চা বাগানের ম্যানেজারের ছেলে। তাই, গায়ে সিল্কের জামা, হাতে রিষ্ট ওয়াচ্ চোখে চশমা—পায়ে চকচকে নাগরা। কিন্তু, এহেন চকচকে বাবুটির মুখেও দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিলো যখন শুনলেন গাড়ি আজ অনেক লেট এবং পৌছতে অনেক রাত্তির হ'য়ে যাবে। আমিও তাঁর সহযাত্রী জেনে তিনি একটু নিশ্চিন্ত হ'লেন; আমিও মনে মনে বেশ একটু নিশ্চিন্ত হলাম। ভদ্রলোক বললেন, মশাই ও অঞ্চলে রাতে চলাচল বড়ই বিপজ্জনক—একে বাঘের ভয়, দুই মানুষের আশঙ্কা। বললেন, মশাই আপনার মধু টি এস্টেট তো আরও দূর। সেখানে যাঁর কাছে যাচ্ছি তাঁর নাম বললে ভদ্রলোক চিনলেন—কিন্তু যতটা চিনবার আভাস দিলেন চিনতেন কিন্তু তার চেয়েও বেশি। পরে সেটা জেনেছি। ভদ্রলোক আশ্বাস দিয়ে বললেন, সম্ভবতঃ এ আশ্বাস তিনি নিজেকেই দিলেন, ভয় কি মশাই! একটু দুশ্চিন্তা যে হয় নি তা বলতে পারি নি।

কুচবিহার ছাড়িয়ে যাবার পর থেকেই সামনে হিমালয়ের অস্পষ্ট দৃশ্য ভেসে উঠলো। কি চমৎকার। চারদিকে বনের গভীরতা ক্রমেই বেড়ে উঠছে। রাজাভাতখাওয়ার বন দেখে তো চক্ষু চড়কগাছ। উঃ, কি নিবিড় বন আফ্রিকার বিখ্যাত বনকেও যেন ছাড়িয়ে যায়। শুনলাম, এখান দিয়ে দিনের বেলায়ও লোক চলাচল করতে সাহস পায় না। দিনের বেলায়ই নাকি হাতি চলাচল করে। যাক, প্রকৃতির এক রোমাঞ্চক রাজ্যে এসে পড়েছি—টেরাই-এর বনে যে রাজ্যের সাক্ষাৎ একবার পেয়েছি। বনের মনের ওপর একটা প্রভুত্ব খাটাবার ক্ষমতা আছে—মনকে কেমন অবাক এবং বিহ্বল করে দেবার শক্তি আছে তার। রাজাভাতখাওয়ায় নিবিড় অরণ্যের মাঝখান দিয়ে যেতে মনে সেই ভাবের আস্বাদ পাচ্ছিলাম। ওদিকের বেঞ্চে এক ভদ্রলোক চা বাগানের এবারকার পূজার উৎসবের ফিরিস্তি দিচ্ছেন—কোন বাগান কাকে পাল্লা দেবে। বর্তমানের সঙ্কটের সঙ্গে তিনি হতাশভাবে অতীতের সস্তার বাজারের জাঁকজমকের তুলনা দিচ্ছিলেন। বুঝলাম চা বাগানে পূজার বেশ আনন্দ হয়। তাছাড়া, চা বাগানের ম্যানেজার প্রভৃতিদের সম্বন্ধে তো ছোটবেলা থেকেই গৌরীসেনী গল্প শুনে আসছি। তাই উৎসবের মসলারও অনটনের আশঙ্কাটা নাই। অন্ধকার গাঢ় হ'য়ে উঠছে; ট্রেণের কামরা প্রায় খালি কেননা, ভোটানের নির্জন সীমান্তদেশ ক্রমেই কাছিয়ে আসছে। বাইরের আবছা আবছা গাছপালার মাতলামি শুরু হয়েছে। গাড়ির ঝিকিঝিকি ভাব। হঠাৎ পূব দিগন্তে আলোর সঙ্কেত জেগে উঠলো। দেখতে দেখতে সাদা ফস্‌ফরাসের আলোয় যেন আকাশের গা সাদা হ'য়ে উঠলো। এইবার দিক দিগন্তের অন্ধকার গাছের পাতায় পাতায় ভিড় করতে আরম্ভ করছে। হিমালয়ের কালো শৃঙ্গগুলো উর্দ্ধশিরে আকাশের জয়গান গাইছে। গাড়ি হাসিমারা ষ্টেশানে থামবে এবার। আগে থেকেই

তৈরি ছিলাম। ভদ্রলোক বিষণ্ণ মুখে বলছিলেন, লালমনিরহাট থেকে একটা টেলিগ্রাফ ক'রে দিলেও হ'তো।

ব'ললাম, টেলিগ্রাফের আগেই আমরা পৌঁছে যাবো বললেন যে টেলিগ্রাফ মাষ্টার !

ও, তাইত্তো, যন্ত্রের মত ভদ্রলোক ব'লে উঠলেন। বাঘের ভয় এইবারে হয়তো তাঁকে ভালরকম পেয়ে বসেছে। বাঘের ভয় সম্বন্ধে আমার এ অঞ্চলের অভিজ্ঞতা নাই বলে আশঙ্কা সত্বেও আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত আছি। তাই যা দেখতে এসেছি তাই ব'সে ব'সে মুগ্ধনেত্রে দেখছিলাম। চাঁদের আলোয় হিমালয় ঝলমল করছে। সামনের ওই পাহাড় ডিঙিয়েই হয়তো চিরতুষারের দেশে পৌছানো যায় যেখানে মেষচর্মাবৃত লামার দল মাখন মেশান সবুজ চা খায়, বৌদ্ধ সংঘারামে রহস্যময় সান্ধ্য ঘণ্টা প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ওঠে ভোটান, তিব্বত, মধ্য-এশিয়া হিমালয়ের রহস্যময় প্রাকারের মধ্যে যেন আমি কত দুর দুরান্তরের রহস্যময় পৃথিবীর সন্ধান পেলাম। আরে, এ কলার কাঁদিটা কার ?

ভদ্রলোকের কথায় চমকে চেয়ে দেখি ট্রেন হাসিমারা ষ্টেশনে থেমেছে ! ভদ্রলোক এককাঁদি কলার সামনে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। গাড়ির কামরায় আমরাই দুজন শুধু। বুঝলাম কোন হতভাগ্যের কুটুম বাড়ির অভিযান ব্যর্থ হ'য়েছে। ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত মনে সেই কলার কাঁদি নামিয়ে ফেললেন। ক্ষিদেটাকে আর কষ্ট দেওয়া কেন। কয়েকটা কলা ছিঁড়ে মুখে পুরে দিলাম। ভ্রমণ আমাদের রীতিমত বৈচিত্র্যময় হ'য়ে উঠেছে।

আমাদের জিনিসপত্র ষ্টেশনে রাখার ব্যবস্থা ভদ্রলোকই করলেন। ষ্টেশন মাষ্টার এঁর চেনা-জানা লোক। কাপড়টা একটু উঁচু ক'রে নিয়ে আমরা বনের পথ ধরলাম। ভদ্রলোক আবার আফসোস ক'রে

বললেন, ইস্, টেলিগ্রাফটা যদি ঠিক সময়ে পৌছতো তা'হলে এতক্ষণ আমরা মোটর লরীতে। আমাদের বাগানের এতগুলো লরী আর আমরা হেঁটে যাচ্ছি। লরীতে গেলে যে বেশ আরাম হ'তো তা বেশ বুঝছি কিন্তু, মন আমার পড়ে রয়েছে নতুন দেশের এক রোমাঞ্চপূর্ণ গল্পের জগতে। চারদিকে সমান করে ছাঁটা চায়ের ক্ষেত, কালো কালো গাছের সারি যেন ধবল জোছনার ধারায় গা ঢেলে দিয়ে নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। সারাদিনের মানুষের নির্যাতন এই স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক তাকে ভুলিয়ে দেয়। চারদিকে ছমছমে নির্জনতা। দূরের ওই জঙ্গল থেকে যদি বাঘ বেরিয়ে আসে? বাঘ না আসে তো একটা হায়েনা নয়তো একটা গরিলার বাচ্চা বেরিয়ে আসুক। তবু তো মরবার আগে একবার ভাবতে পারবো পৃথিবীর এক দূরতম প্রান্তে রহস্যময় গহন বনের পরিচয় পেয়েছি। জীবন যদি যায় তবুও সে জীবন গাঁয়ের মাত্র দুহাত সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। চা-এর বনে এই জোছনাসিক্ত রাতে যেন সেই সুদূরের হাতছানি উপলব্ধি করতে পারছিলাম—মঙ্গোপার্ক আর লিভিংষ্টোন একদিন যার টানে সীমাহীন পৃথিবীর বুকে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ সামনে এক জোড়া উজ্জল চোখ ঝল্‌কে উঠলো। অজানা বন্ধু লাফিয়ে উঠে বললেন, ওই যে আমাদের লরী আসছে।

সত্যি! আমিও আনন্দে অভিভুত হয়ে পড়লাম। কাছে আসলে সন্দেহ ভাঙলো। ড্রাইভারের নাম ধরে ডেকে বন্ধু বললেন এই সুন্দর সিং ব্রেক কসো!

খস্ খস্ খস্—খ্যাচ্—ব্রেক কসে সুন্দর সিং ব'লে উঠলো, আরে বাবু আপ আ গয়ে হ্যাঁয়। লেকিন্ আপ তো কই খবর উবর নেহি ভেজা হ্যায়! ম্যয় তো ওয়াপস চলে যাতে হ্যায়! এইসা কাম্ মৎ করনা। এত্না রাতসে আপ···মোটরে আবার স্টার্ট

দিয়েছে। বন্ধু সুন্দর সিংকে মধু বাগানের দিকে গাড়ি হাঁকাতে বললো। ড্রাইভারের কাছে ব'সে বেশ লাগছিলো। একে শ্রান্তির হাত থেকে বেঁচে গেছি তারপর বাইরে বেশ ঠাণ্ডাও পড়েছে। এদিকে ঠাণ্ডাটা বেশি। মোটরের ইঞ্জিনের গরমে বেশ লাগছিলো। আবার হাসিমারা ষ্টেশান পড়লো। বোঁ বোঁ করে লরী মধুবাগানের দিকে চললো। মাইল দুয়েক যেতেই বাগানের ফ্যাক্টরীর ঝিক্ ঝিক্ আওয়াজ শুনতে পেলাম। বন্ধু বললেন নিন, এসে গেছেন।

বিদায় নিয়ে ধীরেন বাবুর বাসার খোঁজ করে চললাম। বাগানের সঙ্কীর্ণ পথের ধারে সারি সারি কাঠের ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলছে। ঘরগুলো অদ্ভুত ধরনের। ঘরের মেঝেই প্রায় একতালা। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে খাড়া উঁচুতে সেই ঝুলন্ত মেঝেতে উঠতে হয়। সিঁড়ি বেয়ে উঠে ধীরেনবাবু ব'লে ডাক দিতেই ধীরেনবাবু ছুটে বেরিয়ে এলেন। আরে, আপনি যে—কাল আপনার আসবার কথা ছিলো, কি ব্যপার বলুন তো! এত রাতে এলেন কি করে? কাল ষ্টেশানে লরী ছিলো।

বললাম সব। বিশ্রাম করে খেয়ে নেওয়া গেলো। আর সবার খাওয়া হ'য়ে গেছে। এটা একটা মেস্।

মধুবাগান-এ একটুও সাড়া শব্দ নেই। সবাই ঘুমচ্ছে। এক ভদ্র লোক ছুটিতে ছিলেন। তাঁর সিট-ই আপাততঃ আমি অধিকার করলাম!

সেদিন একটু দেরি ক'রেই ওঠা গেলো। বারান্দায় বেরিয়ে প্রথম দর্শনেই বিরাট হিমালয়ের আঁকা-বাঁকা প্রাচীর চোখে পড়লো। কত কাছে মনে হ'চ্ছে। হিমালয়ের ওপরকার গাছপালাকে ঘাসের মত দেখাচ্ছে। ভোরে উঠে বারান্দায় পায়চারী ক'রতে ক'রতে এমনিভাবে হিমালয় দেখবো ভাবতেই পারি নি। বন্ধুর কাছে এর আগে শুনেছিলাম

অবশ্য, এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার কিন্তু, এতো চমৎকার বুঝতে পারি নি। সেই সুদূর পশ্চিমে হাজার মাইল দূরে কাশ্মীরের মাথায় যে হিমালয় শৃঙ্গে চমরী গরুর পাল ঘুরে বেড়ায় সেই শৃঙ্গেরই একটা অবিচ্ছিন্ন অংশ এই বারান্দায় পায়চারী ক'রতে ক'রতে দেখা যাচ্ছে ভাবতেও কেমন লাগে।

এখানে সকালে দুধ পাওয়া যায়। গরম গরম দুধ চিড়ে খাওয়া গেল। ঠাকুরটি কিন্তু বেশ ভদ্র। অমায়িক, আলাপী, সৌজন্য জানে। ছোট-নাগপুরের অসুর জাতির একটা লোক এই মেসের চাকরের কাজ করে। এখানেও ভারতের বিভিন্ন জাতির সমন্বয় ঘটেছে। কুলী বস্তী থেকে মাদলের শব্দ আসছে। ধীরেনবাবু খেয়ে দেয়ে অফিসে গেলেন। আমি একা একা ব'সে Illustrated Weekly-র পাতা ওলটাতে লাগলাম। আর একখানা সজীব পাতা উত্তর জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো। ঘরের মধ্যে ব'সেও এখানে হিমালয় দেখা যায়। ভারী মজা তো! নতুন জায়গার অভিনব পরিবেশে খুশি হ'য়ে উঠলাম।

ধীরেনবাবু প্রায় বেলা বারোটায় ফিরে এলেন। আরাম ক'রে কাঠের একটা ছোট ঘরের মধ্যেকার কলের তলে ব'সে স্নান করা গেল।

এখানে এক ধরনের ছোট মাছ পাওয়া যায় তারই ঝোল এখানকার প্রধান খাদ্য। দূরে দূরে হাট আছে—সপ্তাহে দু'বার গিয়ে ঠাকুর হাট ক'রে আনে। ঠাকুর দই পাতে। কি যে চমৎকার—কলকাতার জল-যোগের দইকেও সম্ভবতঃ হার মানিয়ে দেয়। তৃপ্তির সঙ্গে সেই দই খাওয়া শেষ করা গেল। ঠাকুরের রান্নাও চমৎকার। এই দুর্ভিক্ষের দিনে এমন মিষ্টভাষী, মিষ্ট-রাঁধুনে ঠাকুর জোটান সত্যিই কষ্ট। এই মেসের মেম্বার জন সাতেক। হাসিমারা এরোড্রম-এর দু একজন বাবুও এখানে খান। মোটামুটি মেসের জীবনযাত্রা বেশ ভালই। তবে, ভাঙা মেস্ (ছুটীর জন্যে) দেখে পূর্ণ সিদ্ধান্ত দেওয়া কঠিন।

ঠাকুর আবার অবসর সময়ে আলু কপির ক্ষেতও করে। এখানে কুলিই হোক্ আর বাবুই হোক্ যার যত জমি ইচ্ছা, বিনা খাজনায় আবাদ ক'রে ক্ষেত ক'রতে পারে।

ক্রমে ক্রমে এখানকার অনেকের সঙ্গে আলাপ হ'লো। একদিন এক বাগানের পূজো দেখতে গেলাম। আসেপাশের অনেক বাগানের বাবুদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে সেই পূজো করা হ'য়েছে। প্রসাদ খাওয়া গেলো। বিভিন্ন বাগান থেকে বাবুরা এসে মিলেছেন।

এখানে ভোরে উঠে আমি আর ধীরেনবাবু রোজ হাসিমারার পথ ধ'রে বেশ কিছু দূর বেড়াতে যাই। সেই সময়টা এত আনন্দ লাগে! মুগ্ধ হ'য়ে হিমালয়ের রহস্যময় চাহনীর দিকে তাকিয়ে থাকি। ধীরেনবাবু আকাশের দিকে তাকিয়ে ব'ললেন, যে রকম আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে আসছে তাতে আপনি থাকতে থাকতে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পারবো।

—কাঞ্চনজঙ্ঘা, সত্যি ?

—মুচকি হেসে ধীরেনবাবু ব'ললেন হ্যাঁ,—কাঞ্চনজঙ্ঘা যে সারা শীত কাল প্রায় এখান থেকে দেখা যায়!

অধীর প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে একদিন সত্যিই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা গেলো। অল্প সময়ের জন্যে আধ-ফোটা গোলাপের মত দিগন্তের কোলে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো। মেঘ তাকে গ্রাস করলো। কিন্তু, ওই এক মুহূর্তটিকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারলাম না।

কয়েকদিন ধ'রে কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছে কাছে এবং তার ওপর মেঘ ঘোরাঘুরি ক'রে শেষ একদিন সমগ্র আকাশ নীল হ'য়ে উঠলো। সেদিন ধীরেনবাবু উল্লসিত হ'য়ে ব'ললেন, চলুন আজ আপনাকে একটা জায়গা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখাবো—দেখবেন, কী চমৎকার লাগবে!

দুজনে মিলে কাঞ্চনজঙ্ঘার উল্টোমুখো চলতে লাগলাম। ধীরেনবাবু

মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে দেখলেন। রেললাইনের পাশে এক জায়গায় গিয়ে ব'ললেন—হ্যাঁ, এইবার দেখুন !

সত্যিই কী চমৎকার যে দেখাচ্ছে ! সদ্য ওঠা সূর্যের আলোয় একটা ফুটন্ত গোলাপী গোলাপের মত কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখাচ্ছে। সূর্যের ওঠার সময়টাই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে বেশ লাল দেখায়। ক্রমে সূর্য যত ওপরে ওঠে ততই তার রং ফিকে হ'য়ে আসে। বেশি বেলায় তাকে একেবারেই দেখা যায় না। আজ আকাশটা এতই স্বচ্ছ হ'য়ে উঠেছে যে তার পাশের তুষার শৃঙ্গকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা এখান থেকে প্রায় দুশো মাইল। সেই অবধি নানাস্থান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা আমাদের কাজ হ'য়ে উঠলো। তবে যে উচ্ছ্বাস নিয়ে তাকে প্রথমদিন দেখেছিলাম সে উচ্ছ্বাস আর ছিল না।

ইতিমধ্যে বাগানের বিজয়া উৎসব বেশ আনন্দ ও তৃপ্তির সঙ্গে শেষ হ'য়েছে। অতগুলো সন্দেশেও যদি তৃপ্তি না হয় ! এখানে যতগুলি বাবুর বাসা আছে প্রত্যেকেই প্রত্যেকটাতে যান। কোলাকুলি, প্রণাম ইত্যাদির পরে প্রত্যেক বাসাতেই জলযোগের আয়োজন হ'য়ে থাকে। ম্যানেজার বাবুর বাসা থেকেই আমরা প্রথম শুরু করলাম। ম্যানেজার বাবু এক ধরনের ডালপুরি বানিয়ে সবাইকে টেক্কা দেবার চেষ্টা ক'রেছেন।

সব বাসাতেই প্রায় সন্দেশের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলো। তবে ডাক্তারবাবু আর ইঞ্জিনিয়ারবাবু পূর্ববঙ্গের ঐতিহ্য রক্ষা ক'রতে পেরেছেন। নারকেলের নাড়ু, তক্তি, মুড়কি, প্রভৃতির ব্যবস্থা ক'রেছেন এঁরা। সন্দেশ খেতে খেতে একেবারে অরুচি ধরে গেলো। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে ফিরলাম। রাতটা বেশ আনন্দেই কেটেছিল। সেদিন ইঞ্জিনিয়ারবাবু অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বালিয়ে রাখবার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন।

দু'খানা সাইকেল ধীরেনবাবু আমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেছিলেন। বিকেল হ'লেই আমরা সাইকেলে ছুটতাম। হাসিমারার কাছে প্রায় পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে একটা এরোড্রোম তৈরি হ'চ্ছে। সেই এরোড্রোমের লম্বা চওড়া বিরাট Runaway-র উপর দিয়ে প্রায়ই আমরা সাইকেল ছুটাতাম। হিমালয়ও যেন আমাদের সঙ্গে ছুটবার পাল্লা দিত। মাঝে মাঝে এরোড্রোম-এর লরী ঘর ঘর করতে করতে আমাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতো। পরিশ্রম হ'লে Runaway-র একপাশে ব'সে ব'সে আমরা সামনের হিমালয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতাম। সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকারে হিমালয় যখন স্তব্ধ গম্ভীর হ'য়ে উঠতো, তখন আমরা বাসায় ফিরতাম। একদিন Runaway-র ধারে ব'সে আছি হঠাৎ দেখি হিমালয়ের পাশেই ছোট একটা শৃঙ্গের (শেষে শুনেছিলাম, ওটা জয়ন্তি) একটা তারা মিট্‌মিট্ ক'রে উঠলো। পাহাড়ের মধ্যে তারা—ব্যাপার কি! জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ধীরেনবাবুর দিকে চাইলে তিনি ব'ললেন, ওটা তারা নয়—বক্সা কাম্পের আলো।

বক্সা ক্যাম্পের আলো! ওইখানে! নির্বাসিত রাজবন্দীদের ওখানে আটকে রাখা হয়! ওই একটুখানি নক্ষত্র যেন অত্যন্ত নিপীড়ন আর লাঞ্ছনার প্রতীক হয়ে উঠলো। কত তরুণ জীবন ওই তারার আলোয় দিনে দিনে ক্ষয়ে যাচ্ছে তার হিসেব নেই কোন! যেন দেশপ্রেমিকদের অন্তর বেদনার সাক্ষী হয়েই ওই বিদ্যুতের নক্ষত্রটি রাতের নিস্তব্ধ পাহাড়ের বুকে কাঁপছে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে আমরা উঠলাম।

চা বাগানের বাবুরা কিন্তু এত বড় মন্বন্তরেও সুখেই আছেন। মিহিচালের ভাত, খাঁটি তেল, চিনি, দুধ, মাখন, ঘী মাছ অভাব কিছুরই নেই। অনেকটা জমিদারীর মত। এমন কি জমিদারীর চেয়েও বেশি সুখ এখানে। বাইরে যে মাখন চারটাকা সেরে বিক্রী হবে এখানে সেটা দু'টাকা সের। অন্যান্য অনেক জিনিসই এইরকম। জমিদারের ওপর গবর্ণ-

মেণ্টের যেটুকু খবরদারী আছে এখানে তাও নেই। Agricultural income tax চায়ের ওপর বসবে বসবে শোনা যাচ্ছে। রক্ষিত-স্বার্থের প্রতিভূরা প্রভূত হৈচৈ করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানাচ্ছেন। কিন্তু, এখন পর্যন্ত অবারিত মাঠের অবাধ অধিকার এঁদের হাত থেকে কেউই এতটুকু কেড়ে নিতে পারে নি। দিব্বি নিরুদ্বেগে সোনালী চায়ের সঙ্গে এঁরা স্বাস্থ্য সুখ সমৃদ্ধি পান করছেন।

এখানকার মজুররা সারাদিন চায়ের পাতা তোলে (চায়ের কচি পাতা তুলতে হয় এবং পাতা যত কচি হবে চায়ের গুণ তত ভালো হবে শুনলাম) আমাদের দেশের বাঁশের তৈরী পলোর মত এক যন্ত্রে। সেই যন্ত্র পিঠে বয়ে যখন বিকেলের দিকে সারি সারি মেয়ে পুরুষ মজুর কারখানায় পাতা জমা দিতে যায় তখন দেখতে বেশ লাগে। পাতার পরিমাণ অনুযায়ী তাদের মজুরী! ধীরেনবাবু বিকেলের দিকে ঘন্টা খানেকের জন্যে পাতার হিসেব নেবার জন্যে যান। আমার বেশ একটা উদ্বেগ থাকে। এক একদিন ম্যানেজার বাবুর ফুলের বাগানের স্থলপদ্ম গাছটির ফুল লাল থেকে গোলাপী, ক্রমে সাদা হয়ে যায় (এই স্থলপদ্মের মজা সূর্যের আলোর সঙ্গে রং বদলায়। ভোরে সাদা থাকে, সূর্য উঠলে গোলাপী, পরে একেবারে লাল, সূর্যাস্তের পর আবার ক্রমে ক্রমে সাদায় পরিণত হয়) তবুও ধীরেনবাবুর দেখা নেই। সেদিন আর বেড়ান হয় না। কাঠের একতলা মেঝের ওপর পায়চারী করতে থাকি আর হিমালয়ের কালো রেখার দিকে তাকিয়ে তার নিবিড় রহস্যভরা চাহনীর স্পর্শ অনুভব করি। দিনের শেষে চায়ের ফ্যাক্টরীর ঝিকি ঝিকি আওয়াজও কোনদিন নিস্তব্ধ হয়ে যায় (যেদিন পাতি কম থাকে)। কেমন একরকম অনাবিল নিস্তব্ধতা আকাশে বাতাসে ঘনিয়ে ওঠে। এই বিষণ্ণ সৌন্দর্য্য আমাকে কেমন একরকম উদাসী করে তোলে।

একদিন চায়ের বাগানে পাতি তোলা দেখতে গেলাম এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তাঁর কাজ শুধু তদারকী করা অর্থাৎ, কাজটা হচ্ছে শুধু দাঁড়িয়ে থাকা। বড় বড় কাঠের খড়ম পায়ে (ড্যাম্প লাগার ভয়ে)। মজুররা চায়ের কচি কচি পাতা তুলছে। কি ক্ষিপ্রতায় তাদের আঙুলগুলো কাজ করছে দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। রোজ রোজ একই কাজ করতে করতে তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। স্বপ্নের ঘোরেও তারা হয়তো পাতা তোলার প্রক্রিয়া করে। মনে পড়লো চার্লি চ্যাপলিনের মডার্ণ টাইমস্ ফিল্ম-এর অভিনয়—যন্ত্রের একঘেয়ে সংস্পর্শ মানুষকে কি করে যান্ত্রিক করে তুলেছে। তাতে দেখানো হয়েছে যে, একটা লোক চল্লিশ বছর শুধু যন্ত্রের নাট্ এঁটে আসছে। নাট্ আঁটতে আঁটতে তার এমনি অবস্থা হয়েছে যে, সে বসে থাকলেও নাট্ আঁটার মত অঙ্গভঙ্গি করে। একদিন কারখানার মালিকের মাথার উপরও সে নাট্ আঁটার অঙ্গভঙ্গি চালিয়ে বসেছিলো। চাবাগানের কুলিদের চায়ের পাতা তোলার ধরন দেখে মানুষের যন্ত্রে পরিণত হওয়ার সেই শোচনীয় অথচ হাস্যকর গল্পটি মনে পড়েছিলো। এদের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে এরা দক্ষ, যেমন মৌমাছি দক্ষ তার চাক্ গড়তে, বাবুই দক্ষ তার বাসা গড়তে। এদের গণ্ডীর বাইরে এরা অপরিচিত গালিভার। অথচ মানুষের মনুষ্যত্ব, তার ব্যক্তিত্ব দুনিয়ার যত বিচিত্র কাজে ও চিন্তায় অভিব্যক্তি পাবার মধ্যে। তাই, মানুষ হয়েও চাবাগানের এই নিরক্ষর অর্দ্ধবুভুক্ষু মজুরদের মত দুনিয়ার শ্রমশীল জনসাধারণ মৌমাছি আর বাবুই পাখীর মতই সৃষ্টিহীন, বন্ধ্যাজীবনে অন্তরীণ হয়ে আছে। দুনিয়ার সব কিছুর স্রষ্টা হয়েও এরা স্রষ্টা নয়, সব কিছুর দ্রষ্টা হয়েও এরা দ্রষ্টা নয়। সমগ্রভাবে এরা স্রষ্টা দ্রষ্টা কিন্তু, বিচ্ছিন্নভাবে এরা জড় এবং অন্ধ। কে তাদের এমন জড় এবং অন্ধ করে রেখেছে ?

চারদিকে চায়ের সারিবদ্ধ গাছ-এর যেন সীমা নেই। চারদিক শুধুই সবুজ আর নীল চোখ যেন স্নিগ্ধ হয়ে যায়। চায়ের গাছের মাথা ছাড়িয়ে অনেক ফাঁকে ফাঁকে কি একটা মাঝারি গোছের গাছের সারি। শুনলাম, চায়ের গাছ যাতে ছায়া পায় তারই জন্যে ওই গাছগুলো ঠিক মত জ্যামিতিক নিয়মে লাগানো। ভদ্রলোক চা এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবনের ইতিহাস বুঝিয়ে দিলেন। Transplantation অর্থাৎ বার বার স্থানান্তর করার পর চায়ের গাছ লাগাবার মত উপযুক্ত হয়ে ওঠে। জায়গাটা কি নির্জন! মাঝে মাঝে শুধু কুলিদের দুর্বোধ্য কথাবার্ত্তা। কত রং-এর পাখি গাছের ওপর কিচির মিচির করছে। এই শৃঙ্খলাবদ্ধ অরণ্য-শোভা তন্ময় হয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। বাস্তবিক চা বাগান যাঁরা দেখেন নি তাঁরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একটা দিক হারিয়েছেন আমি বলবো। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের চা তোলা দেখলাম।

কয়েকদিন এঞ্জিনিয়ার বাবুর সঙ্গে গিয়ে কারখানাও ভালো করে দেখলাম। Roasting machineএ কচি পাতাগুলো খেলাচ্ছে। এক এক অবস্থায় পাতা এক এক বিভাগে যাচ্ছে, পরে সুন্দর সুগন্ধ চায়ে পরিণত হচ্ছে। এক জায়গায় দেখলাম তাপ দেবার মত একটা যন্ত্রে চা তাপ দেওয়া হচ্ছে। এমনভাবে দেবার ব্যবস্থা আছে যাতে একটু কম বা বেশি তাপ না হয়। স্তূপাকার ধানের গাদার মত চায়ের গাদা স্থানে স্থানে পড়ে আছে। ইঞ্জিনিয়ারবাবু হাতে তুলে পরীক্ষা করে দেখালেন চমৎকার গন্ধ। এরকম চায়ের সমুদ্রে চা-তালদের (চা খোর) কি অবস্থা হতো ভাবতে লোভ হয়। আমি কিন্তু এমন লোভনীয় চায়ের আসরেও নিতান্ত নীরস (কেননা নিরুপায় চা সহ্য হয় না অথচ চমৎকার লাগে) জীবন যাপন করছি। যত খুশি (নিখর্চা) চা খাও কেউ

বাধা দেবে না। এখানে কিন্তু একটা জিনিস একটু অবাক হয়েই লক্ষ্য করলাম। এখানকার অনেকেই খুব বেশি চা খান না। আমাদের ঠাকুর ভোরে এমন সোনার মত রং-এর চা তৈরি করতো যে লোভে পড়ে মাঝে মাঝে এক আধটু খেতাম। এঞ্জিনিয়ারবাবু পরম যত্নের সঙ্গে সমগ্র কারখানা ঘুরিয়ে দেখালেন, বোঝালেন, শেখালেন এবং শেষে তাঁর সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনের এক শোচনীয় ব্যর্থতার ইতিহাস শোনালেন। ধনতান্ত্রিক জগতে অবশ্য সে কাহিনী নতুন নয়। টাকার জোরে মনের শ্রমলব্ধ আবিষ্কার আত্মসাতের কাহিনী ইতিহাসে আরও অনেক আছে। তাই, ইঙ্গিতটুকুই শুধু রেখে গেলাম। কারখানা ঘোরা শেষ হ'লে অফিস ঘরে বসে রেডিও শোনা গেলো। ম্যানেজার বাবুর বাসায় অবশ্য রাত্রে রেডিওর আসর বসে এবং যে ধরনের আলোচনা হয় (জাপান সে সময় দুরন্ত বিজয়ী জলে স্থলে অন্তরীক্ষে) তা বাংলা দেশের কোন রেডিওর আসরেরই অজানা নয়। একই অঙ্গভঙ্গি একধরনেরই এক ঘেয়ে পান্‌সে কথাবার্তা। ধার তার মধ্যে এতটুকু নেই। খবরের জন্য কোন নির্ভরশীল উৎস নেই। রেডিওর খবরের উপরই পরস্পরের একেবারে নির্ভুল (?) সিদ্ধান্ত গড়ে উঠছে অথচ, রোজই ঘটনার গতি অন্য পথে চলেছে।

এখানকার বাবুদের মধ্যে প্রধান আলোচনার বস্তু Cross Word Puzzle. অনেকে অনেকদিন ধ'রে বহু solution পাঠিয়েও Resolution হারান নি। Puzzleএ Puzzleএ Puzzled হয়েও তাঁরা নতুন উৎসাহে লেগে যান। ধীরেনবাবুর Illustrated Weekly-কে কেন্দ্র ক'রে বেশ একটা চক্র এখানে গড়ে উঠেছে। এঁদের Extra office work ব'লতে এটাই।

ইঞ্জিনিয়ারবাবু অবশ্য একটু স্বতন্ত্র ধরনের। নানারকম সমস্যার মীমাংসা খুঁজবার দিকে তাঁর বেশ আগ্রহ আছে। এত বড় যুদ্ধ, এত ভয়াবহ

মন্বন্তর মহামারী, দেশে জিনিসপত্রের অবর্ণনীয় সঙ্কট—সব কিছুর 'কেন' প্রশ্নটি তাঁর মনের মধ্যে ওঠে। ধীরেনবাবুর ঘরে ব'সে কত রাত্তির আমরা আলোচনায় কাটিয়েছি। গতানুগতিক ধারা থেকে একটু স্বতন্ত্র ব'লেই ইঞ্জিনিয়ারবাবুকে আমার ভাল লাগত। ভালো লাগত তাঁর সৌজন্য, অমায়িকতা, অতিথিবৎসলতা। লক্ষ্মীপুজোর দিন পরম যত্নে তিনি আমাকে নেমতন্ন ক'রে খাওয়ালেন—খাওয়ালেন আবার পূর্ববঙ্গীয় লোভনীয় খাবার সমষ্টি দিয়ে। তাঁর বাসাটিও বেশ ইঞ্জিনিয়ারের মত ক'রেই সাজানো। একটা হরিণ আছে তাঁর ওখানে। নিজের ছেলেপিলে নেই বলে ভাই-এর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এসে মানুষ করেন! কিন্তু, স্কুলের সঙ্কটে তাদের মানুষ করা মুস্কিল হ'য়ে গেছে! ব'সে ব'সে ইঞ্জিনিয়ারবাবুর সঙ্গে কত সুখ-দুঃখের গল্প হ'লো।

এখানকার ডাক্তারবাবুও বেশ স্ফূর্তিবাজ, হাসি-খুশি লোক। ম্যানেজার বাবুর মত নম্র, বিনয়ী লোক সত্যিই কম আছে। এই বাগানের কাজেই তাঁর চুলে পাক ধরেছে।

ধীরেনবাবুর অকৃত্রিম বন্ধু ঘুঘু -বাবু কয়েকদিন পরে এলেন। কিন্তু, পরে এসেও তিনি তাঁর সরল খুশিভরা কথাবার্তায় অনেক কাছে এসে গেলেন। এত ভালো লাগতো তাঁকে আর তাঁর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারাটিকে। মুখের দিকে চাইলে তাঁর অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখতে কোনই কষ্ট হয় না এতই অকপট তাঁর ব্যবহার।

আর ধীরেনবাবু? যাঁর সঙ্গে ফরিদপুরের কলেজ হোষ্টেলে কত দুর্নীতি, চক্রান্ত, নিচতার বিরুদ্ধে একসঙ্গে অটলভাবে লড়েছি তাঁর পরিচয় আর কি দেবো! আমার মনিটারশীপ-এর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুটিল চক্রান্ত কতদিন ধীরেনবাবুর সত্ত-বুদ্ধি এবং পরামর্শে পরাজিত হ'য়েছে আজও সেকথা স্পষ্ট চেখে ভেসে ওঠে। বাস্তবিক, সেই

আবর্জনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই বোধহয় আমাদের দুজনের বন্ধুত্বকে এমন নিবিড় ক'রেছে। কতদিন থেকে ধীরেনবাবু তাঁর এই জায়গায় আসবার জন্যে আমাকে আমন্ত্রন জানাচ্ছেন !

ধীরেনবাবুও আমার মত পরিব্রাজক লোক, কত জায়গা তিনি ঘুরেছেন। বৃহত্তর জীবনধারার ওপর এই তীব্র আকর্ষণ আমরা সমানভাবে অনুভব করি (সেই ছাত্র জীবন থেকে) ব'লেই হয়তো আমাদের বন্ধন আরও দৃঢ় হ'য়েছে। তার ওপর ধীরেনবাবু দেশপ্রেমিক। সংস্কার আর কুসংস্কার সম্বন্ধে তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পক্ষপাতী। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই ছাত্রজীবনে আমাকে সবপ্রথম তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে। আর একটা জিনিস যা তাঁর দিকে আমাকে আকৃষ্ট করে সেটা হচ্ছে তাঁর রুচিজ্ঞান। তাঁর মশারীর রং (যদিও পিঠে তালি দেওয়া একটা খদ্দরের জামা তিনি পরতেন), তাঁর ইলেকট্রিক বাল্ব-এর নীল শেড, তাঁর আয়না-চিরুণী প্রভৃতির মধ্যে এমন একটা রুচি ও বৈশিষ্ট্য ছিলো যা আমাকে আকৃষ্ট করতো। এই সব আকর্ষণের সমষ্টিই আমাকে চাবাগান পর্যন্ত তাঁর কাছে আকর্ষণ করেছে।

দিনগুলো চট্ চট্ ক'রে কেটে যাচ্ছে। আরও কিছুদিন থাকবার জন্যে তিনি পীড়াপীড়ি করছেন কিন্তু, সম্ভব হ'চ্ছে না নানাকারণে। যাবার আগে ভোটান সীমান্ত একবারে উত্তীর্ণ হ'য়ে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত ঘুরে আসবার সংকল্প করেছি। জয়ন্তিতেও যাবার ইচ্ছা আছে।

এখানে বেশ শীত পড়ে আসছে। একদিন দুপুরে আমরা দু'জনে সাইকেলে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। হাসিমারা হ'য়েই যেতে হবে। একটানা পথ। সমতল ভূমির পথ ক্রমে পাহাড়ী হ'য়ে উঠলো। নিশ্বাস ঘনঘন পড়তে শুরু করেছে। চড়াই-উৎরাই ভাঙ্তে ভাঙ্তে সাইকেল এগিয়ে চলেছে। হিমালয় ক্রমেই এগিয়ে আসছে। হিমালয় পর্বত যেন রামায়ণের দেশের কোন রাক্ষসের মত হাত-পা

নেড়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। যেন সমগ্র পাহাড় পর্যন্ত নড়ে উঠেছে বলে বোধ হচ্ছে। পথে কয়েটা ইওরোপীয়ান চা বাগান পড়লো। ইওরোপীয়ান বাগানগুলো বেশ ঝকৃঝকে পরিচ্ছন্ন। তাদের বাবুদের কোয়াটারগুলোও বেশ। ফ্যাক্টরীগুলোও চমৎকার। অবশ্য, ফ্যাক্টরী সবগুলো প্রায় একই ধরনের।

ক্রমে দলসিংপাড়া ষ্টেশনে এলো। এদিকে এটাই শেষ ষ্টেশন। এখানে এসে হিমালয় বিরাটকায় হ'য়ে উঠলো। হিমালয়ের বুকে স্থানে স্থানে বড় বড় গেরুয়া রং‌এর খাদ দেখা যাচ্ছে। গাছপালাগুলো এখন ঘাসের চেয়ে কিছু বড় দেখাচ্ছে। কে বলবে ওগুলো এক একটা নিবিড় জঙ্গলের অংশ—ওখানে হাতী ডাকে, বাঘ লুকিয়ে থাকে, সাপ জড়িয়ে থাকে।

দলসিংপাড়ায় দেখলাম বাঁসের চটা দিয়ে এক্‌জিবিশনের মত অনেক ষ্টল খোলা হ'য়েছে। ধীরেনবাবু বললেন, ওগুলো কমলা লেবুর আড়ৎ। কমলার সময় আসছে। এখন ওসব কমলালেবুতে একেবারে বোঝাই হ'য়ে যাবে। দেখছেন তো ঐ টুক্‌রী তৈরি হচ্ছে। ওই রাশীকৃত টুকরী কমলালেবুতে বোঝাই হয়ে দেখতে দেখতে দেশবিদেশে চালান হ'য়ে যাবে। ভোটান থেকে যত কমলালেবু আসে দলসিংপাড়া তার প্রধান ডিপো।

অবাক হ'য়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। ধীরেনবাবু বললেন, কমলার সময় আপনি থাকবেন না—থাকলে দেখতেন—কত কমলা এখানে আর সস্তা কত। আগে তো টাকা-টাকা শ ছিলো। আর এখানকার মত কমলা কি আর আপনারা পান? কি চমৎকার কি মিষ্টি—দুধে দিয়েও খাওয়া চলে! ধীরেনবাবুর গল্প শুনে যা লোভ হচ্ছিলো! ধীরেনবাবু ঢালু পথে আরামে গা ঢেলে দিয়ে চলতে লাগলেন।—একবার কমলালেবুরর সময় আসবেন—দেখবেন কি মজা।

ক্রমে আমরা জলাগাঁও চাবাগানে এসে পড়লাম। এটাই শেষ চা-বাগান এবং সম্ভবতঃ সবচেয়ে বড় এবং সুন্দর—অবশ্য এদিককার মধ্যে। এটাও ইওরোপীয়ান—অবশ্য, বড় এবং সুন্দর যখন তখন নাম না বললেও চলতো হয়তো। বিদেশী স্বার্থ যে কেন ভারতীয় স্বাধীনতার নামে আঁৎকে ওঠে তা এই সব ভূস্বর্গ না দেখলে ঠিক বোঝা যায় না।

এখানে রাস্তাটা কী চমৎকার। চারদিকে গাছের ছায়া। পাতার শিসে শিসে কেমন যেন তন্দ্রাজড়ানো অলস দুপুরের মাদকতা মেশানো। এমন ছায়াময় স্থানে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে আকাশস্পর্শী হিমালয়ের নিবিড় বন চোখে পড়ছে। হিমালয় যেন এ জায়গাটার গার্জেন হয়ে উঠেছে।

ভারত আর ভোটানের সীমান্ত যেখানে মিলেছে সেখানে এসে দেখি একটা হাট বসেছে। হাট দেখে আমরা সাইকেল থেকে নামলাম। হাটে ঢুকে দেখি কয়েকজন ভুটিয়া সবুজ রংএর বড় বড় কমলা বিক্রী করছে—কোন কোন কমলার গায়ে হলুদের ছিটে রয়েছে। ধীরেনবাবু বললেন, 'ওই দেখুন, কমলা উঠতে আরম্ভ করেছে আর কিছুদিনের মধ্যেই পাকা কমলা এইসব ভুটিয়ারা পাহাড় ডিঙিয়ে ভোটান থেকে নিয়ে আসবে। ভোটান্ থেকে কথাটা শুনতেও বেশ লাগে। ভেড়ার চামড়ার জামা, সবুজ চা, ভেড়ার কম্বল চির নীহারাবৃত ভূমি কত কী না ওই কথাটির মধ্যে জড়িয়ে আছে। মুনাখা, লডক্ ওরা সব কতদূর? তিব্বতের নিষিদ্ধ সীমান্তের সন্ধান কী ওরা জানে?

বড়ই তেষ্টা পেয়েছিলো। ধীরেনবাবু অনেকগুলো কমলা লেবু কিনে ফেললেন অবশ্য, একটার স্বাদ নেবার পরে। খোসা ছাড়াতে গিয়ে দেখি রসে যেন একেবারে ঠাসা। আর আমাদের দেশে কমলালেবুর রস চিবিয়েও প্রায় বের করা যায় না! কমলালেবুর রস দেখে

সত্যিই অবাক হচ্ছিলাম। খেতে বেশ অম্লমধুর লাগছিলো। পর পর কয়েকটা তক্ষুনি খেয়ে ফেললাম। কতকগুলো পকেটে পুরে ফেললাম।

হাটের জিনিসপত্র প্রায়ই মামুলী। কেবল কোয়াস নামে একরকমের তরকারী আমাদের কাছে একটু বিচিত্র। সেদিন ধীরেনবাবুদের ওখানে ওর তরকারী খেয়েছিলাম খেতে অনেকটা পেঁপের মত।

চারদিকে ভুটীয়াদের রাজত্ব। বড় বড় ভোজালী মাজায় গুঁজে ভুটিয়ারা সওদা বেচাকানা করছে। মনে হচ্ছে ভোটানের কোন দেশে আছি বা (অবশ্য, এটা ভোটানেরই অংশ ছিলো মধু টী ষ্টেট পর্যন্ত ভুটিয়াদের আধিপত্য ছিলো; ইংরেজের সঙ্গে হেরে গিয়ে এদের রাজত্ব পিছিয়ে গেছে)। চারদিকে ভুটিয়াদের ভীড়। বুনো কমলালেবু ছাড়িয়ে খাচ্ছি তার ওপর আবার অভ্রভেদী হিমালয় সামনেই—এ যে একেবারে ছোটবেলায় সেই মাসিক পত্রে পড়া রোমাঞ্চক রাজ্যে এসে পড়েছি। আজ নিজের চোখেই মাসিক পত্রের সেই রহস্যময় অনুভূতির স্বাদ পাচ্ছি ভেবে কী আনন্দ যে লাগলো।

আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছিলো, আবার ফিরতে হবে তো—অন্ধকার রাত। হাট থেকে বেরতেই দেখি এক গরুর গাড়ি বোঝাই ভুটিয়া যুবতী-বৃদ্ধা-শিশু হাটের দিকে আসছে। দেখেই বোঝা গেলো, এঁরা ভোটানের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের। টকটকে গায়ের রং। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উজ্বল পোশাক। আমরা সাইকেল পূর্ণগতিতে চালিয়ে দিলাম। পথে কয়েকটা ভাঙা চোরা কাঠের ঘর পড়লো—ধীরেনবাবু বললেন, আগে এই ঘরে বৃটিশ ইণ্ডিয়ার এজেণ্ট থাকতেন এখন নাকি পুনাখায় থাকেন। একটা ছেঁড়া ইউনিয়ান জ্যাকে উড়ছে। ছেঁড়া হ'লেও তার দাম কম নয়। আজ যদি ভুটিয়ারা ওই ছেঁড়া পতাকার অমর্যাদা করে তাহলে সপ্ত সমুদ্র আলোড়িত হয়ে উঠবে।

এইবার খাস্ ভোটান রাজ্য আরম্ভ হলো। অর্থাৎ আমরা, ভারতবর্ষ পেরিয়ে এসেছি। এমন একটা জায়গায় এসেছি যার আধ হাত দূরেও একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন সভ্যতা, ভিন্ন আইন কানুন এক একবার সমস্ত কিছুর পার্থক্য রয়েছে। কেমন এক ধরনের অনুভূতি এই সীমান্ত দেশে জাগে—নেপালে এর আগে যে অনুভূতির স্পর্শ একবার লাভ করেছিলাম।

ঢালু পথ পেয়ে সাইকেল বন্ বন্ করে ছুটলো। ছোট সঙ্কীর্ণ এবং অমসৃণ মাটির পথ। মাঝে মাঝে গরুর চাকার লিক। ডাইনে-বাঁয়ে একটু সরলেই কাঁটাওয়ালা জঙ্গলের খোঁচা খেতে হবে। পথে মধ্যে মধ্যে হাটগামী ভুটিয়াদের সাক্ষাৎ পাচ্ছিলাম। তারা হাসি গল্প করতে করতে হাটে চলেছে। আমাদের দিকে ছোট ছোট কুৎকুতে চোখ তুলে অবাক হয়ে চাইছিলো! আমাদের মাথার ওপরই এখন হিমালয়ের দুর্ভেদ্য বন ঝুলছে। উঃ, কী গভীর ওই বন! লতায়-পাতায় কাঁটায় একেবারে মেশামেশি মাখামাখি করে এক দুর্লঙ্ঘ্য বেড়াজাল সৃষ্টি করে রেখেছে। রোদের চোদ্দপুরুষের সাধ্য নেই তাদের হারেম লঙ্ঘন করে। এই হলো হিমালয়ের বন সাধুরা লুব্ধভাবে যার জন্যে আক্ষেপ করে, বালকরা ভয়ে এবং বিস্ময়ে যার গল্প শোনে, যুবকরা যার মধ্যে এক অব্যক্ত রোমাঞ্চের সন্ধান পায়। হিমালয়ের সেই বনের পাশ দিয়েই আমরা চলেছি। মাথার ওপর নীল আকাশ সূর্যের আলোয় ঝলসাচ্ছে। ডাইনে-বাঁয়ে দুই পাশেই হিমালয় যেন এখন আমাদের চেপে ধরেছে। ওপাশের ওই পাহাড়ের বনে মেঘ ঝুলছে।

মাইল কয়েক চলার পর একটা তেমাথার মত পথ পড়লো। ধীরেন বাবু বাঁয়ের পথ ধরলেন। কিন্তু, কিছুদূর গিয়ে পথ একটা ক্ষেতের আইলে পরিণত হয়ে গেলো। ঠেলতে ঠেলতে সাইকেল নিয়ে অতি কষ্টে আমরা এগিয়ে চললাম। ধীরেনবাবুর উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ

একটা পাহাড়ী কুটীর চোখে পড়লো। ধীরেনবাবু এগিয়ে গিয়ে সেই বাড়ির একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। বুঝলাম, কিছু পয়সার বিনিময়ে সে আমাদের গাইডের কাজ করবে। সাইকেল দুটো তার আঙিনাতেই রাখা হলো। একটা মোরগ ভয়ে গেলো পালিয়ে। একটা শিশুর ভীত-ডাগোর দুটো চোখ বেড়ার ফাঁকে ফুটে আছে।

লোকটির পিছু নিয়ে একটু দূর যেতেই দেখি হঠাৎ বিরাট একটা নদী আমাদের সামনে। আমি তো আনন্দে বিস্ময়ে একেবারে থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ধীরেনবাবু আমাদের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। এতক্ষণে তাঁর উদ্দেশ্য বোঝা গেলো।

নদীর ওপারে বহুদূরে ঝাপসা ঝাপসা বন দেখা যাচ্ছে। আগা গোড়া জল থাকলে নদীটা কি বিরাট না দেখাতো! এর বেশির ভাগই চরা। চকচকে একেবারে মিশ্রীর সেরার মত স্বচ্ছ জল কল্ কল্ করে ছুটে যাচ্ছে। "মহাদেবের জটা হইতে" না বহুক পাহাড়ী নদীর উদ্দাম গতিবেগ যে অভিব্যাক্তির কোন ভাষা খুঁজছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। একটা পাথরের ওপরে দুজনে বসলাম—পাহাড়ী আর একখানা পাথরের ওপর বসে কৌতুহলী হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইলো। সে হয়তো ভাবছে, এরা কী দেখতে আসে এখানে? আমরা ভাবছি, ওরা এই প্রকৃতির অনবদ্য সৌন্দর্যের সংস্পর্শে কী সুখেই না আছে? কিন্তু, সত্যিই কী ওরা সুখী? তাহলে এমন দেশ ছেড়ে ওরা লাঞ্ছিত গোলামীর জন্যে ভোজালী হাতে দলে দলে ছোটে কেন? নদীর এপার ওপারের মত সুখ দুঃখের এই আপেক্ষিক বিচার আমরা বসে বসে করছি—কিন্তু, আসলে আমরা কেউই সুখী নই। আমাদের সকলেরই গায়ে উদ্ধত শৃঙ্খলের ব্যথা টন্‌টন্ করছে। আমরা পরাধীন হয়ে দুঃখী, ওরা দৃশ্যত স্বাধীন হয়েও তার চেয়ে দুঃখী। চারদিকের শাসন ও শোষণের দৌরাত্ম্যে আমাদের জীবন জর্জর হয়ে উঠেছে।

আমরা বাঁচতে চাই, আমরা বাঁচতে চাই! পাহাড়ীর রেখা বহুল বিষন্ন মুখটির দিকে চেয়ে এ ছাড়া অন্য কথা শেষে ভাবতে পারলাম না। কিন্তু, ভোটানে কী এই ব্যথার চেতনা জেগেছে? না জাগলেও জাগবেই তো একদিন।

ছল্ ছল্ শব্দ তুলে মাঝে মাঝে দু' একজন ভুটিয়া নদী পারাপার করছে। সম্ভবতঃ ওরা ওই দুর্ভেদ্য বন পেরিয়ে তাদের নির্জন পাহাড়ী কুটীরে ফিরে যাবে। ভোজালীই তাদের সাথী, ভোজালী তাদের বন্ধু, ভোজালীই তাদের রক্ষক। বনপথে চলবার সময় ওই ভোজালীর গায়েই ওদের হুঁসিয়ারী হাত সজাগ হয়ে থাকে। আসুক না বাঘ তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে সে। ডাকুক না হাতী ভোজালী যতক্ষণ তার সাথী ততক্ষণ তার ভয় কি।

তন্ময়তার ঘোর কাটলে পকেট থেকে কমলা বের ক'রে খেতে লাগলাম! পাহাড়ীকে একটা দেওয়া হ'লো। কমলা খেয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা জলে হাত ধুলাম। জলকে কতভাবে স্পর্শ করে আনন্দ পেলাম। মনে হচ্ছিলো দূরের ওই বনভূমি থেকে এই নদীটা হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে। আসলে নদীটা এসেছে আরও দূর থেকে যেখানে পথ চলতি তিব্বতী পাহাড় ভেঙে বাড়ি ফেরে। পাহাড়ের গুহায় গুহায় বৌদ্ধ মন্দিরে লামার আনাগোনা চলে। সেই রহস্যাবৃত দেশের গন্ধই যেন নদীর মুখর জলের স্রোতে মিশে রয়েছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য খেলা করছে। ওপারের ওই উচু পাহাড়টার মাথায় একটা মস্ত রূপোর মত সাদা মেঘ ভাসছে। তার গায়ে যেন রাজহাঁসের রাজকীয় গতি।

অনেকক্ষণ ধ'রে দৃশ্যটা উপভোগ ক'রে পাহাড়ীটাকে কিছু বখসিস্ দিয়ে ফেরা গেল। সেই তেমাথায় পৌঁছে দেখি একটা গরুর গাড়ি কমলালেবু বোঝাই ক'রে চলেছে। বিক্রী করতে অস্বীকার ক'রে গাড়োয়ান্

ব'ললো, ওই পথ ধরে যান ডিপোতে গিয়ে কমলালেবু পাওয়া যাবে। চললাম সেই পথে। কিছুদূরে গিয়ে আর একটা আড়তের সন্ধান পেলাম। সেখানে দেখি একজন মাড়োয়ারী চাল-ডাল-নুন-তেল প্রভৃতি হরেক জিনিসের দোকান খুলছে। এই দুর্গম দেশেও মাড়োয়ারীর আবির্ভাব ঘটেছে? ঈশ্বর জগৎময় শুনি—মাড়োয়ারী বণিক শ্রেণী কী ঈশ্বরের সাব-এজেন্ট? মাড়োয়ারীর দোকানে প্রচুর কমলালেবু গাদা করা ছিলো। শুনলাম, ইনিই কমলালেবুর প্রধান কারবারী। ভোটান আর বৃটিশ ভারতের যোগাযোগ এ অঞ্চলের এই পথে। সেই পথটিকে এমনভাবে আগলাতে মাড়োয়ারী বণিক ছাড়া আর কে ভালভাবে পারতো? দেশে মার অসুখ, কিছু কমলা নেবার আগে একবার চারিদিক বেড়িয়ে আসার লোভ হ'লো। আসে পাশে বহু ভুটিয়া যাত্রী চিড়ে ছাতু প্রভৃতি ব'সে ব'সে খাচ্ছে। অত বড় পাহাড় ডিঙোবার পাথেয় নিতে হবে তো! এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে নির্দেশ করে ধীরেন বাবু বললেন ওই উঁচুতে কমলালেবুর সব বাগান আছে। ওখান থেকে সব লেবু আনে। কমলালেবুর দেশ ওই জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের চূড়া দেখে কেমন কৌতূহল হ'চ্ছিলো! একেবারে চূড়ার উপর ছোট্ট একখানা কুটীর দেখা যাচ্ছিলো। চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে স্তূপ স্তূপ জঙ্গল—কে জানে ওই জঙ্গল কাদের বাসস্থান। ওই জঙ্গল পেরিয়েই তো ভুটিয়া নরনারী হাট-বাজারে আসে—কিন্তু, কেমন ক'রে আসে? যে শৌর্য্য তাদের পথ চলার পাথেয় তাকে নমস্কার।

আড়াই টাকা করে শ গোটা পঞ্চাশেক লেবু একটা বস্তার (বস্তা কেনা হলো) মধ্যে নিয়ে আমরা রওনা হ'লাম। রওনা হবার সময় ধীরেন বাবু একটা কাঠের ঘর দেখিয়ে ব'ললেন, ওখানে ভোটান্ সরকারের একজন প্রতিনিধি থাকেন কাষ্টম ডিউটি প্রভৃতি আদায়ের জন্যে।

সেই পথেই ফিরলাম কিন্তু, পথ এবার চড়াই। সেই হাটের কাছে এসে (হাট তখন ভেঙে গেছে প্রায়। এখানে সকাল সকাল ভাঙে। দূরে দূরে ছেলেপেলে নিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হ'বে তো সব) বাঁ দিকে মোড় নিলেন। বললেন, ওই পাহাড়ে একটা ঝরণা আছে চলুন ওটা দেখতে হবে। ক্লান্ত হলেও চললাম। সেখানে এক বাড়ি থেকে পয়সার লোভ দেখিয়ে একজন ন'দশ বছরের ছেলেকে সঙ্গী করা হলো। ক্রমে আমরা নিবিড় জঙ্গলের মুখোমুখি হলাম। দূর থেকে ঝির ঝির করে একটা শব্দ আসছিলো। শব্দ আরও বেড়ে উঠলো। কাছে গিয়ে একটা ধরণার ধারা পাহাড়ের গা বেয়ে লুটিয়ে পড়ছে! 'সেই জল গাঁয়ের ভুটিয়া মেয়েরা নিচ্ছে। আমাদের দেখে তারা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। আমরা না থেমে সেই জলের ধারা অনুসরণ করে কিছুদূর উঠলাম। আর উঠবার উপায় নেই। ঘন ঝোপ আর গাছপালায় পথ দুরারোহ হয়ে উঠেছে। ঝরণার পথে পথে কত রং-এর নুড়ি পড়ে রয়েছে। কত বিরাট বিরাট পাথরের চাঁইও রয়েছে, বর্ষায় ঝরণার তোরে হয়তো খাড়া বন জঙ্গল চূর্ণ করে গড়িয়ে এসেছে। ঝরণার সেই উন্মাদ রূপ দেখতে পাচ্ছি না বলে আফসোশ হলো। জায়গা কি ঠাণ্ডা! সূর্যালোক ঢুকতে পারে না কোনদিন সেখানে। ওই ঝরণায় নাকি মাছও পাওয়া যায়—মাঝে মাঝে অবশ্য, ছোট ছোট। ঝরণার টাটকা জল পেট ভরে খেলাম।

এইবার চলার পালা। নিবিড় বন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের শেষ বিদায় জানালো। সূর্য আকাশের কোলে হেলে পড়েছে। অবশ্য বনের কাছে সূর্য চিরকালই হেলা। দিনেই রাত হয়ে থাকে সেখানে, রাতের কালো রংটা আরও একটু কালো হয় মাত্র।

ফেরার পথে দলসিংপাড়া ষ্টেশান থেকেও কিছু কমলা নেওয়া গেলো। ঘুরে ঘুরে আরত দেখা গেলো। কত কমলা এরই মধ্যে চালান যেচ্ছে

আরম্ভ ক'রেছে।...একেবারে ক্লান্ত হয়ে যখন মেসে পৌছলাম তখন রাত হয়ে গেছে। ঠাকুর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চা তৈরি ক'রে নিয়ে এলো, বললো, এক কাপ চা খেয়ে ফেলুন দেখবেন কেমন লাগবে। ঠাকুরটার সত্যিই প্রাণ আছে, শুধুই ঠাকুর নয়। অসুর জাতীয় চাকরটা কিন্তু আমার সঙ্গে প্রায় বাক্যালাপই করে না। চুপ চাপ থাকে।

ঘুঘু বাবু কমলা খাওয়ার গল্প শুনে বললেন, কী আর কমলা খেলেন মশাই থাকতেন কমলার সময় এখানে! আমরা তো কমলার সিজন-এ কিছু টাকা আলাদা ক'রে রেখে দিই কমলার জন্যে শুধু।

কুলি বস্তীতে রাত্রে প্রায়ই মাদল বাজিয়ে নৃত্য হতো। একদিন দেখতে গিয়েছিলাম। সেদিন ছিলো জ্যোছ্না রাত। মাদলের শব্দে কেমন একটা মাতলামি আছে। মেয়েরা মাজা ধরাধরি করে ঘন্টার পর ঘন্টা মাতাল হ'য়ে একইভাবে নেচে চলেছে। আর মাদল নিয়ে একজন পুরুষ তাদের সঙ্গে সঙ্গে নাচছে। কিছুক্ষণ ভালোই লাগলো, শেষে বড়ই একঘেয়ে মনে হ'লো।

আমার যাবার দিন ঠিক হয়ে গেছে। এবার আর জয়ন্তি যাওয়া হলো না। ধীরেন বাবু কুচবিহার পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে চ'ললেন। টাঙায় উঠতেই এঞ্জিনিয়ার বাবু প্রভৃতি বিদায়ের হাসি হেসে আবার আসতে ব'ললেন।

যে পথ দিয়ে এতদিন প্রাতভ্রমণ ক'রেছি আজ সেই পথ বিদায়ের পথ হ'য়ে উঠলো। জায়গাটার উপর যেন সত্যিই একটা মায়া প'ড়ে গিয়েছে।...গাড়ি যখন মধু টী ষ্টেটের পাশ ঘেষে চ'লতে লাগলো তখন দেখি ঘুঘু বাবু রুমাল উড়াচ্ছেন। এঞ্জিনিয়ার বাবু তাঁর ব্যর্থ জীবনের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।...কাঞ্চনজঙ্ঘার দেশ পেছনে পড়ে গেল পেছনে পড়ে গেলো কয়েকটা দিনের মধুর ইতিহাস। যে নির্জন

যনে সকালে একা একা বেড়াতে আসতাম, সেই নির্জন বন লৌহ শকটের আর্ত্তনাদে মুখর হয়ে উঠেছে। যে—ব্রীজের উপর কতদিনও বেড়াতে এসেছি, সেই ব্রীজে যেন আজ বিদায়ের করুণ বিলাপ রণিয়ে উঠেছে। এঞ্জিনিয়ার বাবু, ঘুঘু বাবু, ঠাকুর, রাতের অন্ধকারে কোথায় তারা অদৃশ্য হয়ে গেলো!

সমাপ্ত